স্বাধীন ভ্রমণ



ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়।
৬/১ এ. ধীরেন ধর সরণী। কলিকাতা

প্রকাশক
ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৯

মুদ্রক
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

স্বাধীন ভ্রমণ

লেখক ঃ সুশীল জাটী

ঃঃ সূচীপত্র ঃঃ

স্বাধীন ভ্রমণ ২য় পর্ব
(চরৈবেতীর সঙ্গে)
দাক্ষিণাত্য

(পূর্বকথায় চরৈবেতী সম্বন্ধে কিছু লিখেছি পাঠকদের সুবিধার্থে।)

কোচ পাবার বন্দোবস্ত হতেই কার্যকরী সংস্থা তৈরী হয়ে গেল। সভাপতি শ্রী দেবেন্দ্রনাথ বর্মন SS/N.ম্যানেজার কানন বিহারী নস্কর ASN ,সম্পাদক বদরিকা প্রসাদ সেন করনিক MIDC , কোষাধ্যক্ষ রবীন্দ্রনাথ রায় সাইন রাইটার, সহকারী সম্পাদক -নবেন্দু বাঙাল ক্যারেজ পেন্টার, সহকারী কোষাধ্যক্ষ বিদ্যুৎ মজুমদার ক্যারেজ পেন্টার। সাধারণ সদস্য -দেবকুমার মুখার্জী, সিদ্ধেশ্বর দাস, হরিহর সাতরা, কাশীনাথ বাগ ও কেশব ঘড়ুই (কার্পেন্টার) (আমার বা প্রবীরের নামই নেই)!

এই জাতীয় ভ্রমণে কোন কিউবে কে থাকবে তা নির্ধারিত করা বেশ মুস্কিলের, জানিনা সেবারে এ কাজটি কে করে ছিলেন। হেড অফিসের এক ক্লার্ককে নবেন্দু আর গুপিদা (গোপিমোহন গাংগুলি-চন্দননগর) টাকা দিয়ে এসেছিল -তিনিই ট্রেন পথের প্রোগ্রামটা কনফার্ম করে দিয়েছিলেন। এ্যাটাচমেন্টের কোন কপি ছিলনা। তবে মনোগ্রাম ওয়ালা সুন্দর প্যাড ছিল। গাড়ীর গায়ে দুপাশে ঝোলানোর জন্য কাপড়ে লেখা হয়েছিল। নানা জনে নানা কাজ করেছিল। ওয়ার্কশপের মধ্যেই গাড়ি, ফলে সাজানো হয়েছিল সুন্দর ভাবে। আমার ওপর শেষদিন ভার পড়েছিল A-সপ থেকে কয়লা তোলার। সেটা সুষ্টভাবেই করে দিয়েছিলাম। নবেন্দু বা বিদ্যুৎ দা আমায় বিশেষ পাত্তা দিচ্ছে না দেখে বেশ অভিমানাহত হয়েছিলাম।

(পাঠকের কাছে অনুরোধ -মনে রাখবেন, ১৯২৫ সালের মার্চমাসে এই ভ্রমণ করেছিলাম । সেই যাত্রাপথের অনেকেই বর্তমানে প্রয়াত তাদের পরিবারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি -তবু মনে রাখতে হবে -যা লিখছি তা আমার দৃষ্টিভঙ্গীতে, মামলা করলে হেরে যাবো জেনেও লিখছি।)

ট্রেন ছাড়ার ঘন্টা দুই আগে হাওড়ায় পৌছেছিলাম। বাড়ির থেকে কেউ আসেনি। একটা ব্যাগে নিয়েছি জামা কাপড়, একটা কাপড়ের ব্যাগে নানান দরকারী টুকিটাকী জিনিস। ২৫ দিনের ট্যুর-পথে সুযোগ পেলে জামা কাপড়ে সাবান দিতে হবে। খরচ হিসাবে নেওয়া হয়েছে মাথাপিছু পঞ্চাশ টাকা শুধু থাকা ও খাওয়ার জন্য। স্পটকালেকশন হবে। চলন্তগাড়িতে রান্না

হবে তাই নানা বস্তু এবং তৈজসপত্রাদি পূর্বেই আহরিত। কাচা আনাজ সদ্যসংগৃহীত। এই গাড়িতে ৬৩ তেষট্টি বার্থ আছে-যতজন যাত্রী ততটাই বার্থ। ফার্ষ্ট ক্লাশ আছে তাতে নস্করদা যাচ্ছেন চারটেসীট মা, বৌ, বাচ্ছা,আছে সঙ্গে।

সকলের ব্যাগব্যাগেজ মিলে বিশাল মালের স্তুপ। প্রায় ঘন্টা খানেক আগে মাদ্রাজ জনতা এক্সপ্রেস ষ্টেশনে প্লেস করেদিল। আমরা ধীরে সুস্থে বেশ কয়েকবারে মালপত্র নিজেদের কামরার সামনে এনে দিলাম। কয়েকজন তা গুছিয়ে রাখলো।

ভ্রমণ সুরু। প্রথম কুপেতেই রেখেছে আমাদের। বাচ্ছারা না দরজাখুলে সমস্যা সৃষ্টি করে অথবা বহিরাগতরা যাতে সহজে না ঢুকতে পারে তা দেখাই আমাদেব প্রধান কর্তব্য। কিউবের ত্রিতলে আমার স্থান। দ্বিতলে নরেশ উকিল, প্রথম তলে বিদ্যুৎদা-অন্যদিকে প্রবীর দত্ত, পঙ্কজ হালদার আর নবেন্দু। পাশের বার্থের ওপরে কেশব ঘড়ুই নীচে কাশীনাথ বাগ। মালপত্র রাখলাম। রান্নাঘর সামলাতে নবেন্দু, কাশীদা আর কেশবদা চলে গেল। মালপত্রের কিছু অংশ বার্থে রেখে নামলাম। পংকজ বললো, টাকা কড়ির ব্যাপারে খুব সাবধান জাটীদা অনেক অচেনা মানুষ। বসলাম "টাকা তো বেশি আনিনি ভাই, পাবোই বা কোথায়? গরীব মানুষ, তুমি বরং সাবধানে থেকো"। নরেশ বললো "মেজদা (মেজদা হচ্ছে বিদ্যুৎ দা) থাকতে ভয়নেই, ওর কাছে রেখে যাবো-যমে ছুঁতে পারবে না"। নরেশ উকিল এবং পংকজ হালদার- আমাদের জুনিয়র ব্যাচের এক্স ট্রেড এ্যাপ্রেন্টিস। উকিলের বাবা সত্যই ল-ইয়ার আর পংকজের বাবা হাওড়া শহরের বিখ্যাত চিকিৎসক।

কাশীনাথ বাগ-বিদ্যুৎ দার ব্যাচ মেট, জঙ্গল পাড়ার চাষীর বাড়ির সন্তান, কালো কেষ্ট ঠাকুরের মত দেখতে। কেশব ঘড়ুই এও এক্স ট্রেড এপ্রেন্টিস কার্পেন্টার কর্নধর ঘড়ুই এর খড়তুতো ভাই। (বিদ্যুৎদাকে আর কর্নদাকে আগের পর্বের কাহিনীতে পাওয়া যাবে।) টাকা নিয়ে কথা হচ্ছিল কজনের মধ্যে এর মাঝে কালিদা এসে গেলেন (কালিপদ আদক, সাইন রাইটার) সঙ্গে দুই কন্যা (বাচ্চু আর বুড়ু। এদের নামে বয়সের বৈপরীত্য বাচ্চু বড় বছর ১১, বুড়ু ছোট বছর ৯) বললেন "জাটীদা এদের আনলাম আপনার কাছে আপনার গল্প শুনতে। নরেশ বললো তাস এনেছি-তা হোক জাটীদার গলপই শোনা যাক। প্রবীর বললো সেই ভালো। কিউবে (কিউবিকল/ক্যুপে) জমিয়ে বসলাম সবাই মিলে। নবেন্দু এসে গেল চায়ের কেটলি নিয়ে। সে নিজে চা খায় না। নরেশ বললো "ডাকলেন না কেন"? বলে কেটলিটা নিয়ে নিল। আমি একটা ষ্টিল মগ আর

অ্যালুমিনিয়ামের থালা এনেছি, কানা উঁচু, বাটি আনিনি, গ্লাশ আনিনি (এই মগটা আজও আছে। দল থেকে বলা হয়েছিল থালা বাটি গ্লাস আনতে) তাতে চা নিয়ে বললাম "নাম বল, কোথায় কী পড় তা জানাও, কী রকম গল্প শুনতে চাও-তাও বলো।" "আমার নাম শিখা, দিদিরনাম অনীতা। আমি থ্রিতে পড়ি দিদি ফাইভে পড়ে। হাওড়া পঞ্চাননতলা স্কুলে পড়ি।" নরেশ বললো , তোর দিদিকী বোবা? বুড়ু বললো "লজ্জা পাচ্ছে তো!" বিদ্যুৎদা এতক্ষনে বিস্কুট এনে বললো "নাও"। ওরা নিলেও আমি নিতে নারাজ হলাম। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট খেতে ইচ্ছে হয় না। বিদ্যুৎদা বললো, ভাগের জিনিস নিয়ে নাও। বললাম ওসব তুমি বোঝো। বিদ্যুৎদা ছটা বিস্কুট নিজের ব্যাগে রেখে চলে গেল।

(না, এত ডিটেলস কারোর ভাল লাগবে না।) ওদের দুজনকে বলার ছলে সকলকেই জানালাম-আমরা চলেছি দক্ষিণ ভারতে। দক্ষিণ ভারত আর্যাবর্ত্তের সঙ্গে অনেক পরে জুড়েছে। গন্ডোয়ানাল্যান্ডের আংশ ছিল এই দক্ষিণ ভূভাগ, আদিম অধিবাসীদের বলা হতো গোঁড়। এদের কোনো বর্ণমালা আজও পাওয়া যায়নি। এই যোগাযোগের সময়েই বিন্ধ্যপর্বতমালা বসে যায়, ধীরে ধীরে আজও নামছে-এই ধীরে ধীরে বসার ফলে নর্মদা, শোন প্রভৃতি নদীতে জল আজও ওঠে। সবাই, এমনকি প্রবীরও মানতে চাইছিল না এই তথ্য কী আর করা যাবে। তবু জানালাম যে এরই ফলে হিমালয়ের উত্থান, আরাবল্লীর দিক পরিবর্তন, রাজস্থানে মরুভূমির সৃষ্টি। ছোটদের জানালাম এসব তথ্য এবং তত্ত্ব আমার নয়, আমিও পড়েছি। প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ভূতাত্ত্বিকরা এসব নিয়ে নানা গবেষণা করছেন। দক্ষিণ ভারতের দুপাশেই সাগর, আমরা এখন পূর্ব দিক দিয়ে যাচ্ছি-এদিকে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিম দিকে আরব সাগর। এদিকে পূর্বঘাট পর্বতমালা ওদিকে পশ্চিম ঘাট পর্বত মালা। সমগ্র দাক্ষিণাত্য আসলে একটি মালভূমি তবুও সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ৮০০০ আট হাজার ফুটের বেশি নয়। এর অধিকাংশই আগ্নেয় শিলায় গঠিত। হয়তো কোন বছরে দোদাবেতায় (এটি উটির কাছে) বরফ জমে কিন্তু হিমালয় সর্বসময়েই তুষার মন্ডিত, গড় উচ্চতা ১৩০০০ ফুট। আলো নিভে গেল। অন্য কামরায় আলো জ্বলছে। নবেন্দুর ডাক শোনা গেল-'গুরুপদ' বিদ্যুৎদা গেল টর্চনিয়ে। কয়েকজন সবেমাত্র খেতে বসতে যাচ্ছিলেন। আজ দলের কোন নৈশাহার হবে না জানানো ছিলই। প্রত্যেকেই খাবার এনেছে। গুরুপদ-

গাড়ির বিদ্যুতের ব্যাপারে রীতিমত দক্ষকর্মী। (নবেন্দুর পাড়ায় থাকে। খুব ভাল ভক্তিমূলক গান গায়) ফলে দ্রুতই আলো ফিরে এলো। কালিদারা চলে গেল। নবেন্দু এসে বললো, পার্টির জন্য দুটো বড় বক্স টর্চ কিনতে হবে। কাশীদা আর কেশবদা ভাত এনেছিল ওরা দ্রুত খেয়ে নিল। আমরা ছজনেই লুচি এবং মিষ্টি। নবেন্দু বললো, সবটা খাওয়া যাবে না। জাটী আর প্রবীর এনেছে কড়াপাকের সন্দেশ এগুলো পরে খাওয়া যাবে। বিদ্যুৎদা বললো "লুচিও কিছু বাঁচবে"। নরেশ বললো "ওগুলো কাল খেয়ে নেব"। খাওয়া শেষ হতে বাসন পত্র ধুয়ে সব পংকজের দায়িত্বে রেখে দিয়ে বিদ্যুৎদা বললো "পংকজ হলো এই কিউবের কোয়ার্টার মাষ্টার"। পংকজ কিছু না বলে হেসেই দায়িত্ব নিল। কাশীদা আর কেশবদা জানালো "আমাদের বাসন থাকবে হরিদার কাছে।" পংকজ বললো, "তাতে আমারই কাজ কমলো"।

দাঁত মেজে শুয়ে পড়ার আগে নবেন্দু বললো, "চল খুড়ো দরজা গুলো দেখে আসি"। সবাই শুয়ে পড়েছে। ম্যানেজার কার-ফার্ষ্ট ক্লাশ বন্ধ-ভিতরেও কোন শব্দ নেই। রান্নাঘরের পাশেই রাধুনি গঙ্গাদা (পলিশার) চুপ চাপ বসে, বললেন, "ভদ্রক থেকে চালটা উঠিয়ে নিয়ে শোবো"। বদরিকা দা (সম্পাদক) বললেন, "নবেন্দু একটু জেগে থেকো"। নবেন্দু বললো "শুয়ে পড়ুন ডেকে দেব"। দক্ষিণে সাধারণত আতপ চাল চলে। নারকেলের তেলে রান্না হয়, খুব তেঁতুল খায় ওরা। ফলে দল থেকে প্রস্তুতি নিয়েই যাচ্ছি। সরষের তেলের একটা ষোলো কিলোর টিন তোলা হয়েছে হাওড়া থেকে। আলু, পিঁয়াজ, ট্যমাটোও তোলা হয়েছে অনেক। শুয়ে পড়লাম।

আশু, দেবুদারাই উঠেছিল ভদ্রকে, নবেন্দু-বিদ্যুৎদাও হয়তো নেমেছিল। আমি আধো জাগ্রত ছিলাম, উঠিনি। ঘুমভাঙলো প্রবীরের ঠেলায়। উঠে দেখি, তখনও আলো ফোটেনি ভাল করে। প্রশ্ন করতে বললো, "চিল্কা দেখবো-শুনেছি ট্রেন থেকে দেখা যায়"। নামলাম দুজনেই। খুরদা রোড। বললাম "অনেক দেরী আছে।" "না না গাড়ি বেশ দ্রুত টানছে। ভাল ঘুম হচ্ছে না, চলো না-করিডোরে দাঁড়াই।" 'চলো বাঙলার মতো নয়।' দুপাশে মাঝে মধ্যে ছোট ছোট টিলা দেখা যাচ্ছে। সুনিবিড় অন্ধকারে মাঝে মধ্যে মিটমিটে আলো।

ট্রেন সত্যিই খুব জোরে ছুটছে। খড়গপুর পর্যন্ত টিকিয়ে চলছিল। রম্ভা ষ্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতে দুজনে ফিরে এসে শুলাম। প্রবীরকে আমার রম্ভা বেড়াবার কথা বললাম। চিল্কা একেবারে লাইনের পাশে চলে এসেছে কোথাও কোথাও। দু একটা দ্বীপের আভাস পাওয়া গেল-কিছু জেলে আর কিছু পাখির ওড়াওড়ি দেখা গেল। এরই মধ্যে বিদ্যুৎদা এসে প্রভাতী চা পান করিয়ে গেল। জানাল "সামান্য করা হয়েছে"।

এখন দোলের ছুটি, আবহাওয়ায় বাসন্তী মেজাজ। শুয়ে শুয়ে সময় কাটাতে ইচ্ছে হচ্ছিল না-তাই উঠে প্রভাতী কার্যাদি সেরে এসে সবাইকে তুলে বাংক তুলে বসা গেল। নবেন্দু আমার পরিত্যক্ত বিছানায় এবং প্রবীর তার বিছানায় শুয়ে রইল। দেবুদা এসে গেল প্রশান্ত কুন্ডুকে সঙ্গে নিয়ে গল্প করে গেল। দেবুদা শালকিয়ার লোক। খুব হাসির গল্প বলেন। তবে সবই যৌনগন্ধী-লিলুয়ায় মানিয়ে যায়। ছোটদের মধ্যে বলা যায় না। প্রশান্ত কুন্ডু বালির বিখ্যাত হোলে কুন্ডু, মোলে কুন্ডু বাড়ির সন্তান। বর্তমানে সেমিস্কিল্ড-দীর্ঘদেহী ক্ষিপ্র এবং কর্মে তৎপর এই যুবকটি যে কোন দলের পক্ষে বরনীয়, খুব বিনীত এর ব্যবহার। দেবুদা বললেন,"হলধর আর মল্লিনাথ কুন্ডু বালি নিমতলা শ্মশান ঘাটের কাছে ছোট একটা দোকান দেন। সেই দোকানে নবজাতকের জন্য যা যা দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, আর মৃতদেহের জন্য তার স্বজনদের জন্য যা যা দ্রব্যের প্রয়োজন তা পাওয়া যেত-ফলে কদিনেই তারা হোলে কুন্ড নামে পরিচিত হয়ে যান"।প্রশান্ত বললো "বদ্রুদার (সমর ব্যানার্জী-ভারতীয় ফুটবল অধিনায়ক) বাড়ির কাছে থাকি"। প্রশ্নকরি "ফুটবল খেলো নাকি"? বললো, সবই একটু একটু করি।

আজ সারা দিনই চলন্ত গাড়িতে থাকতে হবে। বেরহামপুরে নরেশ বললো "জাটীদা তাস খেলবো"। বিদ্যুৎদা বললো স্নান সেরে নাও গে তলায় নেমে। ট্যাংকে জল ভরছে। দেখি বিদ্যুৎদা স্নান সেরে নিয়েছে । বা: প্রায় সবাই, মেয়েরা ছাড়া নেমে পড়েছে। আমার ভাগ্য ছিল খারাপ-মাথা বাড়িয়ে জল নিয়েছি অমনি ট্রেন উঠলো নোড়ে। ফলে কাক স্নানই ভরসা । দৌড়ে ভিজে লুঙ্গি পরে হ্যান্ডেল ধরে হিঁচড়ে উঠে পড়লাম।

পোষাক পাল্টে হাতে আবার চা পেলাম, বিদ্যুৎদাই দিল। এর আগে পংকজ টিফিন খাইয়েছে। আজ টিফিন হয়েছিল চিড়েভাজা বাদাম। এখন হচ্ছে মাছের ঝোল ভাত। মাছ? মাছ কোথা থেকে এলো? গঙ্গাদা খুরদা রোডে কিনেছে-সাত কিলোর দুটো ভেটকী। বা ভালই। নরেশের সঙ্গে তাসে বসে গেল কাশীদা। অন্যদিকে আশুতোষ চক্রবর্ত্তী আর নবেন্দু। আশু দক্ষিণেশ্বরে থাকে। কালো ল্যানকি ফিগার, চাটগায়ের লোক।

আমি চলে গেলাম কালিদার কাছে। বকতে ভালবাসি, জ্ঞান দিতে ভালবাসি। মনে গর্ব শ্রমিকদের মধ্যে প্রথম গ্র্যাজুয়েট । শ্রমিকরা অনেকেই বিদ্যার মূল্য বোঝেনা-কেউ কেউ আবার বেশি শ্রদ্ধা দেখায়, তখন লজ্জা পাই। কালিদা বয়সে অনেকটা বড়ো তবু আপনি আজ্ঞেই করেন জাটীদা বলেন। যেতেই সরে বসে জায়গা দিলেন। বললেন "বাচ্চু জেটিদা এসে গেছেন, যা জানতে চাইছিলি জেনে নে" "না না আমি সবজান্তা নই-ঠিক বলতে পারবো না"। বুড়ু বললো "কাকা কী কী দেখবো, তার সম্বন্ধে যা জান বলো"। "যে সব যখন দেখা হবে তখন বলা যাবে-সবতো নিজেই জানি না। তোমরা ছোট সবে মাত্র ভূগোল ইতিহাস পড়ছ। সেই ভাবে জানো। এটা জেনে রাখো মানুষ বেড়ে গেলেই জায়গা চাই। ভারতে যখন আর্যজাতি এলো, তার আগে থেকেই অন্যান্য মানুষরা ছিলেন, তাদের মধ্যেও তখন নানা ভাগ-তবে প্রধাণত ঐতিহাসিকরা লেখেন দ্রাবিড় ও অনার্য্য। দ্রাবিড়রা অনার্য্য থেকে পৃথক তো ছিলেন, উন্নত ছিলেন, সভ্যতা, সংস্কৃতির জনকও ছিলেন এই মূল ভারতীয় ভূখন্ডের। তোমরা জানো, জলই জীবন। ফলে মানুষকে বাসা বাধতে হতো জলের কাছেই . তাইই সিন্ধু সভ্যতা হরপ্পা সভ্যতা গড়ে ওঠে নদীর তীরে। আর্যরাও এসে প্রথম বাসা বাধলো সেই সিন্ধুনদের কাছেই। তাই ভুল উচ্চারণে আমরা হিন্দু হয়ে গেলাম। না অন্য দিকে চলেযাচ্ছি। আমাদের আলোচনা হবে দক্ষিণ ভারত কেন্দ্রিক। রামায়ণ পড়ে জানা যায় রামই প্রথম দক্ষিণভারত জয় করেন। অগস্ত্যমুনিই বিন্ধ্য পেরিয়ে প্রথম পদপাত করেন দক্ষিন ভারতে। ফলে রামের যাওয়ার আগেই ওখানে আর্য্য অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বলে ধরে নিতে হয়। পংকজ এসে জানাল "এবার খাবার দেওয়া হবে সবাই রেডি হোন" ফলে গল্প গেল থেমে।
খেয়ে প্রায় সকলেই শুয়ে পড়লো। স্বাভাবিক -গতরাত্রে সকলের ঘুম ভাল হয়নি। কারণ সারা রাত্রির যাত্রার অভিজ্ঞতা প্রায় কারোরই নেই এমন ভাবে দলগত অভিযানও আগে করেনি অনেকে। তারপর মাল উঠেছে মাঝপথে।

কিন্তু আমি যে 'দিবা ন শাপসি' তে বিশ্বাসী। কি আর করি- বিদ্যুৎদার পায়ের কাছে বসে বাইরে চোখ মেললাম, সেখানেও মাঝে মাঝে পাহাড় টিলারা দৃষ্টিকে ব্যাহত করছে। বিশাখাপত্তনমে এসে গেলাম। এখানে অনেকটা পথ যেতে আসতে দুবারই ব্যবহৃত হয় বলে জানি। জানি বিশাখ মানে কার্ত্তিক। কার্ত্তিক দক্ষিণ ভারতে খুব পূজিত হন। সুব্রক্ষণ্যত্ত সেই কার্ত্তিকেয়-দের সেনাপতি। অবশ্য এখানে বিশাখ মন্দির আছে কিনা জানিনা। পরে সুযোগমত আসবো।

ট্রেন এক্সপ্রেসগতিতেই দৌড়াচ্ছে। জানা গেল রাইট টাইম। এখনও সকলের সাথে পরিচিত হইনি। অবশ্যই সকলে রেলকর্মচারীও তাদের পরিবার। সম্পাদক বদরিকাদার সঙ্গেও পরিচয় হয়নি। শুনেছি সপরিবারে এসেছেন। দেবুদার মুখে শুনেছি-সাইন রাইটার সেকশনের সুনীল সেনের সহোদর দাদা, **MIDC** র হেড ক্লার্ক। শুনেছি বৌ নাকি সুন্দরী আর হেভিডাটিয়াল-দুটো পুত্রসন্তানের মা বলে নাকি বোঝা যায়না। সুনীল সেনদাও খুব গ্রাম্ভরী মার্কা রং ঘরেও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নেই। বসে বসে নানা কথা ভাবছিলাম। ওরা উঠে বাংক্ তুলে ফেলতে স্বস্তি পেলাম। সামান্য পরই নরেশের ডাকে তাসে বসা গেল। রাত্রে লুচি আলুরদম আর লাড্ডু দেওয়া হল। লিখতে ভুলেছি সকালেও বাসি লুচি খেয়েছি চিড়ে বাদাম ভাজাগুলোও সব জমিয়ে রেখেছে বিদ্যুৎদা আর পংকজ। খানিকটা গল্প করে, তাস খেলে সময় কাটিয়ে শুয়ে পড়লাম যে যার বার্থে। নবেন্দু বললো "খুড়ো রাত্রে আবার উঠতে হবে। GUDUR এ গাড়ি কেটে রেখে যাবে-পরে টেনে নিয়ে যাবে রেনিগুন্টা, সেখান থেকে তিরুপতি, কাঞ্চীপুবম দেখবো। "প্রয়োজনে ডাকিস"। বলে ত্রিতলে (UPPER BERTH) উঠে গেলাম।

নবেন্দুর ডাকে যখন উঠলাম তখন প্রায় রাত্রি একটা। আমাদের কোচটা কেটে চলে গেছে মাদ্রাজ জনতা এক্সপ্রেস। বিজয়ওয়াড়ায় কোচটা শেষে এনেছিল এই জন্যই। নবেন্দু আর আমি ছাড়া কেউ জেগে নেই। কোথায় তোর ম্যানেজার সেক্রেটারী? জানতে চাইতে নবেন্দু বললো, চেপে যা, কাজ কর্ম শিখে নিতে দে- তারপর ওদের তাড়িয়েদেব। প্রায় আধঘন্টা পরে **ASM** এলেন। কিন্তু ল্যাংগুয়েজে বেরিয়ার (ভাষার বাধা)- উনি বাংলা জানেন না। আমরা তামিল জানি না। দুপক্ষই ভাল ইংরাজীও জানিনা। যাইহোক তিনি বোঝালেন লিখিতভাবে এ্যাটাচমেন্টের দরখাস্ত না পেলে উনি প্যাসেঞ্জারে গাড়িটা জুড়তে পারছেননা। কাগজ পত্র তো সব

ম্যানেজার কিংবা সেক্রেটারীর কাছে। নবেন্দু গিয়ে বিদ্যুতের কাছ থেকে চরৈবেতীর প্যাড এনে দিল, আমি লিখলাম তার নির্দেশ মত-উনি ধন্যবাদ জানিয়ে ইঙ্গিতে ঘুমুতে যাবার কথা বলে চলে গেলেন। কিন্তু ঘুম এত সহজে আসে? গাড়ি জুড়েদিল প্যাসেঞ্জারে, কিছুক্ষণ পরে দেখি TIRUPATI EAST ষ্টেশন। তাকে ছাড়িয়ে আরো কিছুক্ষণ পরে এল RENIGUNTA অনেকক্ষণ পরে কোচটাকে পিলগ্রিম প্লাটফর্মে রাখলো। বেশ নির্জন, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। প্লাটফর্মে ছোট ছোট ফুলের গাছও আছে। এতক্ষণে বোঝা গেল সকলেই জেগে ছিল। সবাই প্রস্তুত তিরুপতি দর্শনে যাবার জন্যে। ওরা কিছু না খেয়েই তিরুপতিতে বালাজী দর্শনে চলে গেল। গাড়িতে রয়েছি শুধু আমি, নবেন্দু আর বিদ্যুৎদা। এমন ভাবে পুরো গাড়ি ফেলে যাবার রিস্ক নেয়নি নবেন্দু। সম্পাদকের সাথে নবেন্দুর কথা হয়েছে আগামী কাল সকালে বেরিয়ে আমরা তিনজন পরেরদিন পার্টির সঙ্গে কাঞ্চীপুরম রেলষ্টেশনে দেখা করবো। সমস্যা নেই, এখানে চারদিন কোচটা থাকবে। কোচটা এখন আমাদের চলমান বাড়ি।

চেকাররা এলেন। কাগজপত্র দেখতে চাইলেন। বোললাম, We will stay here for four days. Secretary has gone to visit TIRU PATI. All the papers are in his custody, we are but nominals. Come in the evening or to morrow. "Send him with all the papers" বলে চলে গেলেন। নবেন্দু বললো সন্ধ্যে বেলাই পাঠাবো। বিদ্যুৎদা ষ্টোভে রাঁধলো-এতো কারখানায় প্রায় প্রত্যহ খাই। দুপুরে বিদ্যুৎদা ঘুমালো। আমরা দুজন নানা আলোচনা করলাম। বিদ্যুৎদার করা চা পান করছি তখন ওরা ফিরলো ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, কেমন যেন নীরবতা। মনে হচ্ছে অস্নাত অভুক্ত। গঙ্গাদা দ্রুত চা চাপাতে গেল। আশু আর কুন্ডু বিস্কুটের টিন নিয়ে জনে জনে চারটে করে বিস্কুট দিল। নিজেরা কটা করে খেয়েছে কে জানে। কেউ স্নানে ঢুকছে। নবেন্দু বললো "যাই সেনদাকে ষ্টেশনে পাঠাই"। প্রবীরকে কিছু প্রশ্ন করার আগেই বললো "জীবনে আর তিরুপতি আসবো না। দূর থেকেই নমস্কার জানাবো"। নরেশ বললো, "উঃ কী কষ্ট যে পেয়েছি। সব শালা হারামী। খাঁচার মধ্যেও পকেটমার, গুন্ডা, পান্ডা, ৮৫টাকা, পঞ্চাশ টাকা বা তার বেশিরা সহজেই ঠাকুর দেখতে পায়-সাধারণ যাত্রীদের খাচায়

ঢুকিয়ে নেয়-হাজার দুয়েক লোক, দাঁড়িয়ে আছে খাঁচা। দু ঘন্টায় একটা খাঁচা মন্দিরের গেটে যায়-রেল পাতা আছে খাঁচার জন্য। খাবারের দাম আকাশ ছোঁওয়া-বাইরেও কোন দোকান নেই" -ইত্যাদি শুনে আমার রাগ হয়ে গেল। তবু সরেজমিনে দেখবো বলে যাবার সিদ্ধান্ত বহাল রাখলাম। বিদ্যুৎদা বললো, " তবে আমি যাবো না"।

কিছু পরেই নবেন্দু এসে বললো, "জাটী সর্বনাশ হয়ে গেছে"। জানা গেল, বদরিকাদা বলেছেন, রবির সব টাকা পকেটমার হয়ে গেছে। বিদ্যুৎদা বললো , " দেখলে তো পার্টির ক্যাশটা তাই আমি ছাড়িনি"। মনে ভরসা এল, যাক যা গেছে তা একা রবিদারই গেছে। তবু দায়িত্ব তো ছাড়া যায় না। রবিদার বৌ যশোদা নবেন্দুর পাড়াতুতো বোন। সে রবিদার দ্বিতীয়পক্ষের সদ্য বিবাহিতা যুবতী, সঙ্গে রয়েছে আগের পক্ষের হাবা কালা অপরূপা সুন্দরী এক বালিকা কন্যা। সে সকলের নয়নমনি হয়ে উঠেছে-সকলের কাছেই সে সহজ। আশুর সঙ্গে তার খুব ভাব। আশু, দেবুদা, কুন্ডু বললো, "জাটীদা একটু যান না"।

ফলে বাধ্য হয়েই এ বিষয়ে মাথা গলালাম। রবিদা ভ্রমণ শেষ না করেই বাড়ি ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বৌদি কন্যাকে বুকে টেনে কাঁদছে। জানা গেল মানি ব্যাগে আড়াইশোর মত টাকা ছিল। রেলের পাশ, পিটিও ছিল। দেড়শো টাকা দেওয়া আছে পার্টিকে। বিদ্যুৎকে বলে, প্রয়োজনে ধার নিয়ে ফিরে যাবে। বললাম, "এখন কিছু খান, শান্ত হন, বৌদি যান, স্নানাহার করুন। রেলের কী আইন জেনে তবে আপনাকে যেতে দেব"। আশু প্রায় জোর করেই ওদের নিয়ে গেল রান্না ঘরের দিকে। আমি নবেন্দুকে নিয়ে ষ্টেশনে গেলাম। বললাম, "ভাল ইংরাজী তো জানি না - সেনদা বা নস্করদাকে ডেকে নে"। নবেন্দু বললো-"ওরা যদি পারতো তবে তোকে ডাকাতাম নাকি আশুকে দিয়ে। চল্ আমরাই যা পারি করবো"। সত্যিই তো রবিদার মত ডার্টি এক ওয়ার্কার চলে গেলে ওদের কী এসে গেল? চেকার সব শুনে বললেন, " Oh it's a very rare case, even then, go and make a diary in R.P.F. office and you should meet MR ARIJITSEN, a T.C. a BENGALI, who may help you," বলে মিঃ সেনের কোয়ার্টার নাম্বারটা একটা ছোট্ট কাগজে লিখে দিলেন। আবার গাড়িতে ফিরে কপি থেকে রবিদার পাশের নাম্বার লিখে নিলাম। রবিদার পরিবারকে আশ্বস্ত

করে দুজনে গেলাম কোয়ার্টার খুঁজতে। তখন রাত প্রায় আটটা বাজে, খুজে পেলাম কোয়ার্টার। ওনার স্ত্রী দরজা খুলে অবাক। সময় নিয়ে সব বললাম। উনি ঘরে বসিয়ে বললেন, "উনি খাচ্ছেন"। অপরিচিত হলেও প্রবাসে বাঙালী জেনেই দরজা খুলেছিলেন-নইলে কী যে হতো। সেনদাকে আবার সব বললাম। (সেনদা বলছি এই জন্য যে উনি জানালেন উনি প্রপার হুগলীর ছেলে) কিছুটা সহজ হয়ে বললেন, "চলুন ষ্টেশানে যাই"। ওনার স্ত্রী বললেন, "কাল সকালে যেও। এই রেললাইনের পাশের রাস্তাটা তো ভাল নয়"। "ছিনতাই হয় নাকি?" প্রশ্নের জবাব না দিয়ে দাদা বললেন, এসবে কাজ যতটা আগে করা যায় ততই মঙ্গল। নবেন্দু বললো, "দরজা বন্ধ করে বসুন দিদি আমরা কাজ মিটিয়েই পালাবো না। দাদাকে এখানে পৌছে দিয়ে ফিরবো। তাড়াটা আমাদেরই-দুজনেই কাল সকালে তিরুপতি যাবো।" বৌদি দরজা বন্ধ করতে আমরা তিনজনে পথে নামলাম।

রেল ষ্টেশনে এসে DIARY করে তার কাগজ নিলেন। রবিদাকে ডাকিয়ে আনালেন। দরখাস্ত লিখে রবিদাকে দিয়ে সই করালেন-তাতে ষ্টেশন মাষ্টারের ষ্ট্যাম্প মারালেন। পরে টেলিগ্রাম করলেন হাওড়ায় রেল অফিসে। আটটাকা চাইতে আমিই দিলাম। বললেন, "এই ডায়েরীর কাগজটা এবং দরখাস্তটাই আপনার পাশের কাজ করবে"। রবিদা এতক্ষণে সহজ হয়ে হাসলো, বললো, "মাত্র আট টাকা খরচ? জাটী চলো এখুনি গিয়ে তোমায় দিয়ে দেব"। নবেন্দু বললো, "না রবিদা ওআর দিতে হবে না, আপনাদের মুখের হাসি ওর চাইতে অনেক দামী"। সেনদা বললেন," ধন্যবাদ নবেন্দু বাবু-আপনি খুব দামী একটা কথা বললেন।" রবিদাকে ষ্টেশনে ছেড়ে দিয়ে কাগজগুলো সাবধানে রাখতে বলে সেনদাকে কোয়ার্টারে পৌছে দিয়ে এলাম। বৌদি ধন্যবাদ জানিয়ে কিছু খেয়ে যেতে বললেন। আমরা সবিনয়ে অপারগতার কথা বলে দ্রুত ফিরে খেয়ে নিলাম। ততক্ষণে আমরা দুজন গাড়িতে দারুণ আলোচ্য বিষয় হয়ে গেছি। জনে জনে সবাই প্রসংশা করছে। যশো বৌদি চুপি চুপি আমাকে বললেন, "টাকাটা নিয়ে নিন- আমাদের ঋনী রাখবেন না।" বললাম "ওদিতে হলে নবেন্দুকে দিন"। "আমার কাছে টাকা আছে তা আপনার দাদা জানে না"। নবেন্দু আমায় খুড়ো বলে, "সে হিসাবে আমায় তো কাকা বলতে হয়! "আমি আপনার দাদার কথাই বলছি।" "সে তো ঠিক কাজই বৌদি বেড়াতে বেরুলে টাকা একজায়গায়, একজনের কাছে রাখতে

নেই”। যাই হোক, টাকা নিইনি-দাঁত মেজে শুয়ে পড়লাম। কাল সকাল থেকে আমার ভ্রমণ শুরু হবে।

বাসে উঠে প্রথমেই জায়গা পাইনি। বাসে জনা দশেক দাঁড়িয়ে যাচ্ছি। নবেন্দু কিছুক্ষণ পরে একটা সীট পেল। সামান্য পরই একটা সীট পেলাম। পাশে একজন তামিল ভদ্রলোক, সুটেড বুটেড প্রশ্ন করলেন, “ whether from Bengal “yes” “Student” No. working at Rly workshop at liluah, near Howrah. Now a tourist in your land. Going to visit Tirupati Pardon what you are? বললাম। A proffessor of Archeology. Hear, you are going to visit Tirumalai which is situated at the top of a hill. not the real Tirupati. which is really a highly appreciable archelogical monument. উনি আমার বিনয়ে হাসলেন, থেমে থেমে বললেন। Sorry never never heard alike, Any way,we are tourists. a novish yet, please tell it all,I know not Tamil, know little English only” নবেন্দুকে বললাম বাস ষ্টপেজে নেমে। বাসের টার্মিনাস এটা। সবাই নেমে পড়েছে। নবেন্দু জোরে ডাকলো, “প্রফেসর” উনি ফিরে দাঁড়ালেন। বললাম, we will accompany you. “Nothing to tell, but to see. Come along with me. I may tell you something there.” বাধ্য ছাত্রের মতই সেই অধ্যাপকের সঙ্গ নিলাম। রেল ষ্টেশন দেখলাম, সাদামাটা। সামান্য কয়েকটি ট্রেন চলে GUDUR RENIGUNTA SECTION এ। উনি দেবস্থানম বাস টার্মিনাস ওদের অফিসঘর ইত্যাদি দেখালেন। ওনার কথামত চলে তিরুপতি মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। বিপুল বিষ্ময়ভরা চোখে জীবনে প্রথম গোপুরম দেখলাম। বিশাল উচ্চতা ন'দশ তলা উচুঁ বেলে পাথরের। প্রবেশ পথ প্রস্থেও বিশাল, সামনে প্রশস্ত চত্ত্বর। হাফকাট (অর্ধ ক্ষোদিত) ভাস্কর্যে রামায়ণ মহাভারতের নানা কাহিনীর রূপচিত্রণ। দেখছি, নবেন্দুকে নানা কথা বলছি-তারি মধ্যে অধ্যাপক এক সাদা পোষাকের যুবতীর সঙ্গে কথা বললেন। মেয়েটা দুদিকেই ঘাড় বাঁকিয়ে

চলে গেল। প্রায় মিনিট চল্লিশ লেগে গেল মন্দির প্রদক্ষিণে। অধ্যাপক ইংরাজীতে বলে যাচ্ছেন, আমরা শুনছি, দেখছি, নিজেদের সৌভাগ্যের কথা ভেবে আনন্দ পাচ্ছি। এমন গাইড অর্থ দিয়ে মেলে না। (উনি যা বলেছিলেন তার সব লেখা সম্ভব নয়, মনেও নেই, তাও আবার ইংরাজীতে বলেছিলেন।)

সংক্ষেপে জানাই-উত্তরভারতের মন্দির স্থাপত্য রীতির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের রীতির তুলনা করে জানিয়ে ছিলেন উভয় ভারতেই মন্দির গুলো ছিল দুর্গ বিশেষ। এগুলো ছিল কোষাগারও, সৈন্য থাকতো, কোথাও বা পুরোহিতদের সঙ্গে রাজপুরুষও থাকতেন মন্দিরে। উত্তর ভারতে মন্দিরের প্রবেশ পথ গুলো ছোট, মন্দির গুলো বড়। দক্ষিণ ভারতে তার বিপরীত-গোপুরম গুলি দীর্ঘকার মন্দির ক্ষুদ্রাকার। একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর পর এই ধারার কিছুটা পরিবর্তন হয়। দুটির সমতা রাখার চেষ্টা দেখা যায়। সম্ভবতঃ মাদুরাই মীনাক্ষী মন্দিরে মন্দিরও উঁচু করা হয়। এছাড়াও বলেছিলেন, বিবাহিতা নারীরা পূর্ণ শাড়ি পরে ঘোমটা দেয়, আর কুমারী কন্যারা ছোট শাড়ি পরে। মেয়েরা খুব ফুল ভালোবাসে।

উনি আমাদের সঙ্গে করে মন্দিরের একটি বিশাল কক্ষে নিয়ে গেলেন। প্রায় সংগ্রহশালা হলেও বোঝা গেল শ্রেনীকক্ষ বলে। প্রায় সকলেই চিত্র আঁকছেন, ষ্টিল পিকচার। কেউ আঁকছেন হাতি, কেউ ঘোড়া,অনেকেই আঁকছেন নন্দীর (ষাঁড়) ছবি। ভাঙা চোরা রেলিকস থেকেই আঁকছেন (সংগ্রহশালার)। উনি আমাদের পরিচয় দিতে বললেন , "Bengali Tourist" আমরা করজোড়ে সবার উদ্দেশ্য অভিবাদন জানালাম। ওঁরাও নমস্কার জানালেন। খুব আনন্দ হচ্ছিল। উনি নিজের 'চেষ্ট' থেকে দশটি ফটো দিলেন নবেন্দুর হাতে। তিরুপতি মন্দির গাত্র। ফটোর গায়ে দাম লেখা ১, এক টাকা। মানিব্যাগ বার করছিল নবেন্দু তার হাতচেপে বললেন, Its a presentation from our part Please tell your men to visit this old temple". বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম দেবস্থানের বাসষ্ট্যান্ডে। নবেন্দু বললো, "প্রায় দু ঘন্টা সময় কাটিয়েছি এক সুন্দর ঘোরের মধ্যে-এখনও স্বপ্ন মনে হচ্ছে। কী অপরূপ জ্ঞানী এক মানুষের সান্নিধ্যে কাটালাম। লাক আমাদের ফেবারে নাচছে। চল বাস ধরে তিরুমালা মন্দিরে যাই। কিন্তু দেবদর্শন আমাদের ভাগ্যে ছিলনা। এখানেই জানিয়ে রাখি-একটা বিষয় ভুল করেছিলাম। নীচে খেয়ে যাওয়া উচিত ছিল। সেই সকালে চা পান করেছি-নবেন্দুতো তাও পান করেনি।

ওপরে কোন দোকান নেই। সমস্ত পাহাড়ী এলাকাটাই দেবস্থানের কন্ট্রোলে চলে। সমস্ত সামগ্রী আসে সমতল থেকে। পুরীর মন্দিরের পান্ডাদের কথা মনে পড়েগেল, সেখানে পান্ডারা প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান, এখানে তাদেরই পরোক্ষ উপস্থিতি-সমস্তই ব্যবসায়ী বুদ্ধি পরিচালিত ,দেবতাকে এরা বন্দী করে ক্রীড়নক করে রেখেছে। যাক ঘটনায় ফিরি-বাস ভর্ত্তি হতে তবে ছাড়লো-প্রায় আধঘন্টা সময় নিল, নামলাম। সবাই হুড়োহুড়ি করে দৌড়ে গিয়ে বিশালাকার এক খাঁচায় ঢুকে পড়লো। সেই খাঁচার তলায় অনেক চাকা-চাকা গুলো সব রেলে রয়েছে। জানা গেল এই খাঁচাই মন্দির দ্বারে যাবে-যাত্রীদের পৌছে দেবে। সেখানে ২৫, ১০ এবং ৫টাকার আলাদা লাইন আছে। সাধারণ মানুষদের অপেক্ষা করতে হবে বিশালহলঘরে সেখানেও লাইন দিতে হবে, সময় মত তারা দেখবে। লাইন তদারককারী পান্ডা আছে, বিশাল এই খাঁচার মধ্যেই প্রস্রাবাগার চা পান বিড়ির দোকান আছে। খাঁচা আছে তিনটি, তারা চক্রাকারে মন্দির প্রদক্ষিণ করে এখানেই নামিয়ে দেবে, এই খাঁচাটির স্থান এখন তৃতীয়। প্রথমটি গেছে, দ্বিতীয়টি যাবে, তৃতীয়টি তারও পরে যাবে। (পাঠক বুঝুন অবস্থাটা-এটা জানতেই আমরা প্রায় ঘন্টা খানেক লেগে গেল।) নেমে পড়লাম খাঁচা থেকে। নবেন্দু বাইরে এসে বললো, "কী হলো?" বললাম, "খিদে পেয়েছে, নীচে নেমে যাই-তুই দেখে শুনে নীচে নেমে রেল ষ্টেশনে খুঁজে নিস"। নবেন্দু বললো, "একজন বললো, রাত আটটা বেজে যাবে নামতে।"তাহলেই বোঝ।" চল তবে খুঁজে দেখি কিছু পাই কিনা'। বললাম,"ভাষা সমস্যার কথা মনে রাখ।" "এই দিকে মনে হয়, গরিবদের বসতি আছে-চল খুঁজে দেখি, কফিসপ থাকলে দুজনেই পান করা যাবে"। খানিকটা হাটলাম ওর নির্দেশে মত। এদিকটা মনে হয় ঝাড়ুদার শ্রেণীর লোকেদের বাস। যাক বাবা কফিসপই পাওয়া গেল। অনেক দাম, তবু কষা কষা কড়া কফি আর দুটো করে বিস্কুট খেলাম।

তারপর নবেন্দুই বললো, "চল পায়দলেই নেমে যাই।" আমি তো রাজী। ফলে নামা শুরু করলাম। দেবস্থানের অনেক ঘর আছে। সাধারনের বেশ কিছু বাড়ি আছে। কিন্তু কোন দোকান বা হোটেল নেই। কিছুক্ষণ হাঁটার পরে একটা ছায়াভরা বড় বাগান পেলাম, পথেও ছায়া তৈরী করেছে এক আম্রবৃক্ষ। ফলহীন, এখন ফাল্গুন মাস, ফল তো থাকা উচিত ছিল। নবেন্দু বললো, মনে হয় শীতকালে আম হয়ে গেছে। শীতকালের মাদ্রাজী আমের কথা। বেশ ঘেমে গেছি-তবু ক্ষুধাই তো মানুষকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। নবেন্দু বললো, ভুলেগেছিস

খুড়ো, আমরা বিষুবরেখার কাছাকাছি আছি। তাও তো বটে। এসব কথা প্রথমে মনে পড়েনা। দ্রুতই নামছি। এখন সময় আমরা একটা অপেক্ষাকৃত ছোট বাগানের পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। দেখি, বাগানের মধ্যে কয়েকটা ছাত্রী। একজন শিক্ষিকা রয়েছেন দূরে। দুটি ছাত্রী একদম পাশে বসে একটা বই দেখে দুজনে লিখছে। তারাও ভীতচকিত নেত্রে আমাদের দেখছে। মেয়েদের কিছু প্রশ্ন করার আগেই শুনলাম, "Whose there ?" মহিলা কণ্ঠের উত্তরে বললাম, " Tourtist from Bengal" "what here you Look" বলতে বাধ্য হলাম Probably your students are copying some thing" বললেন Is it বলে তাকালেন রূঢ় চোখে ছাত্রীদের দিকে, দেখলেন বইটা। বললাম This system is alike santi neketan" বললেন I was a student of srineketan" বলে ছাত্রীদের তামিল ভাষায় কী বললেন, তারা দুজন হাতজোড় করে বললো "Forgiveus" আমরা কী করি হাত তুলেআশীর্বাদের ভঙ্গি করলাম। শিক্ষিকা বললেন "Come inside and look after School" বললাম No please, we are very hungry and so getting downwards not visiting Balajee" উনি হেসেই বললেন "so what, come inside, I am able to feed you here" তাঁর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হলাম, তবু হাত জোড় করে বললাম "no please we are in hurry, many thanks for your invitation, we never forget you চলে এলাম নীচে। (পাঠক দেখছেন তো এখনও ভূলিনি। পথের এইসব মনিমানিক্যই পথিককে সাহস যোগায়)।

নীচে নেমে নবেন্দু বললো, "কফিটা খেলাম জোর করেই কী কষা তবু স্বীকার করতেই হয় বেশ জোরালো। হেসে বললাম, "গরীবরা কী আর করে-কমদামী জিনিসই খায়-যেগুলো হয়তো ধনীদের কাছে সুস্বাদু নয়-তাই তো তারা পায়, নইলে তাও পেতোনা, বললো, "ঠিক বলেছিল এটাই মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মন্দির। উকিল বলছিল, দেবতা তো দেখাই যায়না, তাও আবার আধখানা ভাঙা-তবে মন্দির প্রাঙ্গণে নাকি দেবতার একটা হাতের পাঞ্জা আছে, তাতে বিভিন্ন স্থানে নানান দামী কয়েকলক্ষ টাকার উজ্জ্বল পাথর

বসানো আছে। আর কত টাকার প্রণামী পড়েযে ভাবাই যায় না," কত বড় ব্যবসা বল-ধর্মপ্রাণ ভারতীয়দের নিয়ে। নবেন্দুর মনে হয় অ্যাতে লাগলো, চুপ করে গেল। একটা হোটেলে বসে ১.২৫ টাকা করে ভাত খেলাম। নবেন্দু নারকেল তেলের রান্না বলে ভাল খেলোনা-আমিই 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়' ভেবে অনেকটা খেয়ে নিলাম।

পথে বেরিয়ে বললাম খেতে হবেই-যা খেয়েছি রাত্রে আর খেতে হবে না-চল এখন সাড়ে চারটে বাজে ট্রেনে ফিরে যাই"। "না চল না কালাস্তি যাই"। "সেটা আবার কোথায়?" "বেশি দূর নয় চল না-ওখান থেকে ডাইরেক্ট বাসে চলে যাবো" না, কালাস্তি যাইনি উল্টো পথে যেতে হবে ২৫ মাইল। তিরুপতি ষ্টেশনে গেলাম। সেখানে একজন ইংরাজী জানা চেকারের সঙ্গে আলাপ করলাম। দেখা গেল তিনিও বিশেষ কিছু জানেন না কালাস্তি নিয়ে। ট্রেনপথ থেকে মন্দির দেখেছেন, খুব সুন্দর দৃশ্যপট। অন্য কাছে শুনেছেন দুই পাহাড়ের মাঝখানে মন্দিরের অবস্থান। লিঙ্গ মুর্ত্তিটি শূন্যে ভাসমান। কাছেই নদী আছে। নাম তার স্বর্নমুখী। নবেন্দুকে বললাম, সে বললো "শুনেছি শংকরাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটি হল কালাস্তি-এটা বায়ুলিঙ্গ। বললাম "খোঁজ নিতেই পাঁচটা বেজে গেল, চলনা রেনীগুন্টায় ফিরে যাই, নিশ্চিন্তে ঘুমানো যাবে"। "না আজ রাতে ফিরবো না, চল তবে কাঞ্চীপুরম চলে যাই।"

বাস খুঁজে কাঞ্চীপুরম চলে এলাম। বাস ষ্ট্যান্ডের কাছে একটা হোটেল উঠলাম। বিশেষ বোর্ডার নেই। ম্যানেজার দুজনের জন্য ১৫টাকা চাইতে নারাজ হলাম, জানালাম রাত্রে মিল নেবো না। স্রেফ কফি বিস্কুট খাবো, কাল সকাল ৯-৩০ টায় চেক আউট করবো। উনি বললেন, "আট রূপেয়া"। থেকে গেলাম নবেন্দুর সঙ্গে পরামর্শ করে। দোতলায় রাস্তার ধারে মাঝারি মাপের ঘর। সাদা ধবধবে বিছানা, ফ্যান লাইট। সামনে ৬ ফুটের বারান্দা, এ্যাটাচড় বাথরুম। নবেন্দু সঙ্গে সঙ্গেই শুয়ে পড়লো, বললো, "খুব টায়ার্ড হয়ে গেছি"। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে চলমান রাস্তা দেখতে দেখতে হঠাৎ দেখি এক মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে গাছ পালার মাথার ওপর দিয়ে। সন্ধ্যা ঘনায়মান। নবেন্দুকে বললাম, "চল কাছেই একটা মন্দির আছে দেখে আসি"। না - বললাম না টায়ার্ড।" "তখন তো কালাস্তি দেখতে চাইছিলি। রাগ হয়েছে?" "নারে সত্যি বলছি"। "তবে তুই শুয়ে থাক, আমি দেখে এসে বলবো"। কফি নিয়ে ঢুকলো একটা বয়। একটা বড় পটে কফি, সাথে দুটি কাপ। নবেন্দুকে বললাম, "খেয়ে

নে ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে।" দুকাপে তখন ঢালছে তখনই প্রশ্ন করলাম, "ওহি টেম্পল কিসকা হ্যায়"। বলেই হেসে ভাবলাম, এ ব্যাটা বুঝবেনা কিন্তু বয়টা সপ্রতিভ ভাবে বললো, "বলিজীকি-দান ক্ষেত্রম"। বলিরাজার দানক্ষেত্র-বামন অবতারে বামন বলির কাছে ত্রিপদ জমি চেয়েছিলেন। এই মন্দিরে তাহলে তার রূপকল্প ক্ষোদিত ভাস্কর্য্য আছে? কফি পান শেষে ম্যানেজারকে বলে দুজনে পায়ে পায়ে চলে এলাম মন্দিরে। অযত্নে শ্রীহীন হলেও পূজার্থী/থিনীরা আছেন তখনও। রাত্রি ১০টায় বন্ধ হয় দ্বার। নবেন্দু বললো, কাল দিনের আলোয় দেখবো দলবল নিয়ে, চল্ অন্ধকারে ঢুকবোনা বাগানে"।

বিছানায় শুয়ে নবেন্দু বললো, "দেখেছিস, একেবারে নতুন মশারি । একটা ঐতিহাসিক উপন্যাসে পড়েছিলাম, বলিরাজার দানক্ষেত্রের কাছে কাঞ্চীরাজের একটা ছোট রাজপ্রসাদ ছিল-তার মাঝে ছিল এক সুন্দর পুষ্করিনী-সেখানে রাজকন্যা সাঁতার কাটতো। এই হোটেলটা হয়তো সেই প্রাসাদের ভগ্নস্তুপেই গড়ে উঠেছে। এই হোটেলের মাঝখানে একটা বাঁধানো পুষ্করিনী আছে। দেখিসনি?" "না, তাহলে কাল সকালে ওখানে স্নান করবো-কাঞ্চী রাজকুমারীদের জন্য নয়-সকাল থেকে চান করিনি-গায়ে ঘাম জমে গেছে বলে ।" নানা হাসির মধ্যে ঘুম এসে গেল। রাত্রে বয় এসে এক জাগ জল আর দুটো কাঁচের গ্লাস দিয়ে গেসলো। সকালে প্রাতঃ কৃত্যাদি সেরেই কফি পেয়ে গেলাম হাতে, এনেছেন, স্বয়ং ম্যানেজার। নবেন্দুকে প্রশ্ন করলেন, "Please tell at what time you will check-out?" নবেন্দু বললো, "Sharp at 9.30 Hrs." আমি বললাম, "Please arrange a tonga to go to Rly Stn, Our party will reach here at 10am." "well, I shall arrange it. It will cost you half crown." Thats final. "Come and have a meal then." "we are wanting to have a bath in the central tank." "Oh, sure." মেজাজসে স্নান সারলাম। কারখানায় ৮টায় ডিউটি, সকালের ভাত খাবার অভ্যাস আছে। গত রাত্রে প্রায় কিছুই খাইনি, ফলে দুজনেই ভাল খেলাম। নবেন্দু বললো, কালকের চাইতে ভাল খেলাম। মনেই রাখছে না , সেটা ছিল একটা রোড সাইড হোটেল। এটা একটা এ্যসট্যাবলিশড্ হোটেল। টাঙ্গা এসেছে খবর নিয়ে দুজনের সঙ্গে নামলো বয়। আট টাকা তো দেওয়া ছিল-ম্যানেজারকে প্রশ্ন করলাম, "How

much to pay for the meal" হেসে পানধরিয়ে দিয়ে বললেন "Nothing more" নবেন্দু একটা আধুলি দিয়ে বয়কে। সে সেলাম বাজিয়ে দিলা। রেল ষ্টেশন চত্বরে নূতন বিপত্তি। আমিই বাঁধিয়েছি। হয়েছে কি - কোচোয়ানকে পাঁচটা দশ নয়া দিয়েছি। ম্যানেজার বলেছিলেন। কোচোয়ান ছিল ওপরে-সে হাতে নিয়েই ফেলে দিল। আমিও একটানে তাকে মাটিতে পেড়ে ফেললাম। সে উঠেই আমায় মারতে গেল। নবেন্দু তাকে আবার মারলো। অন্য টাঙাওয়ালারা হৈ হৈ করে এগিয়ে এল। কয়েকজন স্থানীয় পথচারী এসে গেলেন। সবাইকে দেখালাম, সেই পড়ে থাকা খুচরো গুলো, বোঝালাম, কয়েনগুলো রাষ্ট্রের সম্পত্তি সেগুলোকে অপমান করা রাষ্ট্রের অপমান। ইতিমধ্যে আমাদের লোক এসে গেসলো-তারাও সব শুনলো। আমি বললাম "He may demand more, but cant throw the coins, as because the coins are national property" গন্ডগোল মিটতে অন্য একজন টাঙাওয়ালা সেই মুদ্রাগুলো নিয়ে এসে বললো,"GIVE ME A HALF CROWN" একটা আধুলি দিল নবেন্দু। মিটে গেল বিপত্তি। হায় ভারতবর্ষ!

বদরিকাদা গন্ডগোলে দাঁড়াননি। কাশীদাকে সঙ্গে করে গিয়ে একটা ৪৪ (44) সীটের বাসএনে বললেন," এতেই ম্যানেজ করে সব দেখে নিতে হবে। দুটো বাস নিলে খরচে কুলাবে না।" বাস প্রথমেই সামান্য দৌড়ে বলির দানক্ষেত্র (এর কাছেই তো ছিলাম-এটার জন্যই আট আনা গেল, ঝগড়া মারামারি হল।) আমি আর নবেন্দু প্রদক্ষিণ করলাম। বামন অবতার হাফকাট ভাস্কর্য্য । কেবল তৃতীয় পদটা পুরো ভাস্কর্য্য দেওয়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলির মাথায় রয়েছে, বলির মুখটাই শুধু দেখা যাচ্ছে। বহিরাঙ্গ প্রায় জীর্ন, বাগান পরিস্কার নয়। এতো সন্ধ্যায় সামান্য আলোতেই বুঝেছি। বাস দ্রুত ছুটে চলে এল বিষ্ণু কাঞ্চী। বিশাল এলাকা মন্দিরের। বাস সময় দিয়েছে মাত্র ১ ঘন্টা। প্রায় ছুটে ছুটে দেখেও সবটা কভার করতে পারলাম না। বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দিরের ওপর যাদুঘরে কজন গেসলো, "অনেক হীরা জহরৎ, সোনার টিকটিকি দেখেছে। কী জানি, সত্য কিনা (পরে আরো দুবার পার্টির সঙ্গে এলেও কোন মন্দিরে ঢুকিনি-বলির দানক্ষেত্র বাসওয়ালারা দেখায়নি)।

এরপর বাস দ্রুতগতিতে শিবকাঞ্চীতে এল, এখানেও একঘন্টা সময়। এটা দেখেই যাওয়া হবে পক্ষীতীর্থম - এমনই কনট্রাক্ট হয়েছে। (পরে সব টুরই করেছি মাদ্রাজ থেকে) এখানে স্পীড কমিয়ে ধীরে সুস্থে দেখলাম। কারুকৃতি, মন্দিরের লতের কাজ প্রায় সবই একই ধরনের। গোপুরম দুটোয়

সামান্য পার্থক্য থাকলেও স্তম্ভগুলি প্রায় সদৃশ। বেশিরভাগ কাজই নরম ক্ষয়িষু বেলে পাথরের, মূল মন্দিরটি ছোট, গ্র্যানাইট জাতীয় একস্তরী পাথরের। এখানে একটি ৩০০ বছরের প্রাচীন আম্রবৃক্ষ আছে। গাছটিতে পর পর কলম তৈরী করেই নাকি এটিকে জ্যান্ত রাখা হয়েছে-প্রায় ফসিলে রূপান্তরিত সেই বৃক্ষটিকেও দেখলাম। ভাবলাম জিন প্রযুক্তির কিছুটা হয়তো ভারতীয় বিজ্ঞানীরা জানতেন। আবার নবেন্দুর প্রশ্নের জবাবও দিতে পারিনি। তবে কেন তাঁরা গাছকে প্রাণী বলেননি?

পক্ষীতীর্থম বলে জানা থাকলেও, এখানে এসে জানা গেল এর নাম তিরুকালকুন্দ্রম। জানা গেল, পাখিরা ১১টায় প্রসাদ খেয়ে উড়ে গেছে। ফলে ঠিক হল, খেয়ে দেয়ে পাহাড়ে চড়া হবে। কয়েকটি রোড সাইড হোটেল আছে। বিদ্যুৎদা বললো, "চলো আমাদের কুপের সকলে আরো একটুদুরে যাই।" তাই করা হলো। নবেন্দু বললো, "খুড়ো আর আমি ভরা পেটে এসেছি।" নরেশ বললো, "সবাই আজ সকালেই লুচি, আলুভাজা, লাড্ডু খেয়েছি। কিন্তু এখনই ক্ষিধে পেয়ে গেছে।" পংকজ হেসে তাকে সমর্থন করলো। প্রবীর চুপি চুপি জানাল, "পাঁচজন P.T.O. ভাঙায়নি। কাঞ্চীপুরম ষ্টেশনে তারা ধরা পড়তে বেঁচেছে।" একটা প্রাকৃতিক ছোট্ট হ্রদের পাশে ছিমছাম পরিস্কার একটা ভোজনালয় পাওয়া গেল। জীবনে প্রথমবার পদ্মপাতায় খেলাম। স্বাভাবিক মিল আটআনা-দুডাব্বু ভাত, সম্বরম (টকডাল), কারী (লাউ, নারকেল ছেচকী), শেষ পাতে টকদই-নুন, লেবুতো আছেই। খুব সুন্দর লেগেছিল নারকেল দিয়ে করা লাউটা। (পরে একবার পুরো দলকে এখানে খাইয়েছিলাম)

পাহাড় প্রায় ৫০০ ফুট উচুঁ হবে, ৫৩৬/৩৭টা সিড়ি আছে (দুজনে গুনেছিল), পাহাড়ের মাথায় শিবমন্দির আছে, দুটি শঙ্খচিল জাতীয় পাখি এসে প্রত্যহ কয়েকশো বছর ধরে নিত্য প্রসাদ খেয়ে যায়। এই দুজনে নাকি প্রত্যহ কন্যাকুমারিকা মন্দিরে যায়, দেবী মূর্তি দর্শন করে আসে। গল্প তো গল্পই। মনে হয় এরা এখানের পুরোহিতদেরই পোষা। পরে শুনেছি এদের প্রসাদে নাকি আফিম থাকে। ফেরার পথে কথা ছিল, কাঞ্চীতে তাঁতি পাড়ায় নামিয়ে বাস চলে যাবে। কয়েকজন বাধা দেওয়ায় বাস চালক আরো তিরিশটাকা বিনিময়ে রেনিগুন্টায় পৌছে দিল। তাঁতি পাড়ায় গিয়ে সবায়ের চোখ ছানাবড়া। তাঁতিরাই কোলকাতার চাইতে বেশি দর চাইছে। ফলে সকলেই খালি হাতে ফিরেছিল। আমার নবেন্দুর আর বিদ্যুৎদার বেনারসের কথা মনে পড়েছিল। তবে বোঝা গেল, খদ্দের আনার জন্য রিক্সা বা টাঙ্গাওয়ালারা কমিশন

পায় । পরদিন **P.T.O.** ভাঙাতে কোন অসুবিধে বা দেরী হয়নি। আমি আর নবেন্দু সবগুলো নিয়ে গেলাম **S.M.** এর কাছে। তার নির্দেশমত সব লিখেও ফেল্লাম। তিনি কেবল **Stamp** মারলেন। আজ গঙ্গাদারা দুজনেই যাবেনা। গতকাল গাড়ি খালি রেখে সবাই গেসলো স্রেফ **R.P.F.** দের ভরসায়। কিছু ক্ষতি হয়নি। গঙ্গাদার পেট খারাপ আমাশার মত হয়েছে বলে জানা গেল (এই সময়ে জানিয়ে রাখি আমাদের অধিকাংশের পাশ ছিল দেড়শেট এবং পিটিও ছিল তিন সেট।) পাশা (১) হাওড়া থেকে মহীশূর-ব্যাকটু তিরুনেলভাল্লী ১/২ সেট তিরুনেলভাল্লী থেকে হাওড়া (৬৭ সালে তিরুনেলভাল্লীর দক্ষিণে কোন রেলষ্টেশন ভারতে ছিল না।) পিটিও ছিল (১) রেনিগুন্টাথেকে কাঞ্চীপুরম এবং ফিরতি (২) রেনিগুন্টা থেকে চিঙ্গেলপেট এবং ফিরতি (৩) মনোমাদুরাই থেকে রামেশ্বরম এবং ফিরতি । ত্রিচিনাপল্লীর দক্ষিণে সবটাই ছিল মিটার গেজ রেল পথ।)

চিঙ্গেলপেট ষ্টেশনে নেমে প্রায় সকলেই লাইন মাড়িয়ে ওপারে চলে গেলেও আমি আর নরেশ ওভারব্রিজ দিয়ে পার হলাম। ওভারব্রিজে উঠেই খুব ভাল লাগলো, দেখি রেলের সীমানার বাইরেই একটা ছোট্ট হ্রদ-নীল তার জল, চারিধারে মহীরুহের বেষ্টনী, একটি মাত্র মানুষ কাছেই বসে ছিপ ফেলে বসে আছেন। যেন চিত্রিত এক পট। নরেশ বললো, "সকলকে ডাকি"-বললাম, "ফেরত পথে সকলকে দেখানো যাবে।" হায় তখন কী জানতাম যে ফেরার পথে ডাইরেক্ট বাসে ফিরবো। জানিনা, এখন সেটা হয়তো কোন পর্যটন কেন্দ্র হয়ে গেছে। এ জাতীয় লেগুন দক্ষিণভারতে হয়তো অনেক আছে। কিন্তু কোন ষ্টেশনের এত কাছে লেগুন আছে বলে জানিনা।

বদরিকাদা জানালেন, "এখানে খেয়ে তবে যাওয়া হবে", দোকান ঠিক করে বাসের সন্ধানে গেলেন কয়েকজনকে নিয়ে। ওরা রান্না করে দেবে-জেনে চা পান করে নবেন্দুকে নিয়ে গেলাম সেই লেগুনের পাড়ে। নবেন্দু তো অবাক। মাছ পাননি সেই ভদ্রলোক, তবু বললেন, "এখানে এ্যাঙ্গালার্স ক্লাব আছে, তিনি তার সদস্য, হাতের ইঙ্গিতে দেখালেন মেছুড়েদের বসার মাচা। জানা গেল, রেলের সব জল এই লেক যোগায় মনে পড়লো, শিমুলতলার কথা। তবে শিমুলতলার ঝিল এর তুলনায় অনেক ছোট। এর আয়তন প্রায় এক বর্গমাইল। এর জল নীল। শিমুলতলা ঝিলের জল পচা, সবুজ। কতক্ষণ সময় কেটে গেছে খেয়ালই নেই। ফিরে এসে দেখি বাসভর্তি

লোক। সবাই আমাদের দুজনকে খুঁজছে। এখনও খাইনি শুনে সবাই রেগে গেল। নবেন্দু রেগে ওদের চলে যেতে বললো। ওরা চলে যেতে খাদ্য সন্ধানে গিয়ে দেখি, খাবার নেই। করে দিতে হবে। জেনে সার্ভিস বাসে চড়ে চলে গেলাম মহাবলীপুরম। অস্নাত অভুক্ত অশান্ত মন। নবেন্দুর বক্তব্য হল, "এত কম সময়ে খাবার বানালো, সবাই খেল কী করে?" "তাছাড়া দুজনের খাবার তাহলে পড়ে থাকা উচিত ছিল।" (পরে বিদ্যুৎদার কাছে জানা গেসল, বিভিন্ন হোটেলে সাত আটজন করে খেয়েছে। আমাদের দুজনকে ওরা খুঁজেছিল পায়নি।)

সামনেই নীল সমুদ্র। উর্মিচঞ্চল হলেও ততটা ভয়ংকর নয় স্নানের কথা বললাম, সে বললো,"সরঞ্জাম তো বাসে পড়ে আছে।" "সে তো আমারও। চলনা, আন্ডারপ্যান্ট পরে নেমে যাই। যা গরম তাতে গায়েই শুকিয়ে যাবে।" কাছেই সমুদ্রতীরে একটা একানে ছোট্ট মন্দির। পাশে ছোট ছোট অনেক নারকেল গাছ। দুজনে কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে উঠে পড়লাম। "ওদের দেখতে পেয়েছি" বললাম। নবেন্দু বললো,"যাক-এখন চল কিছু খাওয়া যাক।" সামনে একটা তরমুজওয়ালা। দুটাকায় একটা বড় তরমুজ দুজনে খেয়ে ফেললাম। মনে দেহে জোর ফিরে এল।

পায়ে পায়ে চলে এলাম সেই ছোট্ট মন্দিরের কাছে। দলের সবাই চলে গেছে, কেবল শিবুদা (শিবচন্দ্র-আমাদের মিস্ত্রি-হাওড়ার নামী ফটোগ্রাফার তখনই ষ্টুডিও ছিল) গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে কয়েকজন বিদেশিনীর সঙ্গে রয়েছেন। জানাগেল এখানে সপ্তদেউল ছিল-কুন্তী, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব আর দ্রৌপদী। সবই সমুদ্রগর্ভের ভিতরে চলে গেছে - কেবল দ্রৌপদীরটা আছে হেলে দাঁড়িয়ে। সরকার বছর ছয়েক আগে থেকে সমুদ্রতীর রক্ষায় চেষ্টিত হয়েছেন।

বেলে পাথরের কারুকার্য করা মন্দিরটি প্রদক্ষিণ করে সমুদ্রতীরে দাঁড়ালাম। দেখি, সিড়িতে দাঁড়িয়ে এক বিদেশিনী কী যেন তুলতে চেষ্টা করছেন আর শিবুদা তাঁর ফটো তুলবে বলে রেডি। কাছে গিয়ে দেখি বিশাল এক কাঁকড়া। ঢেউ এলেই ডুবে যাচ্ছে, নেবে গেলেই দেখা যাচ্ছে-দুখানা বড় দাঁড়া উর্দ্ধে তুলে সিড়ির খাঁজে দাঁড়িয়ে আছে। শ্বেতাঙ্গিনী তাঁর ভিজে পোষাকে উঠে পড়তে শিবুদাকে বললাম, "আমি ওটাকে তুলে দিতে পারি।" শিভ্যালরি দেখাতে চাইলাম। শিবুদা বললো "দশ টাকা বেট।" "বেট আমি ফেলিনা।"

বলে নেমে দাঁড়ালাম এবং প্রথম সুযোগেই মন্দিরের চাতালে ওটা তুলে দিয়ে কথা না বলে নবেন্দুকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলাম "রথম" দেখতে। চলতে চলতে নবেন্দু বললো, "মেমরা খুব হাততালি দিচ্ছিল, তোর দাঁড়ানো উচিত ছিল, শিবুদার উচিত ছিল তোকে দশ টাকা দেওয়া।" "নিতাম নাকি? আমি তো বেট ফেলিনি বা এ্যাকসেপ্ট করিনি।" নবেন্দু বললো, "তবু তো ফেলেছিল।" বললাম "ওসব নিয়ে ভাবছি না , পাৎলুনটাও ভিজে গেল। বালি লেগে যাচ্ছে সর্বত্র।" সমস্ত পথটাই বালুকাময়। প্রায় সব কাজই বেলে পাথরের। শুনেছি পাহাড়ের গায়ে একটা মনোলিথিক কারুকার্য আছে। সেটা অর্ধক্ষোদিত ভাস্কর্য্য। অন্যদিকে রথমে গুহাগুলি ছোট পাহাড়কে কেটে ঘরের মত, গুহার মত বানিয়েছেন সেই ভাস্কররা। কী সুনিপুন হাতের কাজ-কতটা ধৈর্য্য শীলতা। রথমের গুহাগুলি শিল্পীদের কাছেও বিস্ময় সৃষ্টি করে আজও গর্বোন্নত শিরে দন্ডায়মান।

বইয়ে পড়েছি, পল্লব রাজাদের মহাবল অর্থাৎ রণতরী রাখার স্থান ছিল মামল্লা পুরম। এঁরা সব বিষ্ণু উপাসক ছিলেন। তাই অধিকাংশ কারুকৃতিই গড়ে উঠেছিল মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে। রথমের মন্ডপগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ রথ, ধর্মরাজ রথ, অর্জুন রথ, দ্রৌপদী রথ ছাড়াও রয়েছে গঙ্গার মর্তে আগমন, মহিষাসুর মর্দিনী দুর্গা রথম, বরাহ ও বামন অবতারের রূপদান করা হয়েছে। সামান্য দুরের আরেক পাহাড় কুদে হয়েছে অর্জুনের তপস্যা কাহিনী-বিশাল এই ভাস্কর্য্যটি নাকি ভারতের বৃহত্তম। এছাড়া লাইট হাউস আছে, সরকারী প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে ক্যসুরিনা (এক রকম ঝাউ) র জঙ্গল। পাহাড়ের গায়ে সরকারী কী কাজ হচ্ছিল আমাদের উঠতে দেয়নি। তবে মনোলিথিক পাথরে খোদাই ষাঁড়ের সারির কিছু দেখেছি। পরে এই মহাবলীপুরম বিজয় নগরের সমুদ্রবন্দর হয়ে যায়। (প্রায় কুড়ি বছর পরে দ্বিতীয়বার মহাবলী পুরমে আসি-চেন্নাই থেকে বাসে। তবে ইতিমধ্যে বহু সদ্যবিবাহিত দম্পতিকে মধুচন্দ্রিমা (হনিমুন) করতে পাঠিয়েছি- কারোর কাছে গালি শুনতে হয়নি।) আজও রিজার্ভ বাস পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে রেনিগুন্টায় পৌছে দিল।

আরো একটা মজা হয়েছিল রেনীগুন্টায়। সেটা নবেন্দু বা আমি দেখিনি। শুনেছি, নরেশের কাছে। সেটা হল,"আমাদের কোচটাকে ব্যবহার করেছিল একটা ফিল্ম কোমপানি। প্রথম শটে নায়ক নামে, ধনীপুত্র সঙ্গে তিনজন সঙ্গী, সবাই দামী পোষাকে সজ্জিত। তলায় নায়িকা আধময়লা

ব্যাঙ্গালোর সিটি আর ব্যাঙ্গালোর ক্যান্টনমেন্ট। আমরা আছি সিটিতে। এখান থেকে মিটার গেজ লাইনের গাড়ি ছাড়ে। এরপর আমরা যাবো মহীশূর। ষ্টেশনটীর সম্মুখভাগে বিশাল ফুলবাগিচা। তার একপাশে রিক্সা, টাঙ্গার ষ্ট্যান্ড। একপাশে বাস ষ্টান্ড দুপাশ দিয়েই পথচারীদের জন্য উচু ফুটপাত বাগানের শেষ প্রান্ত থেকে পুরো প্লাটফর্মটী দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। অপরূপ সুন্দর এই স্থাপত্য। এর আগে কোন ষ্টেশনকে এমনভাবে দেখিনি। প্রায়শই পাথিকের পক্ষে এই জাতীয় অবকাশ থাকেনা। (হাওড়া ষ্টেশনকে তো কখনই দেখিনি হয়তো ওপার থেকে দেখতে হবে।) বাস প্রথমেই হায়দার আলির (টিপুসুলতানের বাবা) ভাঙাচোরা বাড়ি দেখাল (এখন মেরামত করেছে, বাগান করেছে।) পরে নিয়ে এল কুবন পার্ক মিউজিয়ামে। দুটি বিল্ডিং দূরে দূরে -টেকনিক্যাল আর ওরিয়েন্টাল। টেকলিক্যাল মিউজিয়মে চমক আর চমক। সবই বৈদ্যুতিন ব্যাপার (৬৭ সালে তা চমকই ছিল) পাপোসে পা রাখতেই ঘরে জোরালো আলো জ্বলে-শুকনো কলের সামনে হতে পাতলেই জল পড়ে ইত্যাদি। পরে দেখা গেল প্লেন তৈরীর কারখানার মডেল, কোলার স্বর্নখনির মডেল ইত্যাদি। ওরিয়েন্টাল মিউজিয়ামে প্রাচীন যুগের কত ফসিল, পুরানো প্রস্তর যুগ, নব্য প্রস্তর যুগ, তাম্রযুগ, ব্রোঞ্জ যুগের নানা যন্ত্রপাতি ছাড়াও পোড়ামাটির লাল মাটি, কালো মাটির নানান ধরনের পাত্র। সবচেয়ে মূল্যবান বলে চিহ্নিত একজোড়া হীরক বলয়, পুরানো পাথর দিয়ে দারুণ ভাবে কাটা। ততটা ঔজ্জ্বল্য না থাকলেও তার গঠন প্রণালী খুব সুন্দর। (পরে দুবার গিয়ে এদুটোকে আর দেখিনি-রত্নসামগ্রীর ঘরে হয়তো সরানো হয়েছে-সে ঘরের জন্য আলাদা প্রবেশ মূল্য -যাইনি।)

এরপর বাস নিয়ে এল বহুশ্রুত বিখ্যাত লালবাগে। এটি একটি বোটানিক্যাল গার্ডেন। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখা চোখে সেটাকে আমার আহামরি লাগেনি। ব্যাঙ্গালোর বাগিচা শহর বলে বিখ্যাত তাই ভেবে ছিলাম কিছু প্রাচীন মহীরুহ দেখবো, দেখতে পাবো নানা না দেখা গাছ -তা পাইনি। হয়তো সেটা গাইডের দোষ। যাইহোক, গাইডের কাছে জানা গেল এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন হায়দর আলি। জানা গেল মিউজিয়াম দেখলেও কুবন পার্কের আর কিছুই আমরা দেখিনি, ওখানে আছে সাধারণ পাঠাগার-অপরূপ তার সৌধটি, ওখানে আছে হাইকোর্ট। মিউজিয়ামে আছে নাকি মহেঞ্জোদড়ো থেকে প্রাপ্ত মুদ্রাও। বোঝা গেল মিউজিয়ামেও গাইড নেওয়া উচিত ছিল।

যাইহোক লালবাগের গাইড মহাশয় আমাদের প্রথমেই দেখালেন, ঘাসের তৈরী ভারতবর্ষের ম্যাপ। তার মাথাতেই একটা সচল বড় মাপের ঘড়ি। বললেন, "Two Forty acres area" ২৪০ একর জমিতে বাগান। শিবপুরের বাগানের পরিমাপ ৩০০একর। উনিই বললেন,"কুবন পার্ক ইজ বিগার দ্যান দিস গার্ডেন।"বাবা-তাই এ শহর বাগানের শহর ।এরপর কৃত্রিম ঝর্ণা, কৃত্রিম হ্রদ, পদ্মফুল ভরা বিরাট জলাশয়-সাদা পদ্ম লাল পদ্ম, গোলাপী পদ্ম। পাশেই গোলাপ বাগ। পাঁচশোর বেশি রকমের গোলাপ আছে নাকি! ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে এসে গেলাম কাচঘরের সামনে। সুন্দর বসার জায়গা। কাচঘরে দেখলাম কত সুন্দর সুন্দর অরকিড,বাইরের লনে কত নানারকমের ক্যাকটাস।

গাইড এখানে আমাদের বাথস্ এ্যান্ড ল্যাবস দেখিয়ে বাহির পথ দেখিয়ে সামান্য দূরে একটা টিলা পাহাড়ে ছোট্ট মন্দির দেখিয়ে চলে গেলেন। প্রশ্নিত হতে জানালেন, "ইয়োর বাস ইজ হিয়ার"। দেখালেন আমাদের বাস। কাছেই চায়ের দোকান দেখে আমি আর বিদ্যুৎদা চা খেতে চলে গেলাম । এখন তিনটে বাজে। রাতে যাবার প্রোগ্রাম আছে। বদরিদার নির্দেশ পেয়ে বাসে চেপে চলে এলাম রেল ষ্টেশান। অন্য বাসও এসে গেল। পার্সেল প্লাটফর্মে গাড়িতে এসে পার্টির দেওয়া চা পান করছি-জানা গেল, রাজকুমারদার বৌ ফেরেনি। হৈ চৈ পড়ে গেল। সে আনপড় এক শ্রমিক তার বৌ তো আরো বোকা। অনেকেই নানা কথা বলতে থাকলো। একদিকে রাত্রের গাড়িতে মহীশুর যাত্রা, অন্যদিকে রাজকুমারদার বৌ হারানো-দুদিকের আলোচনা চলতে চলতে জানাগেল, নবেন্দু আর রাজকুমার ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেছে লালবাগে। নস্করদা গিয়ে এই হারানোর খবর দিয়ে এসেছেন ষ্টেশনে। নবেন্দুরা সন্ধ্যায় ফিরে এল। রাজকুমার বললো, ওতো রেলষ্টেশন আর রিজার্ভ গাড়ি ছাড়া কিছু বলতেই পারবে না।" খুব কাঁদছে। যাইহোক, সন্ধ্যের একটু পরেই ক্যান্টনমেন্টের এক RPF Officer বৌদিকে পৌছে দিয়ে রাজকুমারদাকে ধমকে চলে গেলেন। (অনেক পরে জানা গেসলো বৌদিকে পুলিশ ওই ষ্টেশনেই পৌছে দিয়েছিল।)

ফিরে আসতেই নানা কর্তাবার্তা, রসিকতা শুরু হয়। বেচারীর দোষ ছিল একটু নাদুস নুদুস দেখতে। যাক বাবা একটা সমস্যা মিটলো। দ্বিতীয় সমস্যা ছিল আরো কঠিন। গাড়িতে দুজন থাকতে হবে। S.M রাতের দায়িত্ব নিতে পারবেনা। এখানে তিনদিন গাড়ি থাকবে। ওরা আজরাতে গিয়ে কাল রাতে ফিরবে। যে দুজন থাকবে তাদের চালু হতে হবে। একদিনে যতটুকু

পারবে দেখে নিয়ে সকালে গিয়ে রাত্রি ৮টায় ফিরতে হবে।

কেউই রা কাড়ছে। শেষে আমি বললাম, "ঠিক আছে আমি থাকতে পারি-নবেন্দুকে নিয়ে।" নবেন্দু রাজী। কিন্তু বদরিকাদা বললেন," নবেন্দুকে চাই সে না থাকলে দল চলবে না। "তখন প্রবীর বললো, "জাটীর সঙ্গে আমি থাকতে পারি।" তাই ঠিক হল। সমস্যা একটাই, প্রবীর কম কথা বলে, পরম রামকৃষ্ণ ভক্ত এই যুবকটা একদম নির্ভেজাল ভদ্রলোক, নারীপ্রসঙ্গ নিয়ে কথাই বলে না। ম্যানেজার নস্করদা বললেন, "তোমরা দুজন প্রাণভরে যা ইচ্ছা খেয়ো আমি পেমেন্ট করবো, " প্রবীর বললো, " টাকা দেখাবেন না। সে হলে আপনি থাকুন, আপনার টাকা আমি পে করবো, " বিদ্যুৎ দা বললো,"দুজনের চার টাকা তো নেবে?" "সে নেব"। ফয়শালা হয়ে যেতেই সবাই প্রস্তুতি নিতে থাকলো। রাত ১১-৪০এ ট্রেন। সকাল ৪টেয় পৌছাবে মহীশূর। S M আমাদের জন্য একটা কামরা এ্যালট করেছেন। তাতে সবাই শোয়া যাবে না। নবেন্দু বললো, "প্রয়োজনে অন্য কামরায় জায়গা দখল করে নেবো।"

সমস্ত গাড়ি ভালোভাবে চেক করে এসে শুলাম বিদ্যুৎদার জায়গায়। ভালই ঘুমিয়েছি। সকালে ফ্লাস্কে করে চা আনলাম প্রবীরের জন্য। প্রবীর জানাল, "লক্ষ্ণৌ থেকে একটা টেকনিক্যাল দলের কোচ এসেছে। রেখেছে আমাদের কোচের ঠিক পেছনেই। আজ ওদের কোনো প্রোগ্রাম নেই, সবাই পুরুষ ওখানকার রেলের ওয়ার্কিং ষ্টাফ। "বললাম," কী এসে গেল তাতে?" "দুপুরে ওদের বলে খেতে যেতে পারবো দুজনেই।"

মাঝখানে খেতে যাওয়া ছাড়া অন্য সময়টায় আমি লিখেছি-তিরুপতি থেকে ব্যাঙ্গালোর পর্যন্ত ভ্রমণ কাহিনী। প্রবীর কখনো শুয়েছে, কখনো বসেছে সামান্য সময়ের জন্য পাশের কোচে গেসলো। বিকেলে আমায় বলে টিফিন ক্যারিয়ার আর ফ্লাস্ক নিয়ে বের হল। ফিরে এসে চা দিয়ে বসলো চা নিয়ে। বললো , "খরচ হলো চব্বিশ টাকা, নস্কর শুনলে হার্টফেল করবে"হাসলো। বললাম,"রাগ তোমায় মানায়না।" প্রবীর হেসে বললো ,"স্পর্ধা দেখে রাগতো হবেই।" পরপ্রভাতে প্রবীরই দরজা খুলে দিয়েছিল। সকলেই টায়ার্ড। প্রবীর জানালো,"চলো বেরিয়ে পড়ি। বাসে চলে যাই বৃন্দাবন গার্ডেন, ওখানটা দেখেই ফিরে আসবো।"তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তখন চা করেনি। প্রবীর বললো," ষ্টেশন সার্কল পেরুলেই বাস টার্মিনাল। ১৪০কিমি পথ। সময় নেয় ৪ঘন্টা ভাড়া মাথাপিছু ১৮ টাকা -

ট্রেনে গেলে এই টাকাটা বাঁচতো।" "সময়তো নেই চলো তবে ট্রেনে গিয়ে মহীশূর দেখে ফিরি বৃন্দাবনগার্ডেন না হয় নাই দেখো হলো।" "না, বৃন্দাবনগার্ডেনটাই দেখে আসি।" "চলো তাই সই। পরে আবার কোনো সময়ে মহীশূর আসবো।" (পরে ৫ পাঁচবার এসেছি)। বাস খুব ভাল চলে এদিকে। ঠিক নটায় নামিয়ে দিল। কন্ডাকটর হাত বাড়িয়ে প্রবেশ পথ দেখিয়ে চলে গেল। দুজন মাত্র নামলাম এখানে। (পরে বুঝেছি, ভূল করেছিলাম। মাত্র ৪০ টাকায় প্রাইভেট বাস সকাল ৯টায় ছেড়ে রাত্রি ১০টায় প্রায় সবই দেখিয়ে দেয় মহীশূর বৃন্দাবন গার্ডেন) অপরূপ বাগান তবে আসল সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করতে হলে অন্ধকার চাই। কতযে আলোকিত ফোয়ারা। এই সব জেনে, প্রবীর আর আমি ভিতরে না ঢুকে চলে গেলাম কৃষ্ণসাগর ড্যাম দেখতে। এরই জল নিয়ে বৃন্দাবন গার্ডেন তৈরী হয়েছে ধাপে ধাপে। বিশাল এর পরিসর। পাথরের স্ল্যাব ফেলে বাধটি তৈরী (সবটা কিনা জানি না).বাধটি কাবেরী নদীতে। বাঁধের পাশে নানা গাছপালা-তারই ছায়ায় কিছুটা সময় বসা গেল। প্রবীরের তাড়ায় গেলাম খাদ্যঅন্বেষণে। দোকান পাট সেই বাসস্টপেজের কাছে। খেয়ে দেয়ে ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করা গেল বাগানে।

প্রবেশ পথটাকে সুন্দর গেট দিয়ে সাজানো। প্রবেশ মূল্য মাথা পিছু আট আনা। ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে নেমেছে বাগান। জল আসার জন্য ব্যবস্থা আছে, তাতে জলেও জ্বলে এমন বালব রয়েছে নানা রঙে রঙীন-এরা সন্ধ্যার পর জ্বলে-বাগান তখন মোহিনী রূপ ধরে। মাঝে মাঝে ফোয়ারা আছে। জলকণায় মনও সিক্ত হয়। নানা ঋতুকালীন ফুল, গোলাপও আছে। সুন্দর করে সাজানো কয়েকটি দেশের প্যাগোডা আছে-তার মধ্যে ভাল লেগেছে রাশিয়ান ও জাপানী প্যাগাডা। সব জল এসে জমা হচ্ছে ছোট একটা হ্রদে-সম্ভবত পাম্পের সাহায্যে আবার উঠে যাচ্ছে ওপরে। এই ভাবে চেন সার্কেলে সারাক্ষণ প্রবাহিত হচ্ছে জল। হ্রদের মাঝখানে একটি প্রকান্ড উঁচু ফোয়ারা। হ্রদের দুপাশ দিয়ে সরু রাস্তা তার দুপাশে বড় বড় গাছ (বর্তমানে ফেরী সার্ভিস হয়েছে)-না, আমরা আর ওপারে যাইনি। নীচের ধাপে নেমে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে অন্য দিক দিয়ে উঠে পড়লাম।

এখন দুপুর দুটো। প্রবীরকে বললাম, "চলো খেয়ে নিয়ে ফিরি। "আলো জ্বলা দেখে ফিরতে দেখে রাত হয়ে যাবে। দশটায় ট্রেন ছাড়বে।" বিরসমুখে সে সায় দিল। ফিরে এসে পরে বলেছিল,"পকেটেই তো পাশ ছিল, পরে ফিরে অন্য ট্রেনে ইরোডে দলকে ধরে পারতাম।" কী আর করা যাবে-চোর পালালে

বুদ্ধি বাড়ে। ব্যাঙ্গালোর থেকে চলে এলাম ইরোড। ব্রজগেজ লাইনে যাবো ত্রিচি। বাজার করা ছাড়া ইরোডে কিছু করার ছিল না। বড় জংশন ষ্টেশন। যাক এই অবকাশে নরেশের কাছে জানা গেল মহীশূর ভ্রমণের কথা। সংক্ষেপেই লিখে রাখি (১) জগমোহন প্রাসাদ বা আর্টগ্যালারি (২) রাজপ্রাসাদ (৩) ললিতা মহল-বাইরে থেকে (৪) নন্দী মূর্তি (পথের উপরে) (৫) চামুন্ডা মন্দির (৬) শ্রীরঙ্গপত্তনম এখানে টিপুর গ্রীষ্মাবাস, রঙ্গনাথম মন্দির, দৌলত বাগিচা, গম্বুজ , ছোট একটা যাদুঘর দেখিয়ে -খাওয়া শেষে ষ্টার্ট করে শেষ পর্যায়ে (৭) বৃন্দাবন গার্ডেন দেখে রাত ১০টা ৪০ এর গাড়িতে ফিরেছে ওরা।

ভ্রমণে এলে খুঁটে খুঁটে দেখাই আমার অভ্যাস। জানি, এত কিছু জানার বাসনা নিয়ে মানুষ ভ্রমণে বের হয় না। সে চায়, নিত্যকার জীবন থেকে একটু মুক্তি। ঘন্টা ছয়েক পরে টানলো। সকালেই ত্রিচিনা পল্লীতে ঘুম ভাঙালো। ইংরাজী নামের বানান। TIRUCHCHIRA PALLEY বাব্বা। এটিরও গঠনভঙ্গীটা ভালো লাগলো। সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা থাকায় দূর থেকে এক নজরে দেখা যায়। গত রাত্রে দেবকুমার মুখার্জী এসে জমিয়ে গল্প করেছিলেন। তাতে গাড়ির কিছু কুৎসা ছিল-যেমন নস্করদার বৌ নাকি না বলে মাছ নিয়ে খেয়েছে। বদরিদার পায়ে বিরাট একজিমা আছে তা সব সময় চুলকাচ্ছে, আবার সেই হাতেই পরিবেশন করছিল বলে তার বৌই নাকি প্রতিবাদ জানিয়েছে-তাছাড়া চুপি চুপি বলেছিল-কাশীদা নাকি হরিদার মেয়ে মনসার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছে (এটা আমিও লক্ষ্য করে নবেন্দুকে বলেছি-চরৈবেতির বদনাম করে দিচ্ছে কাশীদা) বাকী দুটোর কথা জানিনা।

সকালে জনা বারো লোক দেবুদার নেতৃত্বে গেলাম রকফোর্ট দেখতে, সঙ্গে নিয়েছি স্নানের সরঞ্জাম। ভাষার সমস্যা এখানে প্রকট। সবাই তামিল বলছে। হিন্দি হঠাও শ্লোগান চলছে। ইংরাজীও বিশেষ কেউ বলতে চাইছেনা। রংঘরে কাজ করা কেরালিয়ান যুবক নারায়ণ পিল্লাইকে ধরে কিছু তামিল শব্দ শিখে এসেও কুল পাচ্ছি না। ইংরাজী একটা বাক্যকে প্রায় একটা শব্দ মনে হচ্ছে। যাই হোক টাংগা করে চলে গেলাম রকফোর্ট। তিনটে টাংগা তিনটাকা নিল। যাকগে। পাহাড়ী দুর্গ, একাধারে মন্দিরও বটে। অনেক চেষ্টা করে একজন পুরোহিত মার্কা

গেরুয়াবসনধারী লোকের কাছে যা জানা গেল, বহু প্রাচীন এই মন্দির। চোলামন্ডল ভেঙে যাবার পর মাদুরাই চলে যায় নায়ক বলে এক রাজবংশের হাতে। তারাই এই দুর্গ মন্দিরটি গড়ে তোলে পাহাড়ের মাথায় ছিল মন্দির, নীচে নানাধরণের মন্ডপ। পাহাড়ের শেষতলে ছিল সহস্র পিলারের মন্ডপ তা ভেঙেগেছে, তারই ফাঁকে ফাঁকে গড়ে উঠেছে এখনকার দোকানপাঠ। স্মৃতি হিসাবে পড়ে আছে কষ্টি পাথরের নন্দী মুর্তি। তার কয়েকধাপ ওপরেই রয়েছে একশো পিলারের মন্ডপ। এখানে সম্ভবত সৈন্যবর্গের প্রশাসকরা থাকতো। সেগুলো আমরা বারোজন ঘুরে দেখলাম, পরে মাথায় গেলাম শিবমন্দির দেখলাম। একেবারে চূড়ায় গণেশজীর মন্দিরে কজন উঠলোই না।

ঐ ভদ্রলোকটিকে গাইড বলতে পারছিনা, তিনি পয়সা নেননি। তিনি চূড়ায় শিবমন্দিরের চাতালে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন This is 200ft above the Land See. there is the city, it is River Mother Cawvery এত উচু থেকে শহরকে দেখে খুব অভিভূত হয়েছিলাম। অনুমান করেছিলাম পাহাড়টী প্রায় ৩০০ ফুট উচু। ঘেমে গেলাম সকলেই। নবেন্দু আসেনি ফলে দেবুদাই বর্তমানে ক্যাপ্টেন তাকে ফলো করে নূতন গড়ে ওঠা একটা সেতু পেরিয়ে কাবেরী স্নান ঘাটে পৌছালাম। জল কম, বুক পর্যন্ত আমার মত বেঁটেরও-তবে সুন্দর স্বচ্ছ জল। ওপারের জল এত পরিস্কার নয় বলেই এপারে স্নানঘাট । ভীষণ কড়া রোদ। পথচারী কোন টাঙ্গাই দাঁড়াচ্ছে না ফলে ব্রিজ পেরিয়ে টাঙ্গা ষ্ট্যান্ডে এসে ঘেমে কোচে ফিরলাম। নবেন্দু উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিল, প্রশ্ন করলো "আমায় না ডেকে কোথায় চলে গেলি?" দেবুদা হাসির ভঙ্গীতে বললো, "ভূতেশ্বর মন্দির ভূতনাথ বাবার ডাক না শুনে পারা যায়?" বললাম "এখানে জলের অবস্থা দেখে কাবেরীতে স্নান সেরেছি আর রক ফোর্ট দেখে এসেছি।" দেবুদা বললো "ওই লোকটা শিবমন্দিরে দাঁড়িয়ে বলেছে এই মন্দির হল...ভূতেশ্বর মন্দির-কীভুত তা মনে পড়ছে না-মঠ না কী যেন।" (পরে জেনেছি মঠরুভূতেশ্বর) নবেন্দু বললো, "আমরা ছোট একটা বাস নিয়ে শ্রীরঙ্গম যাচ্ছি , ফেরার সময় দেখবো রক ফোর্ট যাবি কিনা জানতে পারছিনা তাই টাকা দিইনি।" বিদ্যুৎ বললো "আমি যাবো না। " বললাম ঠিক আছে আমি যাবো। ফলে দ্রুতই খেতে হল।

বাস দ্রুত ছুটে প্রথমেই নিয়ে এল অনন্ত শয়নম মন্দিরে। যে সেতু দিয়ে হেঁটে ফিরেছি সেই সেতু দিয়েই বাস গেল। নবেন্দু পাশেই বসেছে। ৩০ সীটের বাস, বাচ্ছা বুড়ো মিলিয়ে চলেছি ৩৪জন, মাথাপিছু পাঁচটাকা পড়ছে। নবেন্দু বললো, "তবে তো তোরা অনেকটা এসেছিলি।" হায় তাকি জানি মনের ফুর্তিতে ওসব মনে লাগেনি। নবেন্দু বললো "জানিস শ্রীরঙ্গমের অনন্ত শয়নম মন্দির বিভীষনের, রাবণের ভাই বিভীষনের হাতে তৈরী না মানে আইডিয়া আর অর্থে তৈরী।" হেসে বললাম, গুল। "না দেখেই বলছিস"-"ভুলে যাচ্ছিস যে রামায়ণ একটা গল্পের বই-রূপকথার গল্প। বিভীষনের ছবি আছে মন্দিরে। কালপনিক ছবি, কে দেখেছে বল বিভীষণকে? এমনকি বাল্মীকিও দেখেনি।" নবেন্দু থেমে গেল।

সুন্দর স্থান নির্বাচন। কাবেরী নদী ও তার শাখা নদীর মাঝখানে এই মন্দিরটির পরিসর মনে হয় বৃহত্তম। এতই বড় তার এরিয়া। এই প্রথম হাজার পিলারের মন্ডপ দেখলাম। শুনেছি দক্ষিণ ভারতেএমন নাকি অনেক আছে। ত্রিচিরই রককোর্টও নাকি ছিল-বিস্ফোরনে ভেঙে গেছে। নবেন্দুর কথামত তা বৃটিশরাও ভেঙে থাকতে পারে। সেই গেরুয়াপরা ভদ্রলোক কিন্তু টিপুর সৈন্য থাকা নিয়ে কিছু বলেনি। যাইহোক, এই বিশাল মন্ডপ নিয়ে কথা হচ্ছিল। বললাম, "সমস্ত নিকটবর্তী এলাকার মানুষ ধরে যাবে এখানে। মনে হয় বন্যার কথা ভেবেই এতবড় মন্ডপ তৈরী হয়েছিল-নদী আর শাখা নদী বেষ্টিত স্থান।" নবেন্দু বললে,"হতে পারে-তবে মন্দির থেকে এসব ভাবনা না করাই ভাল।" বললাম, "কেন গিরি গোবর্ধন তুলে কৃষ্ণ যে জল থেকে মানুষদের বাঁচিয়েছিল তাও তো এই একই।" বিশাল বিশাল সাততি গোপুরম। খুঁটিয়ে দেখার সময় নেই। বিশাল এই মন্দির দেখতে বাস সময় দিয়েছে মাত্র দেড়ঘন্টা (পরে এসে সারাদিন ধরে দেখেছি অবশ্য একই দিনে দেখেছি জম্বুকেশ্বর মন্দিরও) সকাল ৭টায় মন্দির দ্বার খোলে ১২টায় বন্ধ হয়। এরপর ঠাকুর ভোগ গ্রহণ করে সামান্য দিবা নিদ্রা। তিনটের সময় আবার মন্দিরদ্বার খোলে ৮টায় বন্ধ হয়। ঠাকুররেরও আমাদের মত ডিউটি আওয়ার্স! যাক এখন তিনটে বেজে গেছে। আমরা (আমিও) দেবদর্শনে বাধা পাইনি-কোন বাধা নেই দেবদর্শনে (বিভীষণের রাক্ষস বিধি চলছে নাকি?) মূর্তি হচ্ছে, অনন্ত নামক নাগের বহু ফণা বিশিষ্ট ছত্রতলে শায়িত দেবতা, তাঁর নাভি থেকে

একটি পদ্ম, পদ্মের উপরে দেবী মূর্তি। নবেন্দুকে বললাম, "এ হচ্ছে আমাদের কালীমূর্তির অন্যরূপ-বিপরীত রতির কোমলরূপ।" নবেন্দু বললো "Absurd" বোললাম, " ভাল করে ভাব পুরুষ নীচে, নারী উপরে।" নবেন্দু সরে গেল। মনে মনে হাসলাম। সর্বশেষ গোপুরমটি অনেক উঁচু এবং সুদৃশ্য-নামটিও অদ্ভুত ভেল্লাই গোপুরম (পেল্লাই নাকি?)।

আমাদের দলেরই তাড়া আছে-তাই ঘন্টা খানেক পরেই জম্বুকেশ্বর দেখতে স্টার্ট করা হল। দূরত্ব সামান্যই হবে-১মাইল হবে না মনে হল। প্রায় বসতে না বসতেই এসে গেল। এটিও জলবেষ্টিত, তবে নালায় বর্তমানে জল নেই। জম্বু বা জামগাছের মধ্যে মন্দিরটী-এটা শিবমন্দির, তামিল অন্য নাম আছে তিরু দিয়ে। ছোট্ট কিন্তু সুন্দর-তা ছাড়া ছায়াচ্ছন্ন, আরামপ্রদ। এখানেও পান্ডাদের দেখা পাইনি। সবাই রক ফোর্টে যাবার জন্য ব্যস্ত-ফলে দ্রুতই ফিরতি পথ ধরা গেল। রকফোর্ট তো আমার দেখা। আর উঠিনি। নীচে চা পান করতে করতে জানা গেল, এছাড়াও এখানে দর্শনীয় আছে Cavetemple আর Bell tower দুটিই কাছাকাছি। এখানের গুহায় কিছু পৌরানিক ছবি আছে। বেল টাওয়ারে বিশালাকার ঘন্টা আছে। বাস চালক জানাল, তাদের সঙ্গে ওসব দেখাবার কোন কনট্যাক্ট হয়নি।

ট্রেনে ফিরেই জানা গেল, M.G. কোচ পাওয়া গেছে। এখনই লাগেজ সিফট করে নিতে হবে। কাল সকালেই মাদুরাই যাবার ট্রেন। ষাটজন বসিবে এমন একটা কোচ দিয়েছে। অবশ্য গেট অ্যাপ ভাল-চকচকে, ভিতরটাও পরিচ্ছন্ন। দুটো ভাগ। ম্যানেজার ছাড়াও পরিবার সঙ্গে আনা সবাই যাতে শুতে পায় তার ব্যবস্থা করে বাকীরা বসে দাঁড়িয়ে মেঝেয় শুয়ে যাবে। মালপত্রে সীটের তলাও ভর্তী। কোচে থাকতে হবে। প্রবীর আর আমি একটা দল হয়ে গেলাম শোয়ার ব্যাপারে। অবশ্য শোবো তো প্লাটফর্মে। রাতের খাওয়া হতে রান্নার সরঞ্জাম তুলে দিয়ে প্লাটফর্মে শুয়ে পড়লাম। বিদ্যুৎদা, নবেন্দু, পংকজ, নরেশ,কাশীদা-কেশবদা চারজুড়ি পাশাপাশি। আমাদের মালপত্র সিটের নীচে ঢুকিয়ে কোনরকমে বসে দাঁড়িয়ে মাদুরাই পৌঁছে গেলাম। গাড়ির কাগজপত্র সব রয়েছে বদরিকাদার কাছে। নবেন্দু গেল ওদিকে। আমরা কজন বাইরে বেরিয়ে কফি পান করে মীনাক্ষী মন্দিরের গোপুরম চূড়া দেখে চলতে চলতে তার দরজায় এসে গেলাম।

বা কাছেই মন্দির (এখন দূরে মনে হয় রাস্তাঘাট পাল্টেছে বলে-পরে পাঁচবার এসেছি) প্রবেশ মূল্য ছিল না ফলে ওরা কজন ঢুকে মাতৃ দর্শন করে এলো। (তখন সোজা যাওয়া যেত। আমি অন্য রং করা গোপুরমের ছবি (হাফকাট ভাস্কর্য্য) দেখতে থাকলাম। পরে খেয়ে দেয়ে আবার আসা যাবে (পরে জেনেছি দূরত্ব ১কিমি মাত্র-রেলষ্টেশন থেকে) ওরাও দ্রুত ফিরে এল। কোচ রেখেছে পিলগ্রিম প্লাটফর্মে-রান্নাঘরে রান্না হচ্ছে, তার চারপাশে ভিখিরির ভিড়-কিছু লিফটার পকেটমারও আছে বোধহয়। মাদ্রাজের পর রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এটাই। মিটার গেজ রেলের হেড অফিস এখানেই। ভিড়াক্রান্ত এই শহর। মাদুরাই সিল্ক খুব বিখ্যাত। কাঞ্জিভরম শাড়ি, কাঁচের বালাও খুব বিখ্যাত। কিন্তু কিছু কেনা মানেই ঠকা। জানিনা কেউ কিছু কিনেছেন কিনা (দলের)-তবু এখানে এক শ্রেণীর যুবক 'চোরাই সিল্ক শাড়ি' বলে দর্শকদের কাছে পুশ সেল করতে চাইছে বলে বিষয়টা দৃষ্টি আকর্ষন করলো। কোনরকমে খাওয়া সারলাম কোচে বসে। ভিখারীদের চোখের সামনে খাওয়ার মতো মানসিকতা আমার নেই।

এবারে প্রবেশ করা গেল মন্দিরে। নটী গোপুরম, প্রত্যেকটি বিচিত্র-নানান কাহিনী আঁকা এবং অপরূপ বর্ন শোভিত। দুটি মূল মন্দির একটি শিব অন্যটি দুর্গা মীনাক্ষী বলে পূজিত। এখানেও সহস্র পিলারের মন্ডপম। সবদিক দিয়ে দেখতেই সুন্দর। দেব মন্দিরের সামনে স্তম্ভগুলিতে আঘাত করলে নানা সুর ধ্বনিত হয়। এই স্তম্ভগুলিও কারুকার্য্য মন্ডিত। মন্ডপের ঠিক বহির্ভাগেই পদ্ম সরোবর। (বর্তমানে এর তীরে বসার জায়গা হয়েছে, প্রতিসন্ধ্যায় এখানে সংস্কৃত নানা স্তোত্র পঠিত হয়। প্রাচীন কালে এখানের জলে লেখকদের পান্ডুলিপি পরীক্ষা হত।) সময় দিয়ে ছায়ায় ঘেরা প্রদক্ষিণ শেষ হতে সামান্য কজন মিলে দোতলায় দেখতে গেলাম। প্রবেশ মূল্য আট আনা। কিছু প্রাচীন মুদ্রা তালপাতার পান্ডুলিপি ও হাতির দাঁতের কারুকার্য্য আছে। মনে আছে সমগ্র মন্দিরটির একটা ক্ষুদ্রমুর্তিও দেখেছিলাম (সেটিই সম্ভবত বর্তমানে মীনাক্ষী দেবীর পূজামন্দিরের সামনে রাখা আছে) ফিরে এসে দেখি রান্নাঘরটা তখনও ভিখিরীরা ঘিরে আছে। বিরক্তচিত্তে প্লাটফর্মে বসলাম। সন্ধ্যা ঘনাচ্ছে। প্লাটফর্মে টিমটিম করছে আলো। দেবুদা কজনকে সঙ্গে করে এসে বসলো।

নানা যৌনতামূলক হাসির গল্প করছিল ওরা। তারিমধ্যে জানা গেল, ত্রিচি ও মাদুরাই ষ্টেশনে পর্যন্ত দেহব্যবসায়িদের দালাল ঘুরে বেড়ায়। মাত্র দুটাকার বিনিময়ে মেয়ে পাওয়া যাবে। দেবুদাকে নাকি অর্ধনগ্ন ছবি দেখিয়েছে , অমিয়কে দেখিয়েছে "পুরো ন্যাংটো" -শালাকে মেরেই দিতাম। ও নামকরা বক্সার, ইন্ডিয়া নাম্বার টু-পি রায়ের সুযোগ্য ছাত্র, কঠিন ব্রহ্মচারী-পান্নালাল দাশগুপ্তর RCPI দলের সদস্য হিসাবে ডাকতির অপরাধে জেল হেফাজতে পুলিশের হাতে প্রচুর মার খেয়েছে। পরে প্রমাণাভাবে রেলের চাকরী ফিরে পেয়েছে-কিন্তু বক্সিংয়ের সেই হৃত সম্মান আর ফিরে পায়নি। সে সত্যি কথাই বলছে ধরে নিলাম-দেবুদা তো অনেক সময় গুলমারে। যাইহোক খোশগল্প শেষ হলো নবেন্দু এসে পড়ায়। বললো, "চল SM এর কাছে যেতে হবে। সমস্যা দেখা দিয়েছে," কী সমস্যা P.T.O. ভাঙানোর। বললাম "তখনই বলেছিলাম, মনোমাদুরাইয়ে গাড়ি কাটাতেই হবে। এতগুলো P.T.O. তখনই P.T.O. গুলো SM/MADURIA কে দিয়ে কাটিয়ে নেওয়া যেত।" "তেমন ভাবে P.T.O. লেখাতে হত-এতসব আইন কী জানা ছিল তখন?"

SM যা জানালেন-গাড়ি থেকে কোচ কেটে দেওয়া হবে MONOMADURAI -পরের প্যাসেনজারে জুড়ে দেওয়া হবে-পরের গাড়ি আড়াই ঘন্টা পরে। আর মনোমাদুরাই থেকে তিরুনেলভেল্লী পর্যন্ত ডাইরেক্ট যে গাড়িটি ছিল তা বাতিল হয়ে গেছে।এর কোন ব্যবস্থা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সকাল ৬টায় CPTM অফিসএ যেতে হবে। তিনিই এ ব্যবস্থা করতে পারেন। করে দেবেন, খুব ভদ্রমানুষ। নবেন্দুর সঙ্গে ফিরে এসেও দেখি প্লাটফর্মে বেশ ঘোরাঘুরি করছে অচেনা মানুষরা। সকলকে সাবধান করলাম এবং কোনরকমে কষ্টে সৃষ্টে ঘেমে একসা হয়ে রাত্রি কাটালাম কোচের মধ্যেই।

বদরিকাদা সবশুনে নবেন্দুকে বলেছিলেন, "তবে তোমরা দুজনেই ভোরে গিয়ে ব্যাপারটা সামলাও। মাদুরাইয়ে কতটুকু সময় লাগে? এইসব হতে পারে ভেবেই প্রায় দুদিন সময় রাখা আছে।" আমি সঙ্গ দিতে রাজী বলে জানালাম। (এখানেই জানিয়ে রাখি যে পরবর্তীকালে আমার পরিচিতদের এখানে রাত কাটাতে বারণ করেছি। তবু আমার জ্যাঠতুতো বোন চঞ্চলা এবং নবেন্দুর খুড়তুতো ভাই মনোরঞ্জন দুজনেরই টাকা চোট হয়েছিল মাদুরাইয়ে।) ভোরে উঠে স্নানের পোষাকাদি

সহ ব্যাগ নিয়ে দাঁতে ব্রাশ করতে করতেই রেল অফিসের দিকে চললাম। সর্বদা সচল নাকি? কে জানে? মুখ ধুয়ে নিলাম কলে। অনেক খোঁজ করে সাতটি অফিস পেরিয়ে CPTM এর ঘরে পৌঁছে স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলতেই পরিস্কার বাংলায় কথা শুনে তৃপ্তি পেলাম। একটু আগেই গেটকীপারের গলায়, "সাহেব অন্দরমে হ্যায়" শুনেছি-যাক তাহলে মাদুরাইয়ে ভাষাগন্ডগোল ততটা প্রভাব বিস্তার করেনি। ত্রিচিতে ছিল প্রচন্ড হিন্দি বিদ্বেষ।

"বাঙালী নাকি" শুনে অবাক বিস্ময়ে মাথা নেড়ে বললাম, "হ্যাঁ স্যার!" এতবড় অফিসার বাঙালী। হাতের দরখাস্ত মেলে ধরলাম সামনে। নিয়ে বললেন "বসুন" বলে চেয়ার দেখালেন। দুজনে বসলাম। বললেন, "কারেন্ট রেলওয়ে টাইম টেবল ফলো করেননি-এনিওয়ে এটা আপনাদের একক ফল্ট নয়, রেলের কেরানিদেরও ভুল; ঠিক আছে ব্যবস্থা হয়ে যাবে ঘন্টা চারেক লাগবে S.M. এর কছে Final Instruction পাঠিয়ে দেব-তিনি দিয়ে দেবেন। ম্যাসাজটা অল কনসার্ন করে দিতে হবে। গাড়িটা মরিয়াচ্ছি হয়ে যাবে আসবে। (মরিয়াচ্ছি ষ্টেশনের নাম সেই প্রথম শুনলাম)।

নবেন্দু বললো, "কর্তারা সাহায্য না করলেও আমরা দুজনে এতবড় সমস্যা সলভ করতে পেরেছি জেনে খুব ভাল লাগছে।" আমি মাথা নেড়ে সমর্থন করলাম। "আচ্ছা স্যার আসি, নমস্কার" বলে উঠে দাঁড়ালাম। বললেন, "সামান্য বসুন, বাঙালার খবর বলুন।" নবেন্দু বললো, "স্যার আমরা লিলুয়া কারখানার শ্রমিক মাত্র। ৮টা ৪টে ডিউটি করি। আলোজ্বলা সময়ে বাড়ি ছাড়ি, ঘরে ফিরি সন্ধ্যায়। সোমবার দিন ছুটি, বন্ধুরা থাকে না, বাংলার খবর কি করে দিই?" আমি বললাম, "স্যার, রেলের শ্রমিকদের মাইনে কত কম তো জানেন। তবে মোটামুটি ভালই চলছে আমাদের-নইলে বেড়াতে বেরুচ্ছি কী করে?" উনি বললেন, "দ্যাটস রাইট-ঠিক বলেছেন-৬৬ র খাদ্য আন্দোলন তবে থিতিয়ে গেছে?," "হ্যাঁ স্যার খেতে পাচ্ছি-তবে দক্ষিনী খাবার এখনও মুখে রুচছে না"। "রান্না করে খাচ্ছেন?" "হ্যাঁ," "আসুন না স্যার আমাদের গাড়িতে আজ খাবেন।" নবেন্দুর করা নিমন্ত্রণে বললেন, "আমি ডিউটি বাউন্ড-যেতে পারবো না- তবে গৃহিনী যেতে পারেন-যদি আপনারা নিমন্ত্রন করেন। সী ইজ টায়ার্ড অফ ডেকান মিলস।" নবেন্দু উঠে দাঁড়িয়ে বললো," ঠিকানা

দিন। প্যাড আছে সঙ্গে লিখিত নিমন্ত্রণপত্র স্বহস্তে দিয়ে যাবো।" উনি ঠিকানাটা লিখে বললেন, "ইট ইজ এ্যাট এ্যান-এ ওয়াকেবল ডিসট্যান্ট-বুঝতেই পারছেন, আমার কোয়ার্টার এখানের প্রায় সবাই চেনে। উনি খুব খুশি হবেন সকালেই বাঙালী ডিজিটর, টু টুরিষ্ট ভিজিটরস্ পেয়ে।" করমর্দন করে বিদায় দিলেন। দশটায় জেনারেল অফিস আওয়ার। ফলে অধিকাংশ সীটই খালি। দ্রুত বাইরে এসে নবেন্দু বললো," ব্যাগে কাগজ পত্রের সঙ্গে গামছা এনেছি এতগুলো বাথরুম অফুরানজল, চল স্নান সেরে তবে সাহেবের কোয়ার্টারে যাবো।" আমার কাঁধের ব্যাগেতে সবময়মই গামছা থাকে। ফলে নবেন্দুর কথায় রাজী হয়ে দুজনে দুটো বাথরুমে ঢুকে স্নান সেরে নিলাম।

কোয়ার্টারের গেটেও পুলিশ প্রহরা। প্যাডে লিখে প্রয়োজন জানালাম। আর. পি.এফ. ফিরে এসে ভিতরে যেতে অনুমতি দিল। বিশাল কক্ষ। রেলের অফিসাররা অনেক সুবিধা পান। ইংরাজরা এই বাড়িগুলো বানিয়েছিল। ওরা আমেরিকান মার্কা নয়-তাই বাড়িগুলোও ছিল সৌন্দর্য্য মন্ডিত-ব্যবসায়িক মার্কা নয়। উনি বসেছিলেন, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আসুন বসুন- চা খাবেন তো, আমি বাপু এখনও কফি খেতে পারি না।" বা কী সহজ, সত্যই খুশি হয়েছেন-কথা বলেই চলেছেন-বাঙাল টাইটেল জাটী টাইটেল কখনো শুনিনি এর আগে। পড়ে চমক লাগলেও বাংলা অক্ষর দেখেই খুশি হয়েছি-কতদিন যে দেখিনা। মেয়েকে চিঠি লিখি, সে থাকে মাদ্রাজের ছাত্রী নিবাসে-তাও ইংরাজীতে। কই বললেন না তো চা পান করবেন?" বললাম, "নবেন্দু চা খায় না-আমি খাই এবং খেতে রাজী।" নবেন্দু বললো, "ওই খাক্ -আমরা এসেছি-" বলে সব জানিয়ে নিমন্ত্রণ জানালো এবং নিমন্ত্রণ পত্রটি তাঁর হাতে দিল।

উনি নিমন্ত্রণ পত্র পড়ে বললেন, "ইস্ কী হ্যাংলা। আমার ঘাড়ে চাপিয়েছে। ঠিক আছে যাবো। তবে S.M. কে জানাই-" ফোন তুলে নিলেন হাতে। আমরা বাইরে বের হলাম-নবেন্দুকে বললাম, "নিমন্ত্রণতো করা হয়ে গেল, পার্টি যদি না মানে?" নবেন্দু বললো, "সব খরচটা আমরা দিয়ে দেব"। নস্করদা বদরিকা দা সব শুনে খুশি হলেন। S.M. র লোক এসে জানাল, CPTM এর wife and son আমাদের কোচে আসবেন ঠিক Twelve hours. সমস্ত পিলগ্রিম প্লাটফর্ম পরিস্কার হতে থাকলো। হলো ভিখারী

এবং আনজান আদমী মুক্ত। খুব ভালো লাগলো পরিচ্ছন্ন প্লাটফর্ম দেখে।

আজ বিশ্রাম দিবস রাত্রির গাড়িতে জুড়ে দেবে কোচ। নূতন প্রোগ্রামে এসে গেছে। নবেন্দু দেখে খুব খুশি। অনেকে প্লাটফর্মে দড়ি খাটিয়ে জামা কাপড় শুকোতে দিচ্ছে। ভিখারী থাকলে এটা করা যেত না। এত কল ব্যবহার করা যাচ্ছিল না। গঙ্গাদার খাটুনি বেড়েছে। মাছ এনেছে বেশি করে, সুক্তোর বাজার এসেছে। বারোটার সামান্য আগেই বদরিকাদা নবেন্দু আর আমাকে ষ্টেশন গেটে যেতে বললেন। গাড়ি ওনাকে নামিয়ে দিয়েই চলে গেলো। সঙ্গে বালকপুত্র। দেখেই প্রথমে বললেন,"চা টা খেয়ে এলেন না। খুব রাগ হয়েছিল-জানেন?" অপ্রস্তুত হয়ে ক্ষমা চাইলাম। ছেলেটা একটি টিফিন কেরিয়ার নবেন্দুর হাতে দিয়ে বললো, "ড্যাডির জন্য সুক্তো দেবেন।" অমিয় ছিল কাছেই, সে হৃষ্টপুষ্ট এই বালকটাকে কোলে তুলে নিয়ে বললো,"নাম কী তোমার?" সে হেসে বললো , " অনির্বান দত্ত।" S.M. পর্যন্ত এসেছেন তাঁকে রিসিভ করতে। বাবা! যেন মহারানী। দেড়টার মধ্যে কোয়ার্টারে ফিরতে হবে। গাড়ি আসবে ঠিক একটায়। সব কিছু সময় বাধা। ফলে দ্রুতই ব্যবস্থা করে খাওয়ানো হল। বালক পুত্র ছাড়াও কয়েকজন সঙ্গে বসে খেলেন। ছেলেটাও চেয়েচিন্তে খেলো।

রাজকুমারদার স্ত্রীর হারানোর খবর শুনে জানালেন-"ভাষার বাধায় একবার কোদাই ক্যানালে গিয়ে তিনি ভূল হোটেলে চলে গেসলেন। জানালেন, এখানে নায়কমহল আর গান্ধী স্মৃতিভবন দেখা উচিত ছিল। মাদুরাই মানে হল মিষ্টি জল পাওয়া যায় এখানে। দুটি ছোট ছোট পাহাড়ের মাঝখানে এই শহর-ছোট্ট নদী আছে তার জল ,সত্যই সুপেয়। (২০০৩ খৃষ্টাব্দে সপ্তমবারের জন্য কন্যাকুমারিকায় যাবার পথে আবার আসি এখানে। সেবারে কোদাইক্যানাল, নায়কমহল গান্ধী মুজিয়াম দেখলেও নাগপাহাড়ে যাইনি।) এতবড় অফিসারের বৌ-এমন সহজ এবং নিরহংকার দেখে সবাই খুশি। আহামরি সুন্দরী নন, খুব একটা প্রসাধন করেননি। ৪০/ ৪১ বয়সী দুই সন্তানের মা-দুটোর মধ্যে গুড ডিফারেন্স। জানালেন, "উনি সুক্তো খেতে খুব ভালোবাসেন। আমি ভালো করতে পারি না। রাধুনি রাখিনি-সবতো তামিল। ঠাকুর মশায় যদি প্রিপারেশানটা লিখেদেন, তাহলে ভাল হয়। গঙ্গাদা লিখে দিয়ে বললো," এই বড়িগুলো বাংলায় হয়-আমি নিজে

ওড়িয়া হলেও এই বড়ি বাংলা থেকেই নিয়ে যাই-বছরে একবার আনিয়ে নেবেন মা।"

গাড়ি আসার খবর আনলো এক A S.M. নবেন্দু, নিজের হাতে টিফিন ক্যারিয়ার এবং মিষ্টির প্যাকেট (বদরিকদার আনা) দিয়ে এল গাড়িতে। এজাতীয় ভ্রমণে এই ঘটনা একটা বিশিষ্ট স্থান নিয়ে নেয়। রাজকুমারদার বৌ আবার বেশ সহজ হয়ে যায়। রাজকুমার দা গ্যাঁজাখোর মানুষ-কিন্তু তার বৌ প্রথম থেকেই বেশ সহজ সকল কাজে উৎসাহী ছিল-মাঝে কদিন কেমন যেন লজ্জা পাচ্ছিল, আজ থেকে আবার সহজ হল।

মনোমাদুরাইয়ে কাউন্টার ফাঁকা ছিল-কোচটাকে একটা সাইডলাইনে রেখে দিয়েছে। SM খুব দ্রুতই P.T.O. ভাঙতে সাহায্য করলেন। কাউন্টার ক্লার্ক ধানাই পানাই করছিলেন, চাইছিলেন সকলকে আনতে SM কী বলতে সেসব বায়না ভুলে কাজ করেদিলেন। কাজ সেরে গাড়িতে ফিরে এলাম। কোথাও ছায়া নেই। প্রচন্ড গরম। ছোট গাড়ি। পাশ দিয়ে একটা মেয়ে মাথায়হাঁড়ি নিয়ে "কু" বলে চেঁচাচ্ছিল। হরিদা হাত নেড়ে ডাকলো। এক ধরণের পানীয়। এক আনাগ্লাশ দর। কজন পান করলো। তেঁতুল, টকদই, লবন, চিনি মিশ্রিত জল। আমার পান করতে ইচ্ছে হলেও পান করিনি। (১৯২৫ সালে পার্টির সঙ্গে শেষ ট্যুরে শ্রাবণবেলগোলায় এই জাতীয় পানীয় পান করলেও তারা এর অন্য নাম বলেছিল।)

রামেশ্বরম একটা দ্বীপ। এখানে যেতে হলে যে রেলপথ তা খোলা এবং জোড়া যায়। নইলে অন্য জলযানের আসা সম্ভব হতো না-লেবেল ক্রশিংয়ের মত। এই ব্রিজের নাম পাম্বান ব্রিজ। ষ্টেশনও আছে এইনামে। রেলপথ পাতা ব্রিজটি দুভাগে ভাগ করা। রেল চলাচলের সময় দুটিকে এনে জুড়ে দেওয়া হয়। রেল চলে যাবার পরে আবার সরিয়ে নেওয়া হয়। (১৯২৫ সালে কন্যাকুমারিকা থেকে ডাইরেক্ট মটরে এসেছিলাম সঙ্গী ছিল মানিকদা আর সুনীল ছাড়াও এক মারাঠী পরিবারের তিনজন। একটি বছর ১৫ র কিশোরী ছিল-তাকে বিষয়টা চাক্ষুষ দেখিয়ে ছিলাম। বাস পথ হয়ে গেছে-পাম্বান ব্রিজের গুরুত্ব অনেক কমেগেছে।) ষ্টেশন এলাকায় যেখানে কোচটা রাখলো সেখানে বিষম মেছো গন্ধ। তবে ঝড়ের মতো হাওয়া বইছে-তাই সহ্য করা যাচ্ছে। নবেন্দু বললো, "জায়গা পাল্টাতে হবেই।" শেষে গানার কে আট আনা পয়সা দিয়ে একটা চমৎকার

জায়গা পাওয়া গেল-একে বলে কাট আউট-দুদিকেই তার প্লাটফর্ম আছে জলের লাইন আছে, মেজো গন্ধ অনেক কম। ওদের কাছেই জানা গেল ধনুস্কোডির লাইন ভেঙে গেছে, রাস্তা ডুবে গেছে, বাস চলছে না।

বিকাল হয়ে গেছে দেখে কেউ আর মূল মন্দিরে গেল না। সমুদ্র তীরে গণেশ মন্দিরের কাছে সবাই প্রায় বসে গেলাম। আমরা কজন সেই উচ্ছাসহীন পরিস্কার চকচকে জলে স্নান সেরে নিলাম। সন্ধ্যা গভীর হতে সমুদ্রতীর ছেড়ে গাড়িতে ফেরা গেল। শুতে হবে প্লাটফর্মের বেঞ্চে। অনেকগুলো বেঞ্চ আছে। জমিয়ে গলপ করা গেল। রাত্রে অনেক সামুদ্রিক মাছের ঝাল আর ভাতখেলাম। আশু, কুড়ু, দেবুদারা বাজার গেসলো। আশু বললো "এখানে মাছের দাম আলুর চাইতে সস্তা।" কে জানে হবেওবা।

এক বেঞ্চে শুয়েছি প্রবীর আর আমি। পাশের বেঞ্চে কাশীদা। বেশ কিছুটা দুরে আমাদের কোচ। কাছের বেঞ্চগুলো অন্যেরা দখল করেছে। শান্ত সুন্দর পরিবেশ, সুন্দর হাওয়া শরীরকে ঠান্ডা করে দিচ্ছে-তবু কেন যে ঘুম আসছে না। প্রবীর বললো, "১১টা বাজলো এবার ঘুমাই-তোমার গল্প থামাও।" এমন সময় দেখি আমাদের গাড়ি থেকে একটি মহিলা নামলো। কিছুক্ষণ পরে কাছে এসে বললো, "কাশীনাথ বাগ আছে?" "ওই তো" দেখালাম, বুঝলাম, নস্করদার স্ত্রী। আগে বাক্যালাপ হয়নি। কাশীদার কাছে গিয়ে বললো, "হোমিও প্যাথী ওষুধ নিয়ে গাড়িতে এসো।" দ্রুত পদে চলে গেল। বললাম ,"কী অভদ্র,

ফোরম্যানের বৌ তো কী হয়েছে-কাশীদা কী ওর বাবার চাকর।" প্রবীর বললো,"খুব মাছ খাচ্ছে, পার্টির দেওয়া খাচ্ছে। আবার চুরি করে খাচ্ছে-পেট খারাপ হয়েছে, মাথারও ঠিক নেই।" কাশীদা আমায় বললো," যাকগে ডেকেছে যখন যেতেই হবে। ওষুধের ব্যাগ তো সেই গাড়িতে, চল না ভাই তুই একবার জেনে আসবি, পিরিয়ড চলছে কিনা-এসব না জেনে ওষুধ দেওয়া যাবে না।" আমি লজ্জিত হলেও সুযোগটা নিলাম। গাড়িতে গিয়ে বোকার মত বললাম, "পিরিয়ড চলছে কিনা কাশিদা জানতে চাইলো।" নস্কর গিন্নি বললো, " কেসটা তোমার দাদার।" "তাই বলো নইলে তোমার হলে তো নস্করদা যেতো-তা কী হয়েছে-নাকি পুরো ব্যাগই আনতে বলবো?" পাশ থেকে নস্করদা বললো, "জাটী, কাশীকে বোলো ভীষণ পেট খারাপ হয়েছে।" প্রবীরকে ফিরে এসে বললাম, "তোমার কথাই

ঠিক।” সে বললো,“এবার ঘুমাও তো।”

ভোর না হতেই সমুদ্রতীরে গেলাম কাশীদার সঙ্গে। একটু আড়াল খুঁজে সেখানেই দুজনে প্রাতকৃত্যাদি সমাপন শেষে সমুদ্র স্নানে নামলাম। মুখ ধুতে গিয়ে বুঝলাম, চকচকে হলেও নুনের কমতি নেই। ঘাটে স্নানার্থি/র্থিনীদের বিব্রত না করে পাশে চলে গেলাম। সাঁতার কাটার ইচ্ছে হতে কাশীদাকে অপেক্ষা করতে বলে কিছুটা সাঁতরে পাড়ে ফিরে এলাম। বাঁধানো ঘাটে পায়ের তলায় ছিল পাথর, পাশে নামতে পেয়েছিলাম কাঁকুরে মাটি, এখন যেখানে নামলাম সেখানে মাটি, কয়েকটি জেলে মাছ মারছে, কেউ শাঁখ তুলছে। চকচকে জলের তলায় শামুকের মত শাঁখ ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রথম দেখে বুঝতেই পারিনি। পরে জেলেদের তোলা শাঁখ দেখে বুঝলাম। হেঁটে ফিরছি কাশীদার কাছে-হঠাৎ একটা জেলে জলবর্শা (কোঁচ) গিঁথে দিল আমার পায়ের সামান্য দূরে-চমকে উঠে রেগে গেছি তার এমন্বিধ আচরণে, চিৎকার করে উঠলাম। জেলেটি নির্বিকার চিত্তে বর্শাটা ওঠালো, বর্শায় গাঁথা ঝুলন্ত এক সাপ। বুঝলাম, সে অন্যায়কারীতো নয়ই, সে আমার প্রাণরক্ষা করেছে। পড়েছি এখানে বিষাক্ত জলচর সাপ আছে (পরে বুলা চৌধুরী বিখ্যাত সমুদ্র সাতারুর মুখেও শুনেছি।) যাইহোক অনেক কষ্টে তাকে একটা টাকা দিতে পেরেছিলাম।

ফিরে এসে জলযোগ করে রামেশ্বরম মূল মন্দির দেখতে গেলাম। পৃথিবী বিখ্যাত ছিল এই ভাস্কর্য্য গ্যালারী -দীর্ঘতম সেতুবারান্দম বলা হতো একে। মূল দেবতা স্ফটিকের। তাকে স্নান করানো হয় ব্রাহ্মমূহুর্তে-তারপর আবার স্বস্থানে রেখে দেওয়া হয়। সাধারণ যাত্রীদের রামভজনা করছে শিবকে এমন মূর্তি দেখানো হয়। এসবই আমার শোনা কথা। তবে ভাস্কর্যগ্যালারীটি দেখেছিলাম সাগ্রহে। রামায়ণ কাহিনীর ভাস্কর্য্য খুব ভাল লেগেছিল। (১৯০৩ এ এসে ব্যথিত চিত্তে দেখেছি এই বারান্দা (গ্যালারী) মূর্তি শূন্য-হয় বিক্রি হয়ে গেছে নয়তো প্রচার মেনে বলতে হয় সমুদ্র জলে নষ্ট হয়ে গেছে।) পরে গেলাম রামজী রোখাতে। সামান্য উঁচু ছোট্ট একটা পাহাড়ের মাথায় নাকি রাম থেমে.গেসলো। ধর্মব্যবসায়ীরা সেখানে চরণচিহ্ন এঁকে রেখেছে। ওপরে ওঠার জন্য হাতে টানা রিক্সা ছিল তখন। নস্করদার মা ছাড়া কারুর তা প্রয়োজন পড়েনি। আমি ভাবছিলাম, সমুদ্রের জল তাহলে কত কমে গেছে। জল নেমে যাওয়া জায়গাতে কত বড় জনপদ তৈরী হয়েছে। দুপুরে কজন T. T.

দের বলে পাম্বান ব্রীজ দেখতে গেল খাবার পর। আমি আর প্রবীর প্লাটফর্মের বেঞ্চে বসে গল্প করলাম-বিদ্যুৎদা অঘোরে ঘুমালো। শেষ সন্ধ্যায় ফিরতি প্যাসেঞ্জারে চলতে থাকলাম মনো মাদুরাই। ওখান থেকে যাওয়া হবে তিরুনেলভেল্লী। এখানে বাজারে কলা আর পাকা আম দেখে বিস্মিত হয়েছি। বেশ বড় বড় কলা, একটাতেই টিফিন হয়ে যাবে। পাকা আমগুলো ছোট ছোট হলেও বেশ মিষ্টি। নবেন্দু বললো, "বিষুবরেখার কাছে বলে গরম বেশি তাই পেকে গেছে। (পরে জেনেছি, বছরে দুবার আম হয় এখানে।)

যাইহোক SM নাকি বদরিকা দাকে বলেছেন, এখানে প্রচুর পর্তুগীজ ও ফরাসী রক্ত মিশ্রিত মানুষ আছে। তারা নাকি দিনের বেলা ধীবর রাতে ডাকাত হয়ে যায়। ফলে রাত্রে খালি গাড়ির দায়িত্ব তিনি নিতে পারবেন না, তবে বাসের বন্দোবস্ত করে দিতে পারবেন। দিনের বেলায় দায়িত্ব তিনি পালন করবেন। নবেন্দু আমাদের মত নিয়ে জানালো আমি জাটী খুড়ো আর, বিদ্যুৎ এখন যাবো না-বিকেলটায় গাড়ি কিছুক্ষণ ফাঁকা থাকবে-আমরা দুপুর দুটোয় বেরিয়ে পরদিন দুপুরে ফিরবো। SM এমত ব্যবস্থায় রাজী হয়ে সঙ্গে নিজে গিয়ে (এমনটি কখনও দেখিনি) বাস এনে ফেললেন। ওরা ৯টার মধ্যে স্টার্ট করে গেল। সঙ্গে বাসে গেল রাঁধা খাবার। আমরা তিনজন ধীরে সুস্থে বের হলাম পৌনে দুটোয়। SM কে বলে গেলাম বাস স্ট্যান্ড-সেটা প্রায় আধমাইল হবে, বাজারের কাছে।

বাস যাবে নাগেরকয়েল; সেখান থেকে অন্য বাসে যেতে হবে কন্যাকুমারিকায়। বাস টার্মিনাস খুব একটা দূরে নয়। বাস বেশ খালি, তিনজনে পাশাপাশি বসার জায়গা পেয়ে গেলাম ড্রাইভারের ঠিক পেছনেই। রাস্তা ঘাট মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। গ্রামের মধ্য দিয়ে পথ চলেগেছে। গ্রামের মাঝে মাঝে দাঁড়াচ্ছে-মানুষজন উঠেছে নামছে। যা দেখা গেল অধিকাংশই কুটির। বাস ষ্টপেজগুলোয় দুএকটা দোতলা বাড়ি। শেষ পর্যায়ে বাস ভর্তি হয়ে গেল। ষাট সত্তর মাইল চলে এসেছি মনে হয়-আড়াই ঘন্টা লেগে গেল নাগের কয়েল বাস টার্মিনাল। সেও এক বিস্ময় -বিশাল তার এরিয়া, মনে হয় পুরো উত্তরপাড়াটা এখানে ঢুকে যাবে। সারা ভারতে বাস যায় এখান থেকে। কন্যাকুমারিকার বাস পেতে যেতে হল সাউথ ব্লক। প্রায় ১৮ মিনিট হাঁটতে হল। টিকিট কেটে (কাউন্টার থেকে) বাসে

উঠতে হল। আমাদের ভাগ্য ভালছিল-বাস প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল কাউন্টার থেকে বাজা ঘন্টা শুনেই। বসার জায়গা পেয়েছি বিভিন্ন স্থানে। ছোট নতুন বাস-জনা কুড়ি বসা যাবে। পথের ধারে কাঁটাগাছের জঙ্গল। মাঝে মধ্যে বড় বড় গাছ। প্রায় এক দৌড়ে বাস চলে এল সমুদ্রতীরের এক ছাউনিতে। আবার বিস্ময়, অপার বিস্ময়-সূর্য্যাস্ত হচ্ছে সমুদ্রে। কন্ডাকটর হাত বাড়িয়ে মন্দির দেখিয়ে দিল। বুঝলাম বেশ খানিকটা পথ হেঁটে যেতে হবে। ওরা হাঁ করে সমুদ্রের ঢেউ আর সূর্যাস্ত দেখছিল। বললাম, "চল রাতের থাকা খাওয়ার জায়গা খুঁজতে হবে।" নবেন্দু বললো,"আমাদের বাসটাকে পথে দেখতে পাওয়া উচিত ছিল। " আমিও তা নিয়ে ভেবেছি, মনে হয় সর্টকার্ট অন্য পথ আছে।" ভাবলাম বিদ্যুৎদাই ঠিক।

মন্দিরের কাছে এলাম। জনহীন এলাকা। সমুদ্রের দিকে সিঁড়ি বানানো আছে। পুরোহিত মহাশয় সামান্য ইংরাজী জানেন। বোঝাগেল ৭-৩০ তে তিনি মন্দির বন্ধ করে চলে যান, ভোর ৬-০০ আওয়ার্সে আসেন। মন্দিরে দন্ডায়মান প্রস্তর মূর্তিতে তপস্যারতা দেবী কুমারী। মুর্তিটি একস্তরী পাথরের হলেও মন্দিরটা বেলে পাথরের। গর্ভগৃহ বেশ প্রশস্ত। নবেন্দুকে বললাম, "এখানেই শোওয়া যাবে।" কিন্তু পুরোহিত নারাজ। বাইরে ১০০ গজ দূরেই বাঁধানো স্নান ঘাট, সেটি আচ্ছাদন হীন হলেও কারুকার্য শোভিত। বসার জায়গাগুলি বেশ লম্বা চওড়া দেখে বললাম, "এখানেও শোয়া যায় । বিদ্যুৎদা বললো , "চলো এবার খাবারের সন্ধানে যাই।" উঠে এলাম সামান্য উঁচুতে। একটা নূতন মন্দির হচ্ছে শ্বেত পাথরের। সন্ধ্যা ঘনাচ্ছে। একজন মাত্র লোক। যাক বাবা, সে উত্তরপ্রদেশীয়। কথাবার্তায় জানা গেল এটি গান্ধী মন্দির হচ্ছে। তার কাছে আরো জানা গেল, বিবেক শিলায় মন্দির হবে। পাথরের স্তম্ভ জালি, নানা কাজ কর্ম হচ্ছে কাছেই-প্রচুর লোকজন কাজ কর্ম করছে। তাদের জন্য অনেক ঝোপড়িও হয়েছে তাদের জন্য খাবারের দোকান করেছে, সেও তার গাওবালী ভেইয়া-তার কাছেই সে খায়। খেতে চাইলে তার কাছে যেতে হবে তুরন্ত ।

ফলে তার নির্দেশমত চলে পেয়ে গেলাম। সবাই তাকে ভুজাবালা বলে চেনে। সে বাল্যকালটা কাটিয়েছে মালদায়-ফড়ের পাল্লায় পড়ে এখানে আসে। বোখার হয় তার, শেষ পর্যন্ত সেরে উঠে শ্রমিকদেরই সহায়তায় গড়ে তোলে তার দোকান। আট রোটী ভাজী

আর ছোলেকা ডাল আট আনা রেটে খেয়ে তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম-ওরা চলে গেল তার পরামর্শমত চার আনির বিনিময়ে তিনজনার শোবার ব্যবস্থা করতে-তার দেশওয়ালী ভাই মিশিরের কাছে-যে আমাদের পাঠিয়েছিল তারই কাছে-গান্ধী মন্দিরে। প্রশ্ন উত্তরেগল্পে যা জানা গেল-মন্দিরের পূর্বদিকে দক্ষিনীরা থাকে-সেখানে ঝুপড়িতে থাকে তারা অধিকাংশই জেলে। তাদের রান্না সে এখনও শেখেনি। একদুজন মাত্র ওড়িয়া জেলে তার কাছে খায়। বিবেকশিলায় সাঁতরে যাওয়া সম্ভব বলে সে বিশ্বাস করে না-সে ভাল সাঁতার জানে না। তাকে যখন বললাম আমি সাঁতরে যেতে চাই, দুজনে চেষ্টা করবো, নৌকা যোগাড় করে দিতে হবে। তখনই দুই ওড়িয়া জেলে এসে গেল। কথাবার্তায় ঠিক করে ফেললাম, "সকাল ৬টায় সে নৌকা নিয়ে থাকবে মন্দির ঘাটে। আমরা যাবো আসবো-দুটাকা নেবেতারা। তারা রাজী হতে ভুজাবালাকে বললাম, "ভোরেই দো আদমীকে লিয়ে চার চার রোটী চাহিয়ে। চাভি চাহিয়ে।

গান্ধি মন্দিরের মেঝে শ্বেত পাথরের। সেখানেই শতরঞ্জি পেতে শয়নের ব্যবস্থা। ফুর ফুরে হাওয়ায় ভালই ঘুম হলো। প্রভাতে উঠেই সব কাজ সেরে ভুজাবালার দোকানে গিয়ে নবেন্দু আর আমি রুটী খেলাম বিদ্যুৎদা পরে খাবে। চা পান সেরে ৬-১০ টা নাগাদ শূনশান মন্দির ঘাটে পৌছে দেখি নৌকা হাজির।

ত্রিচি ।। পারিনি, চরম ব্যর্থ। নবেন্দু প্রথমেই উঠে পড়েছিল (পরে জেনেছি) আমি প্রায় ২/৩ ভাগ গেসলাম। জলের নীচে থাকা কোন তার জাতীয় জিনিসে, আমার পা কেটে যায়। নৌকায় চড়ে ফিরে আসি (ফাস্ট এইড বাক্সটা এতদিনে আমার কাজে লেগেছে) গভীর কোন ক্ষত হয়নি, বাঁ পায়ের অনেকটা সরু করে চিরে গেসল খুব জ্বালা করছিল। এখনই তা সারার মুখে, শুকিয়ে এসেছে। প্রবীরের পরামর্শমত লীডমপল খেয়েছি, খাচ্ছি। সকলেই আমাকে ব্যাঙ্গ করেছে, নবেন্দুকেও করেছে, তবে ততটা নয়। কেননা আমি বলেছি বিবেকানন্দ আমার চাইতে অন্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হলেও বড় সাতারু ছিলেন না। প্রবীর বলেছে, "তিনি বড় সাধক ছিলেন ফলে প্রভূত মানসিক শক্তিধর ছিলেন-তা তো তোমার নেই।" মেনেছি সে কথা তবু মনে করি কদিন থেকে প্রাকটিস করলেই পারবো। এই শেষ কথার সমর্থনে একটা চিঠি পেয়েছি। সেদিন ঘাটে একটা কিশোরীর হাতের চিঠি থেকে। সে চিঠি

লুকিয়ে রেখেছি-বিদ্যুৎদা নবেন্দু দেখেছিল তবু ওদের পড়তে দিইনি। যাইহোক সেদিনের পরবর্তী ঘটনা লিখে ফেলি।

ঘাটে ফিরে কাঁদছি দেখে বিদ্যুৎদা সযত্নে ভালকরে মুছিয়ে দিয়ে পোষাক পাল্টে নিতে বললো। পোষাক পাল্টে আসছি পাথরের আড়াল থেকে তখন একটি কিশোরী আমায় ভাঁজ করা পাতা দিল। প্রশ্ন করলাম "কী?" সে বললো, "জানিনা, সুস্মিতা বললো তাই দিচ্ছি।" নিলাম তখন পড়িনি। বিদ্যুৎদা বললো এখনো রক্ত চুয়াচ্ছে। বললাম, "ভীষন জ্বলছে এখনও।" বোরোলীন লাগিয়ে অনেকটা এ্যাভেসিড টেপ লাগিয়ে দিল। কয়েকজন বাঙালী তীর্থযাত্রী এসেছিলেন তাঁরা চলেও গেলেন।

ভুজাওয়ালার দোকানে বসে বিদ্যুৎদা বললো, "তোমরা চলে যেতে সব নিয়ে বসে আছি একা। চাইছি জয়ী হও আবার ভাবছি পারবে না। এমন সময় পুরোহিত এলেন। তিনি সমুদ্র আর সূর্য্যদেবকে প্রণাম করে সমুদ্রের জল মাথায় ছিটিয়ে চলে গেলেন। তাকিয়ে আছি। নবেন্দু নৌকায় উঠে পড়লো। তখন একটা দল এসে গেল, প্রায় ষোলো জনের দল, বাংলায় কথা বলায় সাহস পেলাম। দুজন মাত্র বয়স্ক তার মধ্যে মহিলা, বাকীরা সব মনে হয় তাঁদের ছাত্র-ছাত্রী। যাইহোক উনিই এসে কথা বললেন। ওঁনারা আছেন শুচিন্দ্রমে। ছোট বাসে এসেছেন। মন্দির দর্শন সেরে যাবেন নাগের কয়াল। ছেলেমেয়েরা যখন জানলো যে দুজন সাঁতরে বিবেকশিলায় যাবার চেষ্টা করছে তখন উদগ্রীব হয়ে দেখলো নানা জনে নানা কথা বললো। যখন নৌকা ফিরতি পথ ধরলো বোঝা তো যাচ্ছিল না তোমায় দেখাই যাচ্ছিল না-তখন ওরাই বললো ফিরছে তখন পারেনি আমিও বুঝলাম ওদের কথা সমর্থন করলাম।"

(একটু আগে ব্রডগেজে এলাম। এতক্ষণ প্লাটফর্মের বেঞ্চিতে বসে লিখছিলাম। এখন বিদ্যুৎদার সীটে বসে লিখছি। পায়ের কাটা নিয়ে নয়, কষ্ট পাচ্ছি কোমরের ব্যথায়। খুব কষ্ট পেয়েছি কদিন। আজ সামান্য ভালো।) খাওয়া সেরে বাসষ্ট্যান্ড এসে বাস ধরলাম ১২-৩০ এর । এর পর ২-১/২টেয় বাস। নাগের কয়েলের বাস ধরতে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে পড়ে গেলাম। মনে পড়ে গেল। মনে হয় কোমরে তখনই চোট লেগেছিল। সন্ধ্যার সামান্য পরে সবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে মনটা খুশিয়াল হয়ে গেল। রাতে ভালই ভাত খেলাম মাছের ঝাল দিয়ে। শোবার জায়গা প্রায় নেইই-রাতের গাড়িতে

তো উপায় নেই। বসে আধশুয়ে চলে এলাম ত্রিচিতে।

ভোর রাতেও নবেন্দু আর বদরিকাদা গেলো SM এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। আমি কষ্ট পাচ্ছি বলে যেতে পারিনি। ইচ্ছা ছিল দত্তসায়েরকে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে জানাবো টুর সফল। নবেন্দু অবশ্য তা করেছে বলে জানিয়েছে। বাংলা থেকে কতদূরেও তিনি বাঙালীর বন্ধু থেকেছেন। অতবড় অফিসার হয়েও অত সহজ। যাক বাবা ব্রড গেজে এসে গেছি। বাকী শুধু মাদ্রাজ দর্শন। এখান থেকে ইরোড। ইরোড থেকে ৪ঘন্টা পরের ট্রেনে মাদ্রাজ যাবার ব্যবস্থা। কেবলই ঘুম পাচ্ছে।

মাদ্রাজ ।। ইরোড নিয়ে কিছুই লিখছি না। ষ্টেশনের বাইরে দুবারই বের হইনি। জানতে চেষ্টাও করিনি কিছু। গতবারে কজন বাজার গেসলো, এবারেও গেসলো হয়তো কেইবা জানে! ঘুম পাচ্ছে কেবলই-কোমরের যন্ত্রনাটা সামান্য কমের দিকে। প্রবীর ব লছে, "পতন জনিত ব্যথা নয়, সমুদ্র সাঁতারের সময়ই হয়তো এটান লেগেছিল-তুমি গোয়ার্তুমি করে তাকে বাড়িয়েছ।" হবেও বা-কতকী তো আমরা জানিনা তবে লীডমপল ওষুধটাকে নমস্কার-সেটা কাজ করছে। খুব খাচ্ছি আর ঘুমুচ্ছি-হ্যাঁ ইরোডে ভালভাবে স্নান করেছি হোসপাইপের জলে। গরম কাটছে না।

মাদ্রাজে এসে আবার বিপদ। রিজার্ভ কোচে এ এক নূতন ঝামেলা এমনটা কোন ষ্টেশনে হয়নি, আমাদের কোচকে স্পেশাল সার্ভিস দিয়েছে। রেলের কোচ, আমরা সবাই সবায়ের সহকর্মী। কিন্তু এখানের গানাররা তা মনে হয় মানে না।

ট্রেন এসেছে আটটা নাগাদ। কোচ টানলো ঘন্টা খানেক পরে। টেনে নিয়ে প্রায় পরের ষ্টেশন বেসিন ব্রিজের কাছে নোংরা এক নর্দমার কাছে রেখে চলে গেল। কী বিশ্রী ঝাঁঝালো গন্ধ। নবেন্দুকে ধরলাম। সে বিরক্ত চিত্তে যা তা বলতে শুরু করে দিল। দেখা গেল অনেকেই জায়গাটাকে মেনে নিয়েছে। পাশেই একটা হোসপাইপে কজন মহিলা স্নানও সারছেন। বদরিকাদার কাছে গেলাম। তিনি বললেন এসব কাজ তো ম্যানেজারের আমি কতদিক দেখবো? দুটো বাচ্ছাকে নিয়ে গিন্নী স্নানে নেমেছে- বাবা সবাই দেখছি বিরক্ত। ফলে বাধ্য হয়ে গেলাম ফার্ষ্ট ক্লাশে। নস্করদা বললেন, "খুব বিজি ষ্টেশন তো এতো অধীর হলে চলে?" প্রশ্ন করলাম, " SM এর কাছে কাগজপত্র পাঠিয়েছেন?" বললেন,

প্লাটফর্মে থাকা এক আর. পি. এফকে দশটা টাকা আর কাগজপত্র দিয়ে পাঠিয়েছি।" "সে চিঠি নিশ্চয় তি নি পাননি-আর RPF কে টাকা দিয়েছেন দেখে গানাররা রেগে গেছে। কাগজপত্র রেডি করে দিন নবেন্দুকে সঙ্গে নিয়ে যাই SM এর কাছে। কী জানি কী ভেবে সব লিখে দিতে ফিরে এসে নবেন্দুকে বলতে সে নারাজ হল, "এই দীর্ঘ পথ, এত রোদ্দুর, যাবো না।"

অগত্যা একাই চললাম। প্রচন্ড রোদে ছাতার তলাতেও এক মাইল পথ দুমাইল হয়ে গেল। লাইন ধরে হাঁটছি। কোমরে মাঝে মধ্যে কষ্ট হচ্ছে। SM এর কাছে পৌছে দরখাস্ত জমা দিলাম। সামান্য পরে Y.M. কে ফোন করলেন-পরে প্রশ্ন করলেন, " why so late to inform?" বুঝতে পারলাম না, বললাম, "PARDON PL" দরখাস্ত দেখিয়ে বললেন, "WHY SO LATE?" আমি বললাম, "Manager send a paper, handed over that to aRPF. propably that does not reach you, so I come" উনি হেসে ফেললেন, পরে বললেন- "That may be. Now you may wait on percel platform. your coach will stay there" আমি বিস্মিতনেত্রে তাকালাম। উনি বললেন, "Partake Platform I go straight at the end at right you get Parcel gate. Cross it and you get the parcel platform-understand" ?" "yes"। চলে এলাম তার নির্দেশমত। দাঁড়িয়ে থাকলাম। সামান্য পরে কোচ দিল। এমন পরিস্কার পরিবেশ পেয়ে সবাই খুব খুশি। সঙ্গীরা তখন অনেকেই খেয়ে নিয়েছে। তারা খুব প্রশংসা করলো। বিদ্যুৎদার কথায় তখন তার সাথে খেয়ে নিয়ে তবে গেলাম জলের সন্ধানে।

(জানি, পাঠকের এটা ভালো লাগবে না। তবু লিখি যে গুডুর, রেনিগুন্টা, মাদুরা এবং মাদ্রাজে এই রেল কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ পরবর্তী কালে আমায় চরৈবেতীর অন্যতম স্তম্ভে পরিণত করেছিল।) বিকালে নবেন্দু বললো, "চল সমুদ্রের ধারটা ঘুরে আসি।" "কোমরের ব্যাথাটা যাচ্ছে না-তাই শুয়ে আছি। দুপুরে কোনদিন শুতে দেখেছিস? কন্যাকুমারীর সমুদ্র স্নান জ্বালিয়ে দিল।" "বাসষ্ট্যান্ডে পড়ে গেসলি মনে আছে?" "লিখে রেখেছি।" "লিখছিস? তোর সময় আছে লিখছিস, আমি সময়ই পাচ্ছি না। কাল ভোরে বাসে করে মাদ্রাজ দেখা হবে। বাস ঠিক করে এলাম। বড় বাস ৫৮ সীটের। ঠিক করতে গেলাম রিজার্ভেশন অফিসটাও সেই সমুদ্রের ধারে-কাছেই চীপক ষ্টেডিয়াম

-সমুদ্রের পাড়েই হাইকোর্ট, ষ্টেশনটাও খুব সুন্দর।" উঠে পড়ে রেডি হলাম। সবাই প্রায় কমবয়সী, বয়স্ক বলতে সিধুদা আর তারিনীবাবু। সিধুদা হরিদার সহকর্মী, বয়স বেশী হলেও খুব দক্ষ কর্মী-আমরাও অনেকে হাতে কাজ শিখেছি তার কাছে। সদাহাস্যময় সরল মানুষ দুবার বিয়ে করেছেন দুটো বৌই মারা গেছে। প্রথম পক্ষের কন্যা বর্তমানে দিদিমা হতে চলেছে। দ্বিতীয় পক্ষের কন্যাও মা হয়েছে। পুত্র নেই। একা একাই সবকিছু করে। ধনী চাষী-জায়গা জমি, ঘরবাড়ি আছে। কিষেণরা সব ভালোবাসে। তাদের ভরসাতেই সব ছেড়ে এসেছে। আর ভাল লাগছে না, বাড়ি ফিরতে খুব ইচ্ছা করছে। বেড়াতে বেড়িয়ে এদের সঙ্গে প্রায় কথাই বলিনি, আজ বললাম।

তারিনী প্রসন্ন দেবনাথ চট্টোগ্রামের থেকে আসা মানুষ। রংঘরের প্রায় সবাই তাকে তারিনী'ব' বলে ডাকে। বয়স্ক বিপত্নীক ভ্রমণ পিয়াসী মানুষ। কর্মজগতেও কম কথা বলে। খুব অন্তর্মুখী মানুষ। তবু আজ বেশ কথা শোনা গেল। চট্টোগ্রামে সমুদ্রের ধারেই তার গ্রাম ছিল। ছোট বেলা থেকেই উচ্ছ্বসিত সমুদ্র দেখেছে। দলবল মিলে পায়দলে চলেছি। নবেন্দু পথ নির্দেশক। নবেন্দু সকলকে দেখালো, "এই হল মাদ্রাজ হাইকোর্ট"। দেখলাম চোখ মেলে। দূরে লাইটহাউস। সমুদ্রতীর বিস্তৃত বিশাল। পড়েছি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম বীচ। সমুদ্র তীরে অনেক জেলে নৌকা। কাছে দূরে অনেক জাহাজ, ছোট ছোট নানা ধরণের জলযান। জলে বেশ ঢেউ আছে। দলে ছোট বড় ভাগ হয়ে গেল। সুন্দর হাওয়া বইছে। ঘুরতে ঘুরতে নবেন্দু বললো, "চল সাঁতরাই।" "পোষাক আনিনি।" "সেতো আমিও, আন্ডার প্যান্ট পরে নেমে যাব, জেলে ডিঙ্গির আড়ালে চল।"কোমরের যন্ত্রণার কথা না বলে নেমেই পড়লাম। কাছে থাকা বিদ্যুৎদার কাছে পোষাক রাখছি তখন অমিয় গুপ্ত এসে গেল, বললো, "দশটাকা দাও গাড়িতে ফিরেই দিয়ে দেব।" বিদ্যুৎদাকে বললাম, "দিয়ে দাও।" অমিয় বললো, "রাশিয়ান জাহাজটার দিকে যেওনা যেন।" না, যাইনি। বেশিক্ষণ সাঁতরাতে পারিনি-নবেন্দু কিছুক্ষণ সাঁতরালো। আমি পাড়ে দাঁড়িয়ে। নবেন্দু ফিরতেই জল থেকে উঠে পড়েছি। পোষাক পাল্টিয়ে দলের কাছে। বিশাল এক ভেটকি মাছ অমিয়র হাতে। দলের সবাই ছাড়াও অন্য স্থানীয় মানুষও আছে। কাছে যেতে অমিয় বললো, "জাটী আট

টাকা নিয়েছে দু টাকা নাও।” নিলাম দু টাকার নোটটা। অমিয় বললো, “সবাই মিলে খাবো।” হাসছি সবাই এমন সময় দেখি স্যান্নাল সাহেব-লিলুয়া কারখানার উচ্চপদস্থ অফিসার; তিনি হেসে বললেন, “আমরা ভাগ পাবো না,” সকলেই হাত তুলে নমস্কার জানালাম। কথা হলো, তিনি সপরিবারেই (স্ত্রী-কন্যা সঙ্গে ছিলেন) আসবেন গাড়িতে রাতের মিল খাবেন। জানিয়ে রাখি তিনি আসেননি। হয়তো তাঁর পরিবারের আপত্তিতে।

ভোরেই বাস এসে গেলেও ষ্টার্ট করতে ৭টা বেজে গেল। গঙ্গাদারা যাবেনা-নস্করদার মাও গাড়িতে রয়ে গেলেন। বাস প্রথমেই নিয়ে গেল কপালেশ্বর শিবমন্দির। আমি ঢুকিনি-চায়ের দোকানে গেলাম কজনে। এদিকটাকে হয়তো ময়লাপুর বলে। তা ময়লাতো ময়লাই। খুব অপরিস্কার এখনো এদিকটা, কেমন যেন জঙ্গুলে। পোষা কিছু ময়ূর আছে। একজন স্থানীয় ইংরাজী জানা লোকের কাছে জানা গেল-ময়লা মানে নাকি ময়ূর। তা থেকেই নাকি এজায়গার নাম ময়লাপুর। কে জানে বাবা। স্যানটোম ব্যসিলিকা ক্যাথিড্রালও কাছাকাছি। বোঝা যাচ্ছে এখানেই প্রথম পর্তুগীজ কলোনী গড়ে ওঠে। সেন্ট টমাসকে পর্তুগীজরা স্যানটোম বলে। এই সেন্টটমাস হচ্ছেন যিশুর অন্যতম শিষ্য। ভারতে সম্ভবত তিনি পালিয়ে এসে আশ্রয় নেন কোচিনের কোন দ্বীপে, পরে সেখানেও ইহুদীদের উপস্থিতি দেখে চলে আসেন চোলামন্ডলে। ময়লাপুরমে তিনি আশ্রয় নেন এবং এখানে একটি গির্জা বানান। ইহুদীরা এখানেও তাঁকে তাড়া করে ফলে কিছুদিন তিনি নিকটবর্তী এক গুহায় কিছুদিনের জন্য আশ্রয় নেন। সেই স্মৃতিতে পরবর্তীকালে সেই গুহাটিও রোমান ক্যাথলিকরা চার্চের মধ্যে করে নেয়। (এক যাজক শ্রেনীর লোকের কাছে শুনেছি।)

বাস নিয়ে এল পার্থসারথি মন্দিরে। পার্থের / অর্জুনের অনেক সারথি থাকলেও পার্থসারথি বলতে যাদব কুলপ্রধান শ্রীকৃষ্ণকেই বোঝায়। শিব হচ্ছেন অনার্য দেবতা। অনার্যরা বাধ্য ছিল দরিদ্র থাকতে। আর শ্রীকৃষ্ণ ছিল গোয়ালাদের। এই জঙ্গলে জায়গায় পশুপালন বেশ সুবিধাজনক ফলে এখানে যাদবদের দেবমন্দির থাকা স্বাভাবিক। জানা গেল মন্দিরটি পল্লব যুগের। গোপুরমের কাজ এককথায় অনবদ্য। কপালেশ্বর শিব মন্দির ভালোভাবে দেখিনি। নবেন্দু বলেছিল, “ওটাও

খুব সুন্দর।" ওখানেই জানা গেল, তামিলদের বিখ্যাত কবি তিরুভাল্লুভারের নাম। জানাগেল তিনি কবি কালিদাসের চাইতে প্রাচীন ২য় শতকের কবি তার বিখ্যাত পুস্তকের নাম কুরুল (এখনও পড়ে দেখিনি ২০০৯) - তাঁর স্মৃতিতে এখানে ভাল্লুভার কোট্রাম বলে একটা অডিটোরিয়াম হচ্ছে। (এর একটা ৮৪ ফুট উচু মূর্তি তৈরী হয়েছে কন্যাকুমারীকা মন্দির এবং বিবেকানন্দরকের মাঝামাঝি নূতন জেগে ওঠা চরে। ২০০৩ সালে যেদিন কন্যাকুমারীকামন্দিরের কাছে যাই সেদিন উপরাষ্ট্রপতি কৃষ্ণ আইয়ার সেটি পরিদর্শনে গেসলেন।) শহরের শেষ প্রান্তে দরিদ্র মানুষদের বাসছিল-ফলে জমি ও জঙ্গলে জায়গা কিনে এখানেই এখন গড়ে উঠেছে স্নেক পার্ক (পরে দেখেছি-এর মালিক এক আমেরিকান সমুদ্রতীরবর্তী কুমীর প্রকল্পটিও নাকি তারই সৃষ্টি।)

পার্থসারথি মন্দিরে স্বল্প হার সারা গেল। আবার চা পান সেরে বাসে উঠতে বাস শহরের দিকে ছুটতে থাকলো। কিন্তু চলে এল এগমোরের দিকে। এগমোরে আছে মিটার গেজ লাইন। জানলাম আর্টগ্যালারী ও যাদুঘর ওদিকেই। তা দেখে তবে শহরে যাবে -শেষকালে নামিয়ে দেবে ম্যারিনাবীচে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে ফিরতে হবে-এমনই নাকি প্রোগ্রাম হয়েছে বাসের সঙ্গে।

আর্টগ্যালারীর বাড়িটা মনে হয় কোন মুসলমান নবাবের বাড়ি ছিল। এতক্ষণ হিন্দু স্থাপত্য এবং পর্তুগীজ স্থাপত্য দেখেছি, কোথাও মুসলিম ঘরাণা ছিল না, এটায় মোগলী ধাঁচ আছে মনে হল। অনেক প্রাচীন চিত্রকলা সংগৃহীত আছে-বর্তমান দিনেরও কিছু ছবি আছে। একটা আলাদা ঘরে সূচী শিল্পের জরির কাজ প্রভৃতি আছে। (বর্তমানে এটি যাদুঘরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে) ঠিক পাশেই একটা বড় চত্বর পেরিয়েই যাদুঘর। এটি মনে হয় বৃটিশদের হাতে তৈরী। কালেকশন ভালই। কোলকাতার যাদুঘর দেখেছি অনেক বার ফলে বলতেই হয় তেমন কিছু তেমন আহামরি নয়-তবু ব্রোঞ্জ যুগের কালেকশন অনেক উন্নত মানের। পল্লব, পান্ড্য চের, চোল যুগীয় সংগ্রহ প্রশংনীয় আর সবচেয়ে ভাল লেগেছে অমরাবতীর বৌদ্ধস্তুপ থেকে সংগৃহীত বস্তুরাজি। অনবদ্য এর রেলিক্স। একটা ভালচার (শকুনি) কে সম্ভবত: মমি করে রাখা আছে। বিরাট তার আকৃতি-জীবন্ত মনে হয়। (এ প্রসংগে জানাই যে অমরাবতী হচ্ছে বিজয়ওয়াড়ার কাছে, কৃষ্ণা ড্যামের অপর পাড়ে।) এটা দেখা হতে বাস

চলে এল মাদ্রাজ শহরের মধ্যে। সেন্ট জর্জ ফোর্ট-দুর্গের সামনে ম্যারিনা রোডে বাস থামলো। সময় দুঘন্টা। এরই মধ্যে বাইরে থেকে দেখছি (প্রোগ্রাম মত) ষ্টেডিয়াম, চীপক প্যালেস, ডিয়ারপার্ক বিশ্ববিদ্যালয় ভবন, সিনেট হাউস, বরফ কল,এ্যাকোরিয়াম ভবন, আরো কতকী নাম বলেছিল কান্ডাকটর-সব ভালো মনেও নেই (পরে এসে এগুলি পায়ে হেঁটে দেখেছি) তাই নামগুলো লিখেদিলাম-একজন স্থানীয় ASM বলেছিলেন, "you have not seen much morethan you see," সেটা তো পথিককে/পর্য্যটককে মেনে নিতেই হয়।) যাই হোক ফিরে আসি সেন্ট জর্জ দুর্গে। নবেন্দুর ইচ্ছায় গাইড নেওয়া হল। সে ইংরাজীতে বলেছিল।

হাসি পেল এই দুর্গের নামও কাহিনী শুনে । দুর্গের নাম সেন্ট অর্থাৎ সাধু অথচ অত্যন্ত অসাধু উপায়ে শ্রেফ অস্ত্রবলে বলীয়ান ইংরাজরা এই দুর্গ তৈরী করেছিল। চন্দ্রগিরির রাজার শাসনাধীন ছিল এই স্থান। ইংরাজরা ব্যবসায়ের জন্য লিজ নেয় দুবছরের জন্য। তারপর এই দুর্গ নির্মাণ সুরু করে। চন্দ্রগিরির রাজার বাধা না মেনে এরা নির্মান কার্য্য চালাতেই থাকে। (ঠিক পশ্চিমবাঙলার কোলকাতার মত-সেখানে ছিল সিরাজ-এখানে চন্দ্রগিরি রাজ) চোদ্দ বছর ধরে গড়ে ওঠে দুর্গ। ২০ ফুট চওড়া নাকি মূল দেওয়াল তখনকার ধাসাবারুদের কামানে ফরাসীও তা ভাঙতে পারেনি-তবু দুবছর দখলে রেখেছিল। ক্লাইভের উত্থান এখান থেকেই। তারই চালাকিতে নাকি পুনরুদ্ধার হয় দুর্গটি (পরে বাংলাতেও জেতে সেই চালাকিতেই) দুর্গের সংগ্রহশালায় আছে তখনকার ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র দলিল ইত্যাদি। (মেজাজ খারাপ থাকায় ভাল করে দেখিনি-পরে আর কোনবার এখানে ঢুকিনি)। দুর্গের মধ্যে একটা চার্চ আছে। এটা নাকি ভারতের প্রথম প্রটেষ্টান চার্চ। ওসব আমি বুঝিনা। গাইডের কাছে শুনেছি-যা মনে আছে লিখছি-কে এক ধনী আমেরিকানের টাকায় এই চার্চ হয়েছিল। গির্জায় একটি বিখ্যাত ছবি আছে দি লাষ্ট সাপার তাতে নাকি র‍্যাফেলের ফিনিশিং টার্চ আছে। এটি নাকি পন্ডিচেরী (ফরাসী) থেকে লুণ্ঠিত। হায়রে সাধু, হায়রে দুর্গ। ম্যারিনার বীচ তো আগেই দেখেছি। এর মধ্যেই আছে লাইট হাউস দুটি-একটি পুরাতন, তাতে ওঠা যায় না। নূতনটিতে প্রবেশমূল্য দিয়ে ওঠা যায়। তবে পুরানটাই উচ্চতম। এরই লাগোয়া চত্বরে হাইকোর্ট। (আন্নাদুরাই স্কোয়ার স্মৃতিমন্দির তখনও

নির্মীয়মান ছিল। বর্তমানে ম্যারিনার বীচে অসংখ্য ক্লাবের মাঠ তৈরী হচ্ছে, অনেকগুলো স্মৃতিমন্দির হয়েছে।)

ভ্রমণ শেষ হলেও শেষ নয়। হাওড়ায় ফিরলে তবে শেষ হবে চরৈবেতীর ভ্রমণ। এতগুলো অলমোষ্ট আনাড়ি শ্রমিক শ্রেণীর মানুষকে সঙ্গে নিয়ে গেছি, তাদের দায়িত্ব নিতে হবে। অধিকাংশই তো আমাদের সহকর্মী-হয়তো কেউ কেউ ওপর চালাক, কেউ বোকা সেজে থেকে বাগিয়ে নেয়, কেউ তেল মারে আবার অন্যত্র গালি দেয়, কেউ সদাহাস্যময় কেউ গোমরামুখো কিছুতেই স্বস্তি নেই-নানা রকমের মানুষ নিয়েই জগৎ সংসার। সবাইকে খুশি করা যায় না। উকিল এসে বললো, "জাটীদা মেজদা আপনাকে আর দত্তদাকে ডাকছে।" ভাবনা ছিন্ন হলো, উকিল বললো, "লিখছিলেন-ইস-যাকগে যাক মেজদা বসেছে রবিদার খাটালে'৪ (কিউবিকলকে কারখানায় খাটাল বলি)। যাইহোক গেলাম।

সমস্ত কর্মকর্তা হাজির। নস্করদা বললেন, "জাটী তোমাদের ব্যাঙ্গালোরে কত খরচ হয়েছিল?" "সেটা জানার এক্তিয়ার পার্টির নেই। আমারা দুজনেই বলে দিয়েছি ওই পয়সা আমরা নেব না," বলে দিল প্রবীর। আমি বললাম, "এর জন্য ডাকাবার কোন দরকার ছিল না। রবিদা আর বিদ্যুৎদার কাছে আগেই বলেছি।' "তবু সবায়ের সামনে কথাটা হওয়া চাই।" বললো বিদ্যুৎদা। তারপর বললো কেনাকাটা সব শেষ দলগত খরচের জন্য এক শত টাকা রেখে বাকী সকলকে মাথাপিছু ১.৭৫ পয়সা ফেরৎ দেওয়া হবে।" বদারিকাদা বললেন, "আমি হিসাব দেখেছি-এত কম খরচে ভ্রমণ করা নিয়ে চিন্তিত ছিলাম-বিদ্যুতের সাহায্য পেয়ে সাফল্য পেয়েছি, খুব আনন্দ হচ্ছে।" নবেন্দু বললো, "টাকা ফেরৎ দিয়ে সই করিয়ে নে বিদ্যুৎ।" কিউবে এসে নবেন্দু চুপি চুপি জানালো, "হরিদার পক্স বেরিয়েছে, জঙ্গলপাড়ার সকলে সিধুদা , কাশী, হরিদার ফ্যামিলি সবাই অন্য কামরায় চলে যেতে চাইছিল, আমি প্রবীরের পরামর্শ মতো গাড়িতেই রেখে দিয়েছি, বলবে, জ্বর হয়েছে। প্রবীর বলেছে বসন্ত রোগের প্রথম দিকে সংক্রমণের ভয় নেই, গুটি শুকালেই ভয়।" "ঠিক করেছিস।" "ব্যাঙ্গোলোরে কত খরচ হয়েছিল? প্রবীর বলেছে চল্লিশ টাকা।" বললাম "জানিস তো প্রবীর খুব সত্যভাষী-সেদিন প্রাণভরে মাংস খেয়েছি-দুপুরে মাংস ভাত রাতে লুচি মাংস মিষ্টি।" নবেন্দু বললো,

"তাতে কী চল্লিশ টাকা লাগে?" "বা বাসভাড়া যে ১৮ টাকা।" "হ্যাঁ তাও তো বটে।"

ট্রেন চলেছে। বিদ্যুৎদার সীটে বসে লিখছি। গাড়ির আলোতে কষ্ট হচ্ছে, তবু লিখছি। কত কথা যে জমা আছে মনে। লিখে তাকে শেষ করা যাবে? কাছে এসে গেল কালীদার দুইকন্যা। এদের সাথে বিশেষ কথা বলিনি কদিন, ওরাও ব্যস্ত ছিল ভ্রমণ নিয়ে। বাচ্চু বললো, "বসবো জাটী কাকা?" বুড়ু বললো, "এত কম আলোয় লিখলে চোখ খারাপ হয়ে যাবে তো! লেখা থামিয়ে খাতা বন্ধ করে বললাম, "বসো। তারপর? এতদিন পরে ফুরসৎ পেলি?" বাচ্চু বললো, "রোজই তো ইচ্ছে করে। কিন্তু সময় কোথায় বলো। ছোট লাইনে জায়গাই নেই।" তা ঠিক, কেমন বেড়ালি?" পংকজ আর উকিল ছিল, অন্যেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে। প্রবীর বসেছে সাইড বার্থে বাইরে চোখ তার। পংকজ হাওড়ায় এদের কাছাকাছি থাকে তার বাবা এদের পারিবারিক ডাক্তার। সে বললো, "বাচ্চু ঢেড়শ মার্কা বুড়ু বল কেমন বেড়ালি কী কী কিনলি, বাবাকে আবদার করে খুব বাগিয়েছিস?" বাচ্চু বললো, "না একটুও বায়না করিনি কেবল বলেছি প্রত্যেকবছর বেড়াতে বেড়োবো।" বুড়ু বললো, "আমার বাবা তো তোমাদের মত বড়লোক নয়।" পংকজ সামান্য থিতিয়ে গেল "আমিও দিদির মত বলেছি প্রত্যেক বছর বেড়াবো বাবা এই রকম সুন্দর দলে গেলে খুব ভাল লাগবে-একটু যা শোবার কষ্ট পেয়েছি ছোট গাড়িতে-বাকী কিছু কষ্ট পাইনি; খাবার, স্নানের, পড়া, খেলার জন্য কোন চিন্তাভাবনা নেই-পরিবারের সবাই আছি কী মজায় যে কাটিয়েছি কদিন কী বলবো?" যাক তাহলে ট্যুর সত্যিই সফল। ছোটরা যতটা উপলব্ধি করে বড়োরা নানা এ্যাঙ্গেলে দেখতে গিয়ে ততটা হৃদয় দিয়ে অনুভব করে না।

নানান গল্পে কাটলো কিছুক্ষণ। জানাগেল পংকজ ত্রিচিনা পল্লী থেকে কয়েক জোড়া কাঁচের বালা কিনেছে। উকিল অনেকগুলো সিল্কের রুমাল কিনেছে কাঞ্চীপুরম আর মাদুরাই থেকে, কন্যাকুমারীকা থেকে বহুরঙা বালিএনেছে এক জেলের কাছ থেকে। চাবীর রিং এনেছে নাগের কয়েল বাসষ্ট্যান্ড থেকে। বাচ্চু শেষ কালে জানাল "মা একটা শাঁক কিনেছে রামেশ্বরমে।" বা ভ্রমণের সঙ্গে স্মৃতিচিহ্ন রাখাও জড়িয়ে আছে। আমি কিছু কিনিনি, স্মৃতিকে জমিয়ে রাখছি খাতায়। সেও তো এক ধরণের সঞ্চয়। খাওয়া শেষে গুডুরে শোবার তোড়জোড় করছি তখন নবেন্দু

বললো, "আবার বিপদ।" জানা গেল তারিনী বাবুর ভীষণ পেট খারাপ হয়েগেছে। কাশী বা প্রবীরের হোমিওপ্যাথ ওষুধে কিছু হল না-পংকজের আনা এ্যালোপাথিক ক্যাপসুলে ভরসা করেই চলে এলাম বিজয়ওয়াড়ায়। এখানে ২০মি ষ্টপেজ। নবেন্দু আর আমি ছুটলাম SM এর কাছে। তাঁর সাহায্য পেয়ে পাওয়া গেল ডাক্তার এবং নার্স। SM বলে দিলেন They will run upto waltair give them only 50 rupees ট্রেন এক্সট্রা টাইম দাঁড়িয়ে রইল। তাঁরা উঠতে তবে গ্রিন সিগন্যাল দিলেন ASM ষ্টেশন ষ্টাফেদের সহযোগিতা মনে রাখার মত।

নার্স ক্ষিপ্রহাতে সবকিছু নির্বিকার ভাবে পরিস্কার করে দিলেন। ডাক্তার ইনজেকশন দিয়ে নাড়ি ধরে বসলেন। জ্ঞানফিরতে ক্যাপসুল গেলানো হল। ওয়ালটেয়ারে যখন নেমে গেলেন তখন কথা বলতে পারছে। বিদ্যুৎদা ৫০ টাকা দিল।

ভদ্রকালী ।। ফিরে এসেছি। পরদিন কাজে জয়েনও করেছি। এখন সন্ধ্যা, হ্যারিকেনের আলোয় লিখছি (বাড়িতে ১৯১৯ সালে ইলেকট্রিক এসেছে) ভ্রমণ নিয়ে কী আর লিখি? হরিদা বা তারিনী'ব' কেউ কাজে যোগ দেয়নি। অবশ্য জানতামই যে পারবে না, তবে তারিনীদা সারবে কদিনেই। হরিদার সারতে দেরী হবে। যাহোক শেষ দিনটার কথা লিখে ফেলি।

কাল সকালেই হাওড়া পৌঁছাবো। এখনও উড়িষ্যায় আছি। নানা জনে কথা বলছে, কিছুই মাথায় দাঁড়াচ্ছে না। নবেন্দু বললো, "ঘর ফেরা গরুর মত অবস্থা-এত দীর্ঘ ট্যুর করা উচিত নয়।" প্রবীর বললো, লোকে অনেক কষ্টে বের হয় একবারে না দেখে বারে বারে দেখবে এমন সামর্থ কজনের থাকে? আমরা ব্যচিলর মানুষ তাই কষ্টটা বুঝতে পারছি না।" বললাম " দুজনেই ঠিক বলেছে। ট্যুর করতে হলে সময় চাইই-তাই মনে রাখতে হবে সব দলে একই লোক যেতে পারবে না-প্রত্যেকের আলাদা আলাদা সমস্যা আছে।" পংকজ বললো, "মিটার গেজের রাত গুলো ছাড়া ভালই লেগেছে।" উকিল বললো "মতামত লেখার জন্য একটা খাতা রাখলে ভাল হয়।"

না, আর বিশেষ কিছু মনে পড়ছে না। তবে হাওড়া ষ্টেশনে অনেক প্রণাম পেলাম। অনেক আশীর্বাদও পেলাম। নবেন্দুদের কর্ডলাইনের গাড়িতে তুলে দিয়ে কাশীদাকে হরিদার সম্পর্কে সজাগ

থাকতে বলে ব্যান্ডেল লোকালের দিকে পা বাড়ালাম।

পরিশিষ্ট ঃ- ১৯১৯ সালে রিটায়ার করার পর ঠিক করি ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশ করবো। তখনই খাতাটাকে খুঁজি। যা ছিল তারসঙ্গে কিছু জুড়েছি () { } দিয়ে। [ ] বন্ধনীটা একেবারে ১৯০৯ সালের।

এবারে লিখি নামটা নিয়ে। দাক্ষিণাত্য নাম নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল এক সাহিত্য সভায়, তখনই ঠিক করি এর উত্তরটাও দেওয়া চাই। একবার ভেবেছিলাম যখন ছাপাবো তখন বাচ্চু বুড়ুকে গল্প বলছি হিসাবে সব বলে দেব। পরে ভাবলাম, সে হবে মিথ্যাচার। পরে যদি আরো বই প্রকাশ করতে পারি, তখন দেখবেন তারাও ধীরে ধীরে উন্নত হয়েছে। পর পর ছটা ট্যুরেই তারা যায়। তাই মত পাল্টে ঠিক করি পরিশিষ্টে সব লিখবো।

দাক্ষিণাত্য শব্দ থেকেই বোঝা যায় দক্ষিণের কথা। ভারতবর্ষে বাস করি তার দক্ষিণভাগ হলো দাক্ষিণাত্য। উত্তরভাগ হলো আর্যাবর্ত্য। (কেউ কেউ আর্য্যাবর্ত্ত ও লেখেন) এখন কথা হচ্ছে কাকে দক্ষিণ বললো? তখন দ্রাঘিমা অক্ষাংশ সাধারন্যে চালু ছিল না ফলে সাধারণ মানুষ মেনে নিয়েছিলেন বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণকেই দাক্ষিণাত্য বলা হবে। বর্তমানে বিন্ধ্যপর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হলো মেকাল বা মহাকাল পর্বত যা অমরকন্টকে অবস্থিত। এখানেই আছে নর্মদার উৎস। (প্রসংগত জানিয়ে রাখি, পুরীতে আমি ৩০০ রাতের বেশি থেকেছি হরিদ্বারে থেকেছি ১০০র বেশি রাত এর পরেই সবচেয়ে বেশি থেকেছি অমর কন্টকে, এখানে ৫০ রাতের বেশি থেকেছি।) যাইহোক পুরানো ধারণা অনুযায়ী দাক্ষিণাত্য এক সুবিশাল জনপদ। তাকেও নিখুঁতভাবে দর্শন প্রায় অসম্ভব। আমার মত শ্রমিক তো ছার, কোন পর্যটকের পক্ষেও প্রায় অসম্ভব। সাধারণ পথিকের পক্ষে তো আরো কষ্টকর। প্রচুর দুর্গম এলাকাও আছে। আছে এখনও আদিম বন্য সমাজ, গহিন অরণ্য, গভীর গিরিবর্ত্ম, নদীখাত-অম্ললাভের প্রাদুর্ভাব।

তাই ভ্রমন করা হয়, পরিচিত সহজগম্য স্থানে, নামকরা জায়গাগুলিতেই। সেই চিহ্নিত স্থানগুলির নাম পাওয়া যায় ভ্রমণ গাইডে। সেই ভ্রমণ গাইডগুলো বিভিন্ন ট্যুরিষ্ট ব্যুরো প্রদত্ত রিপোর্টের সংকলন। ট্যুরিষ্ট ব্যুরোও সেগুলো পায় জরিপ বিভাগের কাছথেকে। তাঁরাই প্রায় প্রাণ হাতে করে পরিশ্রম করে এই সব তথ্য বা তত্ত্ব আহরণ

করেন। কোন কোন দু:সাহসিক ভ্রমণকারীও এইসব কাজ করে লেখেন-অনেকের পরিশ্রমের ফসল এই ভ্রমণ বিজ্ঞান। এই বিশেষ জ্ঞান মূলত: ভৌগলিক। সাধারণ অর্ধ বা স্বল্পশিক্ষিত মানুষ এসব না ভেবে, না জেনেই বেড়াতে যান রুচি পরিবর্তন বা বিশ্রাম নিতে। আর এখন তো পর্য্যটন একটা শিল্প-একটা জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্র। ভ্রমণকে সম্পূর্ণভাবে মানবিক বিষয় বলে ধরতেই হবে। আজকাল দূরদর্শনের কল্যানে পারিযায়ী পশুপাখিদের দেখে তাকে ভ্রমণ বলে চিহ্নিত করা যায় না। তাই লিখি, ভ্রমণ কাহিনী ভ্রমণের গাইড নয়। তবে কাহিনীকারকে পরবর্তী ভ্রমণকারীদের জন্য কিছু বলতেই হবে - নইলে তা ভ্রমণ কাহিনীই হবে না।

কথা হচ্ছিল দক্ষিনাত্য নিয়ে সেখানে ফিরি। বিন্ধ্যপর্বতেরও উত্তরে চিত্রকূট জনপদে প্রথম আশ্রয় নেয় বাল্মীকির রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্র। সেখানে দেখা যাচ্ছে, বানর কুলকে এমনকি শূর্পনখা, রাবনকে। সেটা কী তখন দাক্ষিণাত্য ছিল? প্রশ্ন জাগে মনে। যাইহোক বর্তমান বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ দিকে ছত্রিশগড় রাজ্য (অমরকন্টককে অর্থকরী দেখে সম্ভবত: মধ্যপ্রদেশ তাকে ছাড়েনি)। এই ছত্রিশগড় রাজ্য থেকেই দাক্ষিণাত্যের শুরু যা পুরাতন দন্ডকবনাঞ্চল। দন্ডক শব্দের অর্থ হল জল। তারি মাঝে উচুঁ স্থান গুলোতে বাস করতো নানা প্রজাতির মানুষ-এদের মধ্যে এখনও কিছু মানুষ আজও প্রায় আদিম। অবুঝমাড়ে গিয়েছি আমি। দন্ডক অঞ্চলে তিনবার মাত্র যেতে পেরেছি। দেখেছি সামান্য কিছু জীবন যাত্রাপ্রণালী। গেছি কিরিন্ডুল, দন্তেবাড়া, লৌহন্ডীগুড়া, ওর্চ্ছা, নারায়ণপুর, জগদ্দলপুর, খৈরামগড়, কুরুষপুর,গুপ্তেশ্বর, মৎস্যতীর্থ, দুদুমা, অরকু বড়াগুহালু প্রভৃতি স্থানে। দেখেছি প্রাচীনের ধ্বংস নবীনের উত্থান। নবযুগের আর্বিভাবে ধীরে অতিধীরে এরা সভ্যজগতে প্রবেশ করছে।

দন্ডকবনের পশ্চিম দিকে রয়েছে দক্ষিণ মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, পূর্বদিকে ওড়িশা আর অন্ধ্র। দন্ডকারন্য তো মধ্যপ্রদেশ থেকে অন্ধ্রেই চলে গেসলো (জানিনা বর্তমানে কতটা ছত্তিশগড়ে গেছে)। এখানে যে কবার এসেছি সবই তো অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তম থেকেই। (এ নিয়েও কিছু লিখেছি, কিছু কিছু পত্রিকাতেও তা প্রকাশিত হয়েছে।) দাক্ষিণাত্য নিয়ে লিখছি। বুড়ো বয়সে বকা রোগ ধরেছে। যতদূর জানি ভারতবর্ষ

৮°-৩৬° ডিগ্রী অক্ষাংশ আর ৬৮° ডিগ্রী থেকে ৯৮° ডিগ্রী দ্রাঘীমাংশের মধ্যে অবস্থিত সুতরাং ৮০° ডিগ্রী হচ্ছে আমাদের 1ST (INDIAN STANDARD TIME) আর মধ্য পথে রয়েছে ক্রর্কট ক্রান্তি রেখা ২২$^{১}/_{২}$° ডিগ্রীতে। তবু দাক্ষিণাত্য বলতে বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণকেই বোঝাচ্ছে। বিন্ধ্যপর্বত শ্রেণী ভারতের তিনটি মূল ভাগে বিভক্ত, প্রধানত পশ্চিমে বিন্ধ্য স্বনামে উপস্থিত, তারপরে মধ্যে মহাদেব, পূর্বদিকে মহাকাল যেখানে নর্মদা নদীর উৎস (অমর কন্টক)। বিন্ধ্যপর্বতের এই রেঞ্জ থেকে বেশ কয়েকটি নদীর উৎপত্তি। তাদের মধ্যে নামী হচ্ছে গোদাবরী, কৃষ্ণা, মহানদী, নর্মদা, তাপ্তী, শোন। শোন উত্তর বাহিনী হয়ে গঙ্গায় পড়েছে। নর্মদা তাপ্তী পড়েছে পশ্চিমের আরব সাগরে আর গোদাবরী, কৃষ্ণা ও মহানদী পড়েছে পূর্ব বা বঙ্গোপসাগরে। ছোট বড় নানা প্রপাত সৃষ্টি করেছে তারা। তীরে সৃষ্ট বনাঞ্চল আজও গহিন গভীর। বহু মন্দির ও জনপদ গড়ে উঠেছে এদের তীরে তীরে। খনিজ সম্পদেও পরিপূর্ণ এই দক্ষিণ ভারত।

অনেক বকা হল। এবার এখানকার দর্শনীয় স্থানগুলোর নাম লিখে ফেলি। তার আগে জানাই যে দাক্ষিণাত্য বলতে তামিল নাড়ু, কেরালা, অন্ধ্র, কর্ণাটক এই চার রাজ্যের নামগুলোই লিখেছি কেননা দন্ডকবনাঞ্চল লিখতে গিয়ে কিছু নাম লিখে ফেলেছি ইতিমধ্যে। প্রথমেই লিখে ফেলি তামিল নাড়ুতে যা যা বিখ্যাত অথচ দেখিনি তা লিখে ফেলি। (জানিয়ে রাখি আমার সংগ্রহও শেষ কথা নয়, অনেক অজানা দ্রষ্টব্য স্থলের নাম বাদ যেতে পারে।) তাঞ্জোর, তেনকাশী, কোদাইক্যানাল, পন্ডিচেরী-এগুলো অবশ্যই দর্শনীয়। এছাড়াও আমার মনে হয়েছে, তুতিকোরিণ বন্দর, তেরুচেন্দুর ও কুম্ভকোনম দেখা উচিত (পরে এসে এগুলো দেখেছি)। এর পর লিখি কেরালার দর্শনীয় স্থান সমূহ-(একবার ৪২দিন ধরে শুধু কেরালা দেখেছি) পদ্মনাভপুরম, ওয়ার কালা, কুইলন, কোট্টায়াম, টেক্কাডি, পেরিয়ার, ব্যাকওয়াটার,আলেপ্পী, তিরুবনন্তপুরম/ত্রিবান্দ্রম, পনমুড়ি, মুন্নার, এর্নাকুলাম/কোচিন, কালাড়ি, গুরুবায়ুর, কুডাংগালুর/ ক্র্যাঙ্গানোর, আলওই, ত্রিচুর, কোজিকোড়/ কালিকট, পালঘাট (এটির অবস্থান সম্ভবত: তামিলনাদে) সুলতান ব্যাটারী পেড়নামকোট্টা।

এরপর লিখি কর্ণাটকের কথা। দক্ষিণ থেকে উঠছিতো। ব্যাঙ্গালোর মহীশূরের নামতো লিখেছি তাই প্রথমেই লিখি উত্তকামন্ড/

উটির নাম। কুন্নুরও দেখে নেওয়া উচিত হবে। সোমনাথপুরম, শিবসমুদ্র (এখনই ঠিক করে নিই ভাইপো প্রলয় বললো উটি হচ্ছে তামিলনাদে-মনে পড়লো সে ঠিকই বলেছে। দুবারের মধ্যে সে একবার সঙ্গে ছিল।) মড়িকেড়ি/থলকাভেরী, শাওনবেলগোলা, বেলুড়, হালেবিদ, ব্যাঙ্গালোর, মাহে (জানিনা কোন রাজ্যে) শৃঙ্গেরী, ভদ্রাবতী, যোগফলস, চিত্রদুর্গা, হসপেট, হামফি, ধারোয়ার, তুঙ্গভদ্রাড্যাম, আইহোলী, বাদামী, পট্টাদকল, বিজাপুর, গুলবর্গা। এছাড়া অনেক না জানা। (এর মধ্যে অনেকগুলোই না দেখা)। এবার আসি অন্ধপ্রদেশে। (কোলার সম্পর্কে কিছু লিখিনি। যাইওনি। কিন্তু খুবই বিখ্যাত স্থান এটি ব্যাঙ্গালোর থেকে দেখা যায়।) পূর্বউপকূল ধরে কলকাতা/হাওড়া থেকে গেলে প্রথমেই পাওয়া যাবে ওয়ালটেয়ার/বিশাখাপত্তনম। কাছেই সীমাচলম। বিশাখাপত্তম থেকে দন্ডকারন্য যাওয়া যায়। দন্ডকারণ্য একসময় বিশ্বের সবচেয়ে বড় জেলা ছিল। সেটা বহুখন্ডিত হয়ে বর্তমানে ছত্রিশগড়ে ঢুকে পড়েছে। জানিনা অন্ধ্রপ্রদেশে তার কতটা পড়েছে। দক্ষিনে নেমে চলুন বিজয়ওয়াড়ায়-কাছেই মছলীপত্তম আর অমরাবতী। ওয়ারঙ্গেল পালামপেট দেখে সেকেন্দ্রাবাদ/হায়দাবাদ চলুন। সেখান থেকে দেখে নিতে হবে অন্ধ্রপ্রদেশকে।



স্বাধীন ভ্রমণ - ২য় পর্ব
(চরৈবেতীর সঙ্গে)
আর্য্যাবর্ত্তের কিয়দংশ

এই ভ্রমণটা সুরু হয়েছিল ১৯১৯ সালের মার্চমাসে দোলের আগের দিন। এই জাতীয় ভ্রমণের আগেও কিছু প্রস্তুতি পর্ব থাকে , ফলে কিছু কাহিনীর সৃষ্টি হয় যা এই ভ্রমণেরই অঙ্গ। তাই সেটা আগে লিখে রাখি।

প্রথম ট্যুর শেষ হতে প্রায় একমাস পরে সভাপতি দেবেন্দ্রবর্মণ একটি সভা আহবান করলেন। আমি প্রস্তুত হলাম কিছু বলার জন্য, বললাম। অভিযোগ করলাম ম্যানেজার ও সম্পাদকের নামে সোজা সাপটা জানিয়ে দিলাম তাদের অকর্মন্যতার কথা, বদরিকাদাও আমায় সমর্থন জানান। পরে তিনিই নবেন্দু বাঙ্গালকে সম্পাদক করার প্রস্তাব দেন। সভাপতি দেবুদার প্রিয় কর্মী প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ রবি রায় জানান যে বিদ্যুৎ মজুমদারকে চিরস্থায়ী কোষাধ্যক্ষ করা হোক। শেষ পর্যন্ত নতুন কার্যকরী সংস্থা নির্মিত হয়। কার্যকরী সভাপতি শ্রী দেবুকুমার মুখোপাধ্যায় ।। সম্পাদক শ্রী নবেন্দু বাঙ্গাল। সহসম্পাদক-শ্রী প্রশান্ত কুন্ডু।। কোষাধ্যক্ষ শ্রী বিদ্যুৎ কুমার মজুমদার।। যোগাযোগ রক্ষাকারী-শ্রী সুশীল জাটী।। কার্যকরী সাধারণ সদস্যবৃন্দ-শ্রী কেশব ঘড়ুই (m-shop) শ্রী প্রকাশ সেনগুপ্ত (T-Shop) শ্রী প্রদীপ সেনগুপ্ত (পাওয়ার হাউস) শ্রী গুরুপদ নস্কর (P-Shop) শ্রী আশুতোষ চক্রবর্তী ও শ্রী শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এবারে চললো ভ্রমণের প্রস্তুতি। দুর্গাপূজার পর থেকেই বেড়ানোর কথা চলতেই থাকলো। নবেন্দু আর আমি অনেক খেটে (প্রথম বারতো) প্রোগ্রাম তৈরী করলাম। সেই টুরিষ্ট কোচটা পাওয়া যাবে না। ওটা এবার ঐ সময়ে পাবে আনন্দম (আফিস পার্টি)। ফলে ঠিক হল কারখানায় একটা কোচকে সামান্য পাল্টে (রান্নাঘর বানিয়ে) ট্যুরে ব্যবহার করা হবে। এই কোচে কোন ফার্ষ্টক্লাস না থাকায় কোন উচ্চ পদাধিকারীর প্রয়োজন হবে না। আর কার্যকরী সভাপতি দেবু মুখার্জী বলে দিয়েছেন আমি বাপু কিছু করতে পারবো না তোরা তিনজন যা করার ঠিক করবি,

আমি হ্যাঁ করে দেব। "নবেন্দু বললো" না কুন্ডুকেও চাই"। "হ্যা ওকে তৈরী করে নিতে হবে" বললো দেবুদা। নবেন্দুর কৌশলটা তখন বুঝিনি। প্রশান্ত কুন্ডু ছিল দেবু মুখার্জীর প্রিয়তম পাত্র।

যাই হোক এবার ট্যুর প্রোগ্রামটা লিখে ফেলি। গেটে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল-চরৈবেতী উত্তরভারত ভ্রমনে যাচ্ছে। যাওয়া হবে এলাহাবাদ, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী, হরিদ্বার হৃষিকেশ, দেরাদুন, মুসৌরী, লক্ষ্ণৌ, বারানসী ও গয়া। দেড় সেট পাশ চাই-(১) হাওড়া হইতে দিল্লী ফিরতী দেরাদুন। ১/২ দেরাদুন হইতে হাওড়া। একমাস আগে দেখা গেল প্রায় ৩০০ জন যেতে চাইছে। অনেক ঝাড়াই বাছাই করেও নব্বুইয়ের কম করা গেল না। শয়ন ব্যবস্থায় ঠিক হলো যুবক যাত্রীর মেঝেয় শুয়ে যাবে। (এত যাত্রী নিয়ে ভবিষ্যতেও কোনদিনভ্রমণ করি নি) এখানেই জানিয়ে রাখি যুবক যাত্রীরা যতটা সম্ভব ল্যাভেটরিও ব্যবহারে সংযত ছিল, প্রয়োজনে অন্য কোচ চলে যেত। BEML COACH ছিল মাঝখানের দরজার চলতায় নবেন্দু আর আমি রাত্রে শুতাম।

এবারে প্রত্যেক যাত্রীকে ট্যুর প্রোগ্রাম দিয়েছি সাইক্লোস্টাইল করা। অনেক করিয়ে দিয়েছে দেবুবর্মন দা। কশান মানি জমা দিয়েছি দুজনে গিয়ে। এ্যাটাচমেন্ট ও ডিটাচমেন্টের জন্য টাইপ করা ফর্ম তৈরী করে নিয়েছি। প্রয়োজনমত ষ্টেশন, ট্রেনের নাম তারিখ ইত্যাদি বসিয়ে নিলেই চলবে। (গত বারে এসব না থাকায় অসুবিধা হয়েছিল)। ওয়ার্কশপ থেকে গাড়ি বেরুবার ফলে গাড়িতে টুকিটাকি কাজ চালাবার জন্য নানা যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জম তুলে নিতে হয়-যেমন তার, বালব, সুইচ, স্ক্রু-ডাইভার ছেনি , বাটালি, হাত করাত, স্ক্রু, পেরেক, গজাল, তার (লোহার) জলের কল, পাইপ, বড়ছোট ড্রাম, ইত্যাদি। এসব জিনিস লিষ্ট বানিয়ে সিকিউরিটি অফিসারকে কনফার্ম করিয়ে কাগজ তৈরী করে প্রয়োজনীয় ষ্ট্যাম্প করিয়ে, করিয়ে নিতে হল। প্রায় সমস্ত কাজ করেছি আমি আর নবেন্দু মিলে। অন্যেরা নানাভাবে সাহায্য করেছে। প্রত্যেক সহযাত্রীই নিজ নিজ কাজ করেছে সুচারু রূপে ।তবেই এত বড় কাজ সম্পন্ন হল। যাত্রারম্ভের আগের দিন সন্ধ্যায় কোচ টেনে নিয়ে চলে গেল হাওড়ায়।

বাড়ির কথা কিছু লিখতে হচ্ছে। বাবা মারা যাওয়ার পর মা আর ছোট বোন কাত্যায়নী (কাতু) ছোড়দা কেনারাম জাটী (L535) তাদের 'পাশরুল' অনুযায়ী

ডিপেন্ডড্যান্ট দেখায়। এবারে প্রদীপ সেনগুপ্ত (মনা) তার দিদিকে নিয়ে যাচ্ছে শুনে কাতু ধরে বসে, "আমি যাবো"। ফলে তাকে সঙ্গে নিতে রাজী হয়ে ছোড়দাকে পাশ লিখিয়ে দিতে বলি। সে তা করে দিলেও সঙ্গী হতে নারাজ হয়। মনা আমাদের দুভাইয়ের সহকর্মী বন্ধু। সে ভালো ভলি ও তাস খেলে-কালো দীর্ঘদেহী সবল যুবক । তার দিদিকে আমরাও দিদি বলি-বিশাল চেহারার যুবতী। এইসব জেনে বিদ্যুৎদাও তার বোন ঝর্ণাকে সঙ্গে নিতে রাজী হয়ে যায় এবং একদিন আমাদের বাড়িতে দিদি ও কাতুর সঙ্গে পরিচিত হয় (তখন মনা ও বিদ্যুৎদা দুজনেই ভাড়া বাড়িতে থাকতো।)

হাওড়া এলাকার কিছু মানুষ এবার সঙ্গে যাচ্ছে। তাদের ওপর কাঁচা আনাজ আনার ভার দেওয়া হয়েছে। বড় বাজার থেকে কেনাকাটার ভার রয়েছে প্রশান্ত কুন্ডুর ওপরে (এই কাজ সে ১৯১৯ সালেও করেছে।) এবারে গঙ্গাদা রান্নার কাজে যেতে পারবে না। ফলে কানাই মালিক ক্যারেজ পেন্টার যাচ্ছে সঙ্গে তার সহকারী গোষ্ঠ দাস A-Shop এর কর্মী, বেতন নেবে না বদলে স্ত্রীকে সঙ্গে নিচ্ছে।

এবার ভ্রমণ শুরু। এতক্ষণ ধরে প্রস্তুতি পর্ব নিয়ে লিখলাম। অবশ্য আসল ভ্রমণ শুরু হবে এলাহাবাদ থেকে। যাত্রারম্ভের দিন দুপুর দুটোর মধ্যে হাওড়ায় চলে গেলাম কাগজের ফাইল নিয়ে (T-Shop থেকে বাঁধানো)। ফোল্ডার সংগ্রহ করতে হবে। আগের বারে এই ফোল্ডার না থাকায় দলের জমা দেওয়া ২৫০ টাকা ফেরৎ পাওয়া যায়নি। নস্করদার ও বিষয়টাই জানা ছিলনা। ফোল্ডারে প্রতিটি (যে প্লাটফর্মে কোচ থাকবে) ষ্টেশনের অধিকারিককে দিয়ে সই করাতে হয়। যে ষ্টেশন ফোল্ডার ইসু করে তাকে এসে ফোল্ডার ফিরিয়ে দিয়ে রিসিট করাতে হয়। সেই রিসিট জমা দিয়ে কশানমানি ফেরৎ চাইতে হয়-তবেই তা রেল কতৃপক্ষ ফেরৎ দেয়। অফিস ফোল্ডার দেওয়ার আগে পাশের লিষ্ট চাইল। এই লিষ্টও অনেক করিয়ে এনেছি, প্রতিটি ষ্টেশনের CTC কে একটি করে দিতে হবে (যে যে ষ্টেশনে কোচ থাকবে)। ফোল্ডার তৈরী হতে অনেক সময় নিল। যখন দিল তখন দেখি, সঙ্গে দিয়েছে এক স্পেশাল টিকিট (এ ব্যাপারটা অজানা ছিল-নূতন SYSTEM চালু করেছে রেল।) রাত্রি ঠিক নটায় দিল্লি এক্সপ্রেস II UP এ সুরু হবে ভ্রমণ (এখন এটি শিয়ালদহ থেকে ছাড়ে, নাম হয়েছে লাল কেল্লা এক্সপ্রেস 3011 exp) হাতে অনেক সময় আছে দেখে চা পান করে এলাম বাইরে থেকে। ASM এর ঘরে গিয়ে কোচের প্লেসমেন্ট জেনে এলাম। বাঙালী ভদ্রলোক বললেন, "কাছাকাছি থাকুন। শেষ দিকে তিন নম্বর কোচ"। বেরিয়ে ৯ নং প্লাটফর্মে গিয়ে দেখি ৬টা বাজে। প্রশান্ত কুন্ডু মালপত্র নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে বললো, "কী খবর?" "সর্বাঙ্গ সুন্দর। তুই কী বাড়ি যাবি?" "না, বাড়ি

থেকে ব্যাগ ব্যাগেজ দিয়ে যাবে। আশু আর দেবুদা তাড়াতাড়ি এসে যাবে। বিশ্বনাথরাও কাঁচা আনাজপাতি আনবে।" "এখানেই মাল থাক। ASM বলেছেন শেষ থেকে তিননম্বর"। গতবারে ছিল প্রথম থেকে তিন নম্বর। খুব কষ্ট হয়েছিল। "ওসব মনে রাখি না।" ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনাতে থাকলো। সকলে আস্তে থাকলো। কোলাহল মুখরিত হল ষ্টেশন। কাতুকে তুলে দিতে এসেছে ছোড়দা আর ছোটভাই। মনা দিদির সঙ্গে এসেছে তার ভাই। এক সময় সকলেই এসে গেল। ঝর্ণা এলো বিদ্যুৎদার সঙ্গে। আশুরা এলো সদলবলে। ওরা CCR ট্রেন ধরে বালিঘাটে নেমে এসেছে-কর্ডের ট্রেন পাবে না জেনে।

১৯ দিনের টুর ৯০ জন গ্রোন আপ মানুষ। সবার ব্যাগ ব্যাগেজ, দলীয় সংগৃহীত সামগ্রী তুলে দিতে আশা মানুষ জন ৯ নং প্লাটফর্মের সামনেই বিরাট ভিড় হয়ে গেল। ৮-১৫ নাগাদ ট্রেন প্লেস করে দিল। ব্যস্ততা বাড়লো। যথা সম্ভব ধীর ভাবে সমস্ত জিনিসপত্র তোলা হল। প্রত্যেক কিউবে দশজন করে (বাচ্চা সহ ১১) থাকবে। সম্ভবত: নবেন্দু আর বিদ্যুৎদা থাকার আয়োজন করেছিল। সবায়ের কথা মনে নেই। তবে আমরা যে চলতায় শুতাম-তার দুপাশের কিউবে কারা থাকতো তা বেশ মনে আছে। এটা প্রয়োজন যে ক্যাশ সবসময় সুরক্ষিত থাকা চাই। ১৯ দিনের ট্যুরের জন্য মাত্র ৭৫ টাকা নেওয়া হবে। অর্ধেক করে সবাই জমা করেছে-সেটা রয়েছে বিদ্যুৎদার কাছে। কাঁচা আনাজ সংগ্রহে ও বড় বাজারের মালের হিসাব বুঝে নিল বিদ্যুৎদা। বললাম ,"এসব পরে করো"। কিন্তু রমা, বিশ্বনাথ (কাঁচা বাজার) জানালো-এখনই ভালো।

গাড়ি ছেড়ে দিল। তখনো স্থাননির্বাচন শেষ হয়নি। গাড়িতে পা ফেলার জায়গা নেই। গতবারে হরিদা খুব পরিশ্রম করেছিল রান্নাঘরে। এবারে কেশবদা একা পারছিল না, পরে গোষ্ঠদার সহকর্মী কার্তিক তার সাথে হাত লাগালো। বিদ্যুৎদা গিয়ে চিনি, দুধের প্যাকেট মশলাপাতি ঘি প্রভৃতি নিয়ে নিজের কাছে রাখলো (পরে দেখেছি কাঁচা পিঁয়াজ চুরি হয়)। গাড়ি শ্রীরামপুর, ব্যান্ডেল পরে প্রায় বর্ধমানে পৌঁছাবার সামান্য আগে সুবিন্যস্ত হতে তবে খেতে গেলাম। কাতু তখনো জেগে বসে আছে খাবার নিয়ে। আজ গাড়িতে কাউকে মিল দেওয়া যাবে না তা জানানো ছিল। সবাই খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছে। বিদ্যুৎদাকে বললাম, " এদের শুয়ে পড়তে বলবে তো? ঝর্ণা বললো, "তোমরা খাওনি আমারা খেয়ে নেবো?" "তা তো করতেই হবে পিসি (কাতু) আমরা অন্যদের দিকে ব্যস্ত থাকবো।" দিদি বললো, "ঠিক আছে-জানা রইল-এখন খাওতো"। সকলেই লুচি এনেছে। যাক খাওয়া শেষ হলো তখনও গাড়ি বর্ধমানে দাঁড়িয়ে।

(এটা লিখলাম, জানি পাঠকের ভালো লাগবে না। তবে, আজকাল দলে ভ্রমণে যাবার প্রবণতা বেড়েছে - তাই যাত্রীদের সেজন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে হয়। সবাই তো সবচেয়ে ভালোটা পেতে চায় – সবাই ফার্স্ট হতে চায় - কিন্তু বাস্তবে তা হবার নয়। তাই দলে ভ্রমণ করতে গেলে কিছুটা স্বার্থত্যাগ করতে হয়। যে মিনিমাইস করতে চায় না - তার কাছে সবটাই ব্যর্থ হয়।)

রাত ১২টা বেজে যাওয়ার সঙ্গে এই বক্তব্যের কথঞ্চিত মিল আছে। আমাদের পাশের কিউবিলে নবেন্দু স্থান দিয়েছিল সুশান্ত শীল ও জগন্নাথ মুখার্জীকে। তারা দুজনেই সপরিবারে এসেছে। ঘটনাটা বলার আগে দুজনের পরিচয় দিয়ে রাখি। শীলদা ভারতবিখ্যাত ভারোত্তলক - চাকরী পেয়েছে রেলে সেই সূত্রে, কিন্তু এ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন না থাকায় শ্রমিক পদবাচ্যই থেকে গেছে। তার স্ত্রী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষিকা, ব্রাহ্মণ কন্যা ছিলেন। প্রায় সবাই জানে বিবাহটি প্রণয়জাত, তাদের এক শীর্ণকায় পুত্রসন্তান, ডাক নাম কেঁচো, ভাল নাম বিপ্রতীপ। জগুদা একাধারে কোলকাতার মাঠে ফার্স্ট ডিভিশনে ফুটবল, হকি খেলেন, টেনিস খেলাতেও দক্ষ, ম্যাট্রিক পাশ, পাওয়ার হাউসের মিস্ত্রি। ইনিও শীলদার মত জনপ্রিয় মানুষ! বৌদি হাউস ওয়াইফ (বাড়ির বৌ), চন্দননগরের জগদ্ধাত্রীর মতই রূপসী হলেও পুথুলা। দুই পুত্রসন্তানের জননী। দুটি পুত্রই সুদেহী, সুরূপ, পঠন পাঠনে আগ্রহী, ডাক নাম রাজা ও রাণা (ভাল নাম জানিনা) – সাতজনই সুদেহী। সাইড সীটে অখিল গোস্বামী তার পত্নী এবং চার বছরের শিশু দেবাশীষ। (এই অখিল পরে চরৈবেতীর ভ্রমণ সম্পাদক হয়)। সবাই সুদেহী হওয়ায় নয়া ব্যবস্থায় রীতিমত অসুবিধা দেখা দেয় ফলে গৃহিণীদের মধ্যে কথা কাটাকাটি উত্তপ্ত পর্য্যায়ে চলে যায়। পরে নবেন্দুর আবেদনে দুই কর্তাই মেঝেতে শুতে রাজি হতে সমস্যার সমাধান হয়।

অন্যপাশে আরো ভীড় বিদ্যুৎদা, ঝর্ণা, দিদি, মনা, সুশীল

মিত্র, (মনার বন্ধু তার সদ্য বিবাহিত মাত্র ২০ দিন আগে বিয়ে হয়েছে) তার বৌ ছায়া, কাতু এবং কালিদার (প্রথম ভ্রমণ) চারজন। কিন্তু পূর্বাহ্নে জ্ঞাত থাকায় কোন সমস্যা হয়নি। কালীদা, মনা ও বিদ্যুৎদা নীচে শুত। (পরে শুভেন্দু মুখার্জীও শুতো)। এই টুকু জায়গায় ২৩জন লোক থাকায় অন্যদিকটা অতটা ঠাসা ছিল না। দিনের বেলায় সবাই বিছানা গুছিয়ে দিলে বিশেষ সমস্যা হত না (পরে কখনো ৭২ জনের বেশি লোক নিইনি গাড়িতে – কাশ্মীর, নেপাল, কেদার বদ্রী, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রি, নৈনিতাল, রাণীক্ষেত যাবার সময় ৮৪ জন করে গেছি দুটো বাসে – কিন্তু বাকী ১২জনকে অন্য কোচে রিজার্ভেশন করিয়ে নিয়ে গেছি)। ভ্রমণ শুরু হবে এলাহাবাদ থেকে। আজ দুপুরে সেখানে পৌঁচেছি। সকলেই বেশ প্রস্তুত ছিল। অনেকেই সকাল থেকে কিছু খায়নি। আমি এসব মানি না। বিদ্যুৎদার দেওয়া দুবার চা, বিস্কুট খেয়েছি। ঠিক করে রেখেছি পরে যাব। স্নান করে খেয়ে নিয়ে।

তার আগে মোগলসরাইয়ে চেকিং হয়েছিল। স্পেশ্যাল টিকিট দেখে, ট্যুর লিষ্ট আর পাশ লিষ্ট নিয়ে এতজন এক কোচে আছি দেখে হেসে চলে গেলেন। এলাহাবাদে কোচ কাটতেই সুভাষ মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে কাগজপত্র নিয়ে দেখা করেছি। গাড়ি রেখেছে প্রিলগ্রীম প্ল্যাটফর্মে। সবাই চলে যেতে দেখি কানাইদা (রাধুনি), গোষ্ঠদা, সুভাষ, মিহির আর আমি রয়ে গেছি। মনাকে প্রশ্ন করতে সে জানালো, নবেন্দু তোর জন্য থেকে যেতে বললো শুনে হাসলাম। কানাইদার করা সামান্য টিফিন খেয়ে স্নান সেরে নিলাম সকলে এক এক করে।

নবেন্দুরা ফিরলো সবচেয়ে আগে। বললো, "কজন গেছে সঙ্গমে স্নান করতে - কজন এখনো খসরু বাগে রয়েছে।" বললাম, "পরে কথা হবে"। চলে গেলাম চারজনে একটা টাঙ্গায়। মিহির বললো, "জাটীদা, এখানে কুম্ভমেলা হয় শুনেছি – আগে কখনো এসেছেন?" "না, প্রয়াগ মানে হল নদী সঙ্গম।

এটি গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল। এটির রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থান প্রাচীনকাল থেকেই অপরিসীম। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য এখানে একটি দুর্গ নির্মান করেন। বুঝতেই পারছ। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভেই এখানে দুর্গ ছিল – ৩২৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দে আলেকজান্ডার ভারতে আসেন। ভারতের প্রথম ইতিহাস রচিত হয় মেগাস্থিনিসের হাতে।" "উরিবাব্বা, অত কিছু জানতে চাই না।" "ভ্রমণকে হবি করতে হলে এসব তো জানতেই হবে – এখানে অশোকের শিলালিপি আছে, আর চন্দ্রগুপ্ত হচ্ছেন অশোকের ঠাকুর্দা। পরবর্তীকালে আকবর সেই জায়গায় দুর্গ নির্মান করে।' "কিন্তু এটাতো আমরা দেখবো না, তখন টাঙ্গাওয়ালাকে বললে" বললো সুভাষ। হ্যাঁ তা বলেছি ঠিকই – তবুও কুম্ভমেলার প্রসঙ্গ উঠল বলেই বললাম। কুম্ভমেলা সম্ভবতঃ হর্ষবর্ধন চালু করে। সেই হিসাবে কুম্ভ মেলা অনেক নবীন। এলাহাবাদ বিখ্যাত ছিল তার ছাত্রাবাসের জন্য। ভরদ্বাজ মুনির ছাত্রাবাস। তোমরা সবাই নালন্দার কথা জানো কিন্তু ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল আরো প্রাচীন। সম্ভবতঃ পর্ণকুটীর ছিল। তাই তার চিহ্ন মাত্র নেই। শুধু পড়ে আছে ভরদ্বাজের স্মৃতি এবং সামান্য ভগ্নপ্রায় এক মন্দির। সেটাই প্রথমে দেখবো। মনে রেখো মিহির, পরবর্তী মোঘল যুগে, ব্রিটিশ যুগে এবং বর্তমান স্বাধীন ভারতেও ভরদ্বাজ প্রতিষ্ঠিত এলাকাতেই গড়ে উঠেছে বিশ্ব বিদ্যালয় অন্য নামে, নাম তার সফদরজঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয়। ভরদ্বাজ মন্দিরের সামনে টাঙ্গা দাঁড়ালো – সকলেই নামলাম। প্রায় ভগ্নস্তুপ হলেও এখনও এখানে প্রতিষ্ঠিত শিবপূজা হয়। অথচ আমি পড়েছি ভরদ্বাজ ছিলেন ব্রহ্মের পূজারী। দীর্ঘ কয়েক হাজার বছরের ঝড় গেছে ফলে – নানান পরিবর্তন হয়েছে। মুঘল আমলে জাহাঙ্গীর দুর্গ ছেড়ে, এদিকে সরে এসে একটি ছোট প্রাসাদ ও বাগিচা বানান। নাম হয় খসরুবাগ। স্থানের নাম দেন ইলাহবাদ – সেটাই ইংরেজদের উচ্চারণে এলাহাবাদ হয়ে যায়। এবং এখনো সেই নাম চলছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন শ্রেণীতে হিন্দু ও মুসলমান রীতি বর্তমান। আধুনিক কালে নির্মিত সৌধগুলিতে কিছু কিছু ইউরোপীয় স্থাপত্য স্বাক্ষর আছে। টাঙ্গা না দাঁড়িয়ে ধীর কদমে চলে, চলে এল সামনে। এটি মতিলাল নেহেরুর বাড়ি। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু সম্ভবতঃ এখানেই জন্মেছেন? এটি বর্তমানে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, সাধারণের দর্শনীয় - ক্ষুদ্র একটি যাদুঘরে নেহেরু পরিবারের ব্যবহৃত কিছু দ্রব্য রাখা আছে। আমার আগ্রহ না থাকায় ঢুকিনি। ওরা ঘুরে এল দ্রুত (পরে এখানে বালভবন হয় তারও পরে হয় তারাঘর) — হাইকোর্ট সৌধটিও দেখা হল চলন্ত টাঙ্গা থেকে। এই ন্যায়ালয়টির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লক্ষ্নৌ হলেও উত্তরপ্রদেশের উচ্চতম ন্যায়ালয় এটিই। এই সৌধে হিন্দু, মুসলিম এবং ইউরোপীয় স্থাপত্য রীতির এক মনোরম মিশ্রণ ঘটেছে। মিহির বললো ঢুকলে পারতেন — খুব সুন্দর গোলাপ বাগিচা আছে। হাসলাম ভাবলাম বড়লোকের বাড়ি, ফুল বাগান তো থাকবেই। আমাদের রাজবাড়ি কি কমতি ছিল?

টাঙ্গাওয়ালা গঙ্গার তীরে এসে দাঁড়ালো। সে জানালো। গঙ্গার প্রায় মাঝামাঝি জায়গায়, সেখানে অনেকগুলো কালো ড্রাম ভাসছে, কয়েকটা নৌকা রয়েছে — সেখানেই সঙ্গম — সেখানেই হিন্দুরা এখান থেকে নৌকা নিয়ে যায়। যেতে, পুজো দিতে, ফিরতে প্রায় তিন ঘন্টা লাগে। (এখানে যাইনি - যদিও বার দশেক এলাহাবাদে কোচ রেখেছি পরে। অবশ্য দুর্গ, শিলালিপি এবং খসরুবাগ দেখেছি।) ফিরতে প্রায় সন্ধ্যে হলো। গাড়িতে কিছু লোক থাকলেও নবেন্দুরা নেই। জানা গেল - তারা খসরুবাগে গেছে। সামান্য পরই ফিরলো - চার আনা কিলো পেয়ারা এনেছে বড় বড়। কাতু খেতে বললেও খাইনি। (পরের দিন দুপুরে আগ্রার পথে খেয়েছি - ফল সন্ধ্যার পর না খাওয়াই উচিত।)

পিলগ্রিম প্ল্যাটফর্ম ভর্ত্তি। মহারাষ্ট্র, ওড়িশা থেকে কোচ

এসেছে। বাঙালীদেরও কোচ এসেছে ব্যানার্জী ট্রাভেলস। এদের বিশেষ পরিচিতি নেই, যতটা কুন্ডুর স্পেশালের খ্যাতি আছে। সবাই প্ল্যাটফর্মে রান্না করছে। ধোঁয়ায় ভর্তি, তবে মশা নেই। আগ বাড়িয়ে কারোর সাথে আলাপ করিনি। চা পান করতে করতে বাচ্ছাদের (দেবাশীষ ছাড়া ছোট কেউ নেই – সবাই বড়ই, কিন্তু আমার তুলনায় বাচ্ছা) সঙ্গে কথা বলছি। এমন সময় এক মারাঠী ভদ্রলোক বললেন, পারডন স্যার, ইংরাজীতো ভালো জানিনা, তবু বললাম উঠে দাঁড়ালাম হাত জোড় করে। বললেন সর্ষের তেল কোন দোকানে পাওয়া যায়? তাই তো জানি না। ফলে কুন্ডুকে ডাকলাম, তাকে সঙ্গ দিতে বললাম। কিনে ফেরার সময় অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে গেলেন। কুন্ডু বললো, উনিও রেলে চাকরী করেন। আজ কিছুক্ষণ আগে এসেছেন। কি কি দেখার আছে জানতে চাইছিলেন। মারাঠী হিন্দি বুঝতে কষ্ট হলেও বুঝেছি, বলেছি আমরা যা যা দেখেছি তাদের নাম। বাঃ সুন্দর !

নবেন্দু বললো রাতে – জানিস, উড়েদের কাছ থেকে মাথাপিছু ১০০ টাকা নিয়েছে টিকিট ছাড়া। ওদের মাত্র ১৫ দিনের ট্যুর। লক্ষ্ণৌ, গয়া দেখাবে না। হেসে বললাম – ওরা ব্যবসাদার তাই বেশি তো নেবেই।

পরদিন সকালেও কজন গঙ্গাস্নানে গেল। আজ দুপুরের প্যাসেঞ্জারে কোচ চলে যাবে আগ্রায়। খেয়ে বাসন মেজে রেডি হলাম তার আগেই। গল্প শোনার লোক এবার বেশি, কিন্তু জায়গা কম। আছি তো মেঝেয় বিছানায়। বাচ্ছুবুড়ু আগের বারে দেখেছে, মিশেছে – তাদের বাবা আমায় খুব পন্ডিত ভাবে – ফলে তারাও বেশ সমীহ করে। এবারে দেখা গেল লালটু, বুলটু (রাজা রাণা) জগুদার ছেলেরা এবং শীলদার ছেলে শীর্ণকায় বিপ্রতীপ (কেঁচো) এরাও গল্পে আগ্রহী। কেঁচোর মা শিক্ষিকা বলে নাকি কে জানে বেশ বুদ্ধিদীপ্ত, চালাক চতুর, হাসি খুশি। সবাই মেঝের বিছানাতেই বসেছে – সবাই তাদের পিতৃদেবকে

মেঝেতে শুতে দেখছে – তাছাড়া ঘরের মেঝের মত সত্যই সততঃ পরিস্কার। প্রত্যেক কিউবেই দুটি করে ঝাড়ন ব্রাশ আছে। আর সবাই শ্রমিক ঘরাণার, কর্মবিমুখ নয় কেউই।

বসে বসে ভ্রমণ সম্পর্কে কথাবার্তা বলছি বাচ্চু বুড়ুর সাথে। বাচ্চু জানতে চাইছিল। 'বাবা বলছে, তুমি নাকি বলেছ সুভাষ কাকুকে যে এলাহাবাদে ভরদ্বাজ ঋষির ছাত্রাবাস ছিল। তা নালন্দার চাইতে পুরাতন। তাহলে ইতিহাসে তা কেন লেখেনা?" প্রশ্নে অবাক হলাম। গতবারে দেখেছি বুড়ুই বেশি কথা বলে। বাচ্চু বেশ লাজুক। বেশ বোঝা যাচ্ছে, বাচ্চুরা বড় হচ্ছে।

বললাম, "তোমরা সবাই এখনও ছাত্র। ইংরাজীতে ষ্টুডেন্টের কোন লিঙ্গান্তর হয়না। সংস্কৃত শব্দে বা সংস্কৃত জাত শব্দমালায় কিন্তু ছাত্রের লিঙ্গান্তর হয় – তবে আমি এটার লিঙ্গ ান্তর মানি না। বাচ্চু যে প্রশ্নটা করেছে তার উত্তরটা বেশ কঠিন। তবে সহজ কথায় বলতে গেলে বলতে হয়। ইতিহাস প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া কিছুকে প্রামাণ্য মনে করে না। নালন্দায় ধ্বংসাবশেষ আছে প্রমাণ হিসাবে। ভরদ্বাজ ঋষির ছাত্রাবাসের চিহ্নমাত্র পাওয়া যায়নি। তাই ইতিহাস এই বিষয়ে নীরব। তবে আপনি কেন বলেছেন? প্রশ্ন এল বিপ্রতীপের কথায়। এ সভায় বয়ঃক্রমে সেইই সর্বকনিষ্ঠ - কিন্তু সে বাচ্চু ও বুড়ুর চাইতে লম্বা। হ্যাঁ, এটা ভালো প্রশ্ন। কিন্তু তোমরা জানো, জ্ঞান মূলতঃ পর নির্ভর। আমি একটা বইয়ে পড়েছি। লালটু বা রাজা বললো। কিন্তু বইয়ে তো ভুল লিখতে পারে? মানে, আমাদের অংকের বইয়ের উত্তরমালায় একটা উত্তর ভুল ছাপা আছে – স্যার তা অংক কষেই প্রমাণ করে দিয়েছেন। লালটু বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্র। দশম শ্রেণীতে পড়ে – চন্দননগরের ভালো ছাত্র। বললাম, হ্যাঁ, ভুল লেখা হতে পারে। যে যার জ্ঞানমত লেখেন, প্রকাশকও ছেপে দিতে পারেন – কিন্তু পাঠকদের তা মেনে নেবার স্বাধীনতা থাকবে – সে নাও মানতে পারে। মানা না মানার জন্যে তার

যুক্তি থাকবে। ভরদ্বাজের ব্যাপারে আমার যুক্তি আছে। সেটাই শুনতে চাচ্ছি বললো কেঁচো। সবাই হেসে উঠলো। বুড়ু বললো, কাকা বুঝিয়ে বলছে তো ! বুলটু গোলগাল, অনেকটা তার মায়ের আদল পেয়েছে, সে বললো, বুঝিয়ে না বললে চলবে না - কেঁচো কেঁচোর মত থাক। আমার নাম বিপ্রতীপ – কেঁচো বলবি না বলছি - ভাবিস না রোগা বলে গায়ে জোর কম। লালটু বললো, দুজনেই উঠে যা– গল্প শুনবে না ঝগড়া করছে – দেখুন কাকু। বললাম, ছোটরা দুষ্টুমি করবেই। চুপ করে শোনো। ভাল না লাগলে চলে যাও। শুনতেই তো চাইছি, বুড়ু বললো, বলো না কাকা। শোন বুদ্ধদেব জন্মেছিলেন খৃষ্টপূর্ব ৬০০ - ৭০০ এর মধ্যে। মহাবীর মানে জৈনধর্মের প্রবর্তকও তাঁর কাছাকাছি সময়ে সময়ে জন্মেছেন। অনেকে আবার তাঁকে বুদ্ধদেবের চেয়ে বয়স্ক বলেছেন। তাঁদের দুজনের বহু বহু পূর্বেই হিন্দু ব্রহ্মণ্য ধর্মের জন্ম হয়েছিল। যারা ভারতের ইতিহাস সামান্যও পড়েছ, তারা জানো যে, হিন্দু শব্দটা এসেছে সিন্ধু নদ থেকে। কিন্তু ভারতীয় হিন্দুরা ধীরে ধীরে সিন্ধু নদকে ছেড়ে প্রথমে তার উপনদীদের পরে যমুনানদীর অববাহিকার নেমে আসতে থাকে নানান কারণে, বিশেষতঃ কৃষিক্ষেত্র বা খাদ্যসন্ধানে। যমুনা ধরে চলতে চলতে এসে যায় গঙ্গার সঙ্গমে। সেই সঙ্গমস্থানই ভরদ্বাজ ক্ষেত্রম যা বর্তমানের এলাহাবাদ বা প্রয়াগ। তোমরা জানো বৌদ্ধধর্মের প্রসার হয়েছিল অশোকের সময় - প্রায় ২০০ - ৩০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে - বুদ্ধদেব হচ্ছেন বর্তমান নেপালের অধিবাসী। মহাবীরও জন্মেছেন বিহারে। ফলেই সভ্যতার (আর্য) বিকাশ হয়েছে পরবর্তীকালে। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতেই পারে ভরদ্বাজের ক্ষেত্রমই পুরাতন। চিহ্ন নেই, তার কারণ হল, নালন্দার মত পাকা কোষ্ঠ নির্মাণ ক্ষমতার তখনও ছিল না। সম্ভবতঃ সমস্ত ছাত্রাবাস ছিল পর্ণকুটিরের সমান্তরাল। আমি যা পড়েছি বা বুঝেছি তোমাদের তা বলে দিলাম। প্রশ্ন যদি জাগে, করো - যা জানি। যতটুকুই জানি -

বলে দেব।

যমুনা ব্রীজ এসে গেল। এই নদীর দুপাড় দিয়েই দিল্লী যাওয়া যায়। কম সময়ে পৌঁছাতে চাইলে নদীর পূর্বতীর ধরে চলতে হয়। আমরা পশ্চিমতীরে যাবো ব্রিজ পেরিয়ে। টুন্ডুলা বড় জংশন, সেখান থেকেই রেলপথ পৃথক হয়ে গেছে।

আগ্রা পৌঁছাতেই সেন্ট্রাল চেকিং স্টাফ কোচে উঠে পড়লো – প্রায় ১২ জন চেকার ও আটজন RPF। সব কাগজপত্র, প্রায় প্রত্যেকের পাশ লিষ্টে মিলিয়ে দেখলো। রান্না করছি দেখে প্রশ্ন করে স্বচক্ষে নিরোধক ব্যবস্থা দেখে খুশি হয়ে Checked and Verified বলে Special Ticket & Folder -এ লিখে Stamp করে দিলেন। বললেন, যব কোই পয়সা মাঙ্গেগা, উসকো এ দেখাইয়ে। পুরো টিম এককাপ চাও খেলেন না। (পরে অন্য এক টি. টি. সি. অবশ্য পেঠা খেতে চেয়েছিল)।

ঝামেলা কাটতে, কোচ প্লেসিং করতেই বিকাল ঘনিয়ে এল। আজ দর্শন হবে না জানি। কিন্তু বাজার যেতে হবে - নবেন্দুর ইচ্ছা মাংস হবে রাতে। তুফান এক্সপ্রেস এসে গেল। ব্যানার্জী স্পেশালের কোচ রাখলো আমাদের পাশেই। দুটো কোচকেই রেখেছে একটা সাইডিং লাইনে। কাছাকাছি ওয়াটার বেসিন আছে – তাতে জল খুবই কম। দুটো দলের পক্ষে সেই জল খুবই অকুলান। ফলে ঝগড়া না করে কানাইদা ও বিদ্যুৎদা গাড়ির অন্যদিকে একটা কোয়ার্টার সাপ্লাই লাইন কলে চলে গেছে। কোয়ার্টারের লোককে বলে কলতলাটাই দখল নিল (এঘটনা পরে জেনেছি—পরে এ প্রসঙ্গে আবার কথা উঠবে)।

বাইরের বেঞ্চে বসে আছি - নানা কথা বলছি তখন নবেন্দু এসে বললো, চেকাররা বাজারে যেতে বারণ করছে - এখানে নাকি গন্ডগোল চলছে। ফোনে গুপ্ত ট্রাভেলসকে ডেকে পাঠালেন টিসি। অগত্যা যেতে হল ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে। সব শুনে বললেন, তব তাগড়া আদমী পাঠাইয়ে। বাসের কথায় বললেন, 'গুপ্তা ট্রাভেলস্, আচ্ছা হ্যায়। বাৎচিৎ পাকা আপই

কিজিয়ে - হ্যম উসকো কোচমে ভেজ দেগা।' আশু, কুম্ভু, শচীন, দেবুদা বাজার চলে গেল আটজন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর গুপ্তা ট্রাভেলস্ এর দুজন লোক এল। তারা ৪৪ সীটের দুটি বাস দেবে - বাস পিছু ২২৫্ টাকা পড়বে। শেষ পর্যন্ত বিদ্যুৎদার দরাদরি করে ২০০্ টাকায় নামালো। প্রশ্ন করে জানা গেল, গণেশদার কাকারা যাবে না। যাক্‌গে গাড়ি ফাঁকা থাকবে না জেনে ভালই লাগলো। গণেশদার কাকারাই শেষ সময়ে বর্মণদাকে ধরে দলে ঢুকেছেন আটজন। না হলে এতজনকে মেঝেয় শুতে হতনা। ভ্রমণের প্রোগ্রাম হয়ে যেতে দলের কিছুজন প্লাটফর্মে ঘুরতে গেল। জানা ছিলই - আগ্রা ফোর্ট ষ্টেশন থেকে মিটার গেজ লাইন চলে গেছে রাজস্থানের দিকে। মথুরা থেকে আমেদাবাদ যাবার রাস্তা বেরিয়ে গেছে ব্রড গেজে। পর পর অনেকগুলো ষ্টেশন থেকেই তাজমহল দেখা যায়। তাজমহল বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম। তখনো দেখেনি অনেকে। আমি একবার মাত্র দেখেছি - কিশোর বয়সে তার তাৎপর্য বুঝিনি। এখন অনেক পরিণত মন নিয়ে ভ্রমণে বের হয়েছি। পড়েছি অনেক কিছু তবু সবজান্তা ভাবিনা নিজেকে। সেবারে এসেছিলাম - শুধু মনে আছে সামান্যভাবে তাজমহলকে আর আগ্রা ফোর্টকে। এবারে সব নূতন করে দেখবো। সেবারে তাজের একটা ফটো তুলেছিলাম, ছোড়দার ২৯ টাকা দামের ক্যামেরায়। সেটা কী করে এত ভালো হয়ে গেসলো জানি না। উত্তরপাড়া গৌরী টকিজ ছিল তখন খুব চালু তার কাছে ছিল কালিদার রূপশ্রী স্টুডিও - তার এক্সজিবিট কার্ডে কালিদা সেই ফটোটা রেখে দিয়েছিল। বন্ধুদের বললে সে কথা বিশ্বাস করতো না - তখন সেই ফটোর কপিটা অচিন্ত্যের কাছে চেয়ে দেখাতাম। আমার কাছে তখন পয়সা ছিল না। তাই অচিন্ত্যই ফটোগুলো ডেভেলপ করিয়ে নিজের কাছে রেখে দেয়। ছোড়দার ক্যামেরা হলেও ফিল্মটা সেই কিনেছিল। নানা স্মৃতি এসে মাথায় ভিড় করছিল। সেই সময় বাজার নিয়ে ফিরলো আশুরা।

সময় মত খাওয়াও হয়ে গেল। সব গুছিয়ে গল্পে বসেছি তখন চিৎকার শুনে গেলাম দৌড়ে। কলতলায় ঝগড়া। এটা কোয়ার্টার্রি সংলগ্ন তা আগেই লিখেছি। সেখানে ব্যানার্জী স্পেশালের একটা লোককে বিদ্যুৎদা আর কেশবদা মেরেছে। ব্যানার্জী স্পেশ্যালের ম্যানেজার ও কয়েকজন এসে গেছেন। দুদলের অনেকেই কথা বলছে। কোয়ার্টারের কর্তা গিন্নী আমাদের ফরে, ফলে আর.পি.এফ. অফিসার ব্যানার্জী স্পেশালের ম্যানেজারকে ওই কল ব্যবহার করতে বারণ করলেন। ঝামেলা মিটে যেতেও মাথা ফাটা লোকটা বললো শালারা মাংস খাইয়েছে তাই দোষটা চড়ে গেল আমাদের ঘাড়ে। আমার যে শালা মাথা ফাটলো তার দাম নেই। কেশবদা বললো পুতে ফেলতাম শালা হারামী. কলতলা তোরাই নোংরা করেছিস। যাক্, ঝামেলা কমলো। শুয়ে পড়ে নবেন্দু বললো, যাই বলো বাংলার বাইরে বাঙালীরা পরস্পর মারামারি করা ঠিক হয়নি। ওরা কেন ওখানে গেল। যাই করুক! তাহলে বিদ্যুৎ এমন মারলো যে ওর মাথা ফেটে গেল? জানিস রক্তপাত একটা ক্রিমিনাল অফেন্স। গিয়ে দেখি বিদ্যুৎদা ব্যান্ডেজ বাঁধছে - ও মেরেছে তা তো জানি না, ভেবেছি কেশবদা মেরেছে। নবেন্দু হেসে বললো – কেশবদা তো শুধু ধাক্কা দিয়েছে (পরে ওরা আর কিছু করেনি)।

বাস প্রথমেই নিয়ে এল ফতেপুর সিক্রিতে। আকবর দিল্লী থেকে এখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তখন এখানকার নাম হয়ে যায় আকবরাবাদ। আগ্রা পৃথিবী বিখ্যাত তার স্থাপত্য নিয়ে। ফতেপুর সেই খ্যাতিতে অনেক যোগান দিয়েছে। একঘন্টা সময় লেগে গেল। ড্রাইভার বললো, বাইশ মিল দুর হ্যায়। হবে (পরে পড়েছি ৩৬ কিমি)। নামলাম বিশ্বের সবচেয়ে বড় দরজা বুলন্দের সামনে। চার পাঁচজন গাইড ছিল দরজার সামনে। একজন কি যেন যন্ত্রে মুসলমানী সঙ্গীত গাইছে। বৃত্তিতে ভিক্ষাজীবি হলেও গুণীমানুষ। সঙ্গীতের ধ্বনিতে সবাই পুলকিত। নবেন্দু গাইড ঠিক করলো। তাকে প্রশ্ন করে জানা গেল, যন্ত্রটার

নাম রাবাব। গাইছে হাদিশের এক শের। হাদিস কি জানি না, সের বা শায়রী অবশ্য জানি। গাইড বললো হাদিশ হচ্ছে কোরাণের পরিপূরক - যেমন হিন্দুদের বেদের পরিপূরক হলো উপনিষদ।

গাইড বললো, এই দরবাজা বিশ্বের উচ্চতম। এটির স্থাপত্য রীতি অপরূপ - দূর থেকে দেখলে মনে হবে ভয়ংকর - ভেতর থেকে দেখলে মনে হবে, সুন্দর শোভন। এরপর ভিতরে ঢুকে দেখালো, দরজায় মাথায় গায়ে ঝুলে আছে কতগুলো মৌচাক। বললো, বাগিচার ফুল থেকে এরা মধু আনে। জানালো — গুজরাত জয়ের স্মারক এটি। সেলিম চিস্তি নামে এক দরবেশের সাধনাস্থল ছিল এখানে। এই সাধুর দেওয়া ঔষধ সেবন করে সন্তানহীন আকবর সন্তানলাভ করে - মানসিংহ ভগ্নী যোধাবাঈ সন্তানের জন্ম দেয়। ভূমিষ্ট হয় জাহাঙ্গীর। ডাক নাম হয় সেলিম। এখানে পূর্ণ শ্বেতপাথরের কবর আছে সেলিম চিস্তির। সেটি দেখি ফটোও তুলি। এরপর একে একে দেখি নান মহল - না, আগে দেখি দেওয়ানি খাস, দেওয়ানি আম, বীরবলের সঙ্গীত সভা পরে দেখি নানা মহল - সব নাম মনে পড়েছে না, তবে যোধাবাঈ মহল, সুনহাবা মহল, খাস মহল, পাঁচ মহল। পরে দেখায় তুর্কী সুলতানা কোঠী, বীরবলের কোঠী। দ্বিতলের অলিন্দের একটা ফটো নিয়েছিলাম। প্রাসাদকেন্দ্রিক অনেক গল্প বলেছিল গাইড, তাতে নানা বেগমের কেচ্ছা ছিল। রাজ অন্তপুরের নানা আলোচনা ছিল। সে সবে কান দিইনি। তবে বুঝেছিলাম, অনেক ঐতিহাসিক উপন্যাসে এর স্বীকৃতি আছে। (ইতিহাস স্বীকৃত তথ্য হলো আকবর হুমায়ুন টুম্বের জন্য অর্থপ্রদান করেনি। গাইড বলেছিল আকবর নিজের মায়ের চাইতে ধাত্রীমাকে বেশি বিশ্বাস করত। মাকে এ দুর্গে আগ্রা দুর্গেও আনেনি। আগ্রা দুর্গেই ধাত্রী মায়ের ছেলেকে আকবর মেরে ফেলে রূপমতীকে ধর্ষনের শাস্তি দেয়। পরে ঐতিহাসিক সমর্থন পাই।) ফতেপুর সিক্রিতে আকবর বেশি দিন ছিলেন না। জলের অভাব দেখা

দেয়ায়। চিস্তির আস্তানা হিসাবে সিক্রি চলে যেত। ছোট্ট একটা হ্রদ ছিল – ফতেপুরের দুর্গ বলতে কয়েক হাজার মানুষকে জলের যোগান দেওয়া সেই হ্রদের ক্ষমতা ছিল না -- তাই আকবর সেই ছোট্ট হ্রদকে কৃত্রিম হ্রদ করে বর্ধিত করে, তবু দুর্গে প্রায়ই জলাভাব দেখা যেত। তাই দ্বিতীয় বছর থেকেই আকবর যমুনা তীরে গড়ে তুলতে থাকে আগ্রা দুর্গ এবং পনেরো বছর পরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় সিক্রি থেকে আগ্রায়। তখন আকবরের প্রিয় হাতী মারা যেতে তারও সমাধি দেওয়া হয় এবং তার সমাধি গড়ে ওঠে। (এর স্বীকৃতি পড়েছি কিন্তু কখনও দেখিনি।)

গাইডকে এবং রাবাব বাজানোর গায়ককে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। দুটি বালককে দেখেছিলাম, দুর্গ প্রাচীর থেকে একটি কুয়োয় ঝাঁপ দিতে। বিদায় বেলায় দেখি তখনও তারা ঝাঁপ খাচ্ছে। ওই মৃত্যুভয়হীন ঝাঁপ দেখিয়ে তারা পরিবারের গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা করে। পরে আর কখনো ফতেপুর সিক্রি, সেকেন্দ্রাবাদ, রামবাগ, দয়ালবাগ আসিনি - যদিও বেশ কয়েকবার আগ্রায় কোচ রেখেছি। স্টার্ট করার আগেই সিদ্ধান্ত হল, সেকেন্দ্রায় খাওয়া হবে। বাস ড্রাইভার জানালো সেখানেই ভালো জল পাওয়া যাবে। সেকেন্দ্রাবাদেরএই স্থাপত্যটিও আকবর নির্মিত। ছিমছাম বাগিচার মধ্যে সুন্দর একটি স্থাপত্য শৈলীর নির্দশন হয়ে দন্ডায়মান। এর সিঁড়ির বিশেষত্ব মনে রাখার মতই। সারাক্ষণ মনে হচ্ছিল এই বুঝি মাথা ঠুকে যাবে (আমার মত বেঁটেও) অথচ সাত ফুট লম্বা মানুষেরও মাথা ঠুকে যায়নি। সিঁড়ির রেলিং খাঁজ কাটা। মন নিবদ্ধ ছিল খাদ্য ব্যবস্থায় - তাই এখানে মন দিতে পারিনি। সামনেই বড় বাজার। কাছেই সম্ভবতঃ জেলখানা। বেশ ভিড় আছে - অন্যদিক ফতেপুর সিক্রির কাছে পিঠে কিছুই নেই। জেল খানার কয়েদিদের দিয়ে বানানো শ্বেতপাথরের নানা বস্তু বিক্রি হচ্ছে। ছোট বড় আকারের তাজমহলও আছে (পরে দেখেছি তাজের গেটেও বিক্রয়কেন্দ্র হয়েছে)।

খাওয়া সেরেই বাস চেপে চলে এলাম রামবাগে। এটি অযত্নে বর্ণহীন। শুধু বাগিচা দেখতে পর্যটকরা নারাজ। কন্ডাকটর জানালো - এটি বাবরের হাতে তৈরী ভারতের প্রথম মুঘল বাগিচা - তবে এখন স্থানীয় মানুষজন ছাড়া কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামান না। তারপর এক দৌড়ে চলে এল দয়ালবাগ – এখানে স্বামী বাগ মন্দির নির্মীয়মান। অর্ধক্ষোদিত অপরূপ ভাস্কর্য্যে পরিপূর্ণ এর দেওয়াল। প্রথমেই মুগ্ধতা এনে দিয়েছিল। তবে পরে আর ভালো লাগেনি। জানিনা, সবাই উচ্চ প্রশংসা করলেও আমার মনে হয়েছে অতি বাস্তবতা এবং অতি অলংকরণ দুষ্ট।

বাস এবার আমাদের নিয়ে এল – ইতমদ্উদ্দৌলায়। এটি সম্ভবতঃ মুঘলরীতিতে প্রথম শ্বেতমর্মর প্রাসাদ। এটি মনে হয়, হিন্দু বা পুরাতনী মুসলিম রীতি নেই - সম্পূর্ণ অন্যরীতিতে গঠিত (পরে পড়েছি - পুরা পারসিয়ান মডেল)– অত্যন্ত স্নিগ্ধ কোমল এর বহিরাঙ্গিক রূপ। প্রচুর মীনার কাজ আছে। সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে তাজমহলও এর কাছে পরাজিত হবে। এখানের একটি বর্হিদেওয়ালেই ভারতে প্রথম এ্যান্টিডাইমেনশনাল অক্ষর ব্যবহৃত হয়। কোরান শরীফের কয়েকটি সুক্ত লিপিবদ্ধ হয়। অনেক পরে এই রীতি তাজমহল গঠনে গৃহীত হয়। (আগ্রায় এসে প্রত্যেকবারই তাজও ইতমদউদৌলা দেখেছি। এমনকি ষ্টেশন থেকে পায়দলে)। এরপর এলাম আগ্রা দুর্গের সামনে। বিশাল দুর্ভেদ্য প্রাচীর বেষ্টিত। বেশ উঁচুও বটে। অমর সিং গেট। প্রবেশ পথ। প্রাচীরের পর পরিখা। তারপর আবার স্বল্প উঁচু পাঁচীল। পরিখায় জল আছে। সেতু পেরিয়ে ঢুকতে হল। প্রশস্ত চত্বর পেরিয়েই জাহাঙ্গীর মহল, পাশেই তার মা যোধাবাঈ মহল। দুটোই নয়নবিমোহন - তবে যোধাবাঈ মহলে বাঙালী স্নিগ্ধতা আছে। কেমন যেন বাঙালী ঘরানা। পাশে পরবর্তীকালে শ্বেতপাথরের নির্মিত শাজাহান মহল। এটির প্রতিটি স্তম্ভই কারুকার্য্য মন্ডিত। আকবরের আমলে রচিত দেওয়ানি খাস ও

দেওয়ানি আম সাজাহান পরিবর্তিত করে (গাইড বললো) – দেওয়ানী আমের স্তম্ভগুলোর নির্মাণ কৌশল নাকি এমনই যে সব জায়গা থেকেই সম্রাটের সিংহাসন দেখা যায়। গাইড একজনকে পিলারের বিপরীতে নিয়ে গিয়ে বোঝালো ব্যাপারটা। দেওয়ানী খাসের লত আর ঝরোকা দেখার মত - চির অবিস্মরনীয়। কত শিল্পী পরবর্তীকালে এইসব অনুকরণ করেছে। আকবর নির্মাণ করে জামি মসজিদ - লাল বেলে পাথরের শিল্প সমৃদ্ধ সেই মসজিদ। পরে সাজাহান নির্মাণ করেন মোতি মসজিদ - সম্ভবতঃ বিশ্বে শ্বেতপাথরের নির্মিত বৃহত্তম মসজিদ। সেটিও শিল্পকার্য্যে প্রায় অতুলনীয়। সময় দিয়েছে ৪০ মিনিট। ভালো করে দেখা হলো না। দ্রুততা ছিলই নইলে তাজমহল দেখার সময় কমে যেত (পরে দুবার দেখেছি – একবার কোচ রেখেছিলাম ফোর্ট ষ্টেশনে) তাজমহলে ১ঘন্টা সময় দিল। বিশাল তার আয়তন - বাগিচাগুলোও তাদের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করেছে। সমস্ত মিলিয়ে একটা গোটা তাজমহল । গাইড বললো একটা পেড় ফেটে ফেললে সৌন্দর্য চলে যাবে। আমাদের মত সাধারণ মানুষের চোখে হয়তো ধরা পড়বে না কিন্তু কিউরেটর সাহেব একথা বলেছেল। হাজিভি আছেন আওর বিশ্ববিদ্যালয়ের পন্ডিতভী আছেন। গেট দেখালো বললো কবীর ২৫০ ডাইশো ফিট উচু গেট – লেকিন দেখনে সে মালুম হোতা পাঁচাশ ফিট – কিউ এইশা লাগতা? এ আখবর ছোটো না দেখাতা উসলিয়ে। আগেই লিখেছি, এ্যান্টি ডাইমেনশনাল লেটার দেখেছি – ইতমদউদৌলায়। তাজের গেটেও তাই (তখন এখানে টিকিট ঘর ছিল)। সামনেই একটা চত্বর বাঁধানো – তার ডানদিকে দেওয়ালে - গাইড বলতে বুঝলাম, কেউ করেও দেখলো – সামনের দিকে গেলে মনে হচ্ছে তাজ পিছিয়ে যাচ্ছে। পিছিয়ে এলে মনে হবে তাজ এগিয়ে আসছে। তারপর প্রশস্ত বাঁধানো চত্বর। এখানে দাঁড়িয়ে কতজন যে ফটো নিল। মাঝখানে সরু একটা জলাধার। তার দুপাশে দিয়ে যাতায়াতের পথ। অথচ সেই সরু (৬-৮ ফুট

প্রশস্ত) জলে কি করে তাজমহল প্রতিবিম্বিত। কেমন করে সম্ভব? (অথচ প্রথমবার এসব নিয়ে ভাবিইনি)। সিঁড়ি দিয়ে নেমে চত্বর মাড়িয়ে অন্দরমহলে পা রাখলাম। তখন বোঝা গেল তাজমহল অক্টাগোনাল / অষ্টভূজাকৃতি – আগে একবার এলেও আমি জানতাম তাজমহল চতুর্ভূজ। গাইড জানাল মূল স্থপতিকারের নাম ঈশা খাঁ। সম্রাট সাজাহান নাকি এঁকে যমুনানদীর পারে কালো পাথরের অন্য একটা মহল নির্মান করতে বলে – শিল্পী নারাজ হতে সম্রাট তার হাত কেটে দেয়। (কে জানে কতজন, কত কী বলে, লেখে) সবাই কবর দেখতে নীচে নেমে গেল। আমরা কজন প্রদক্ষিণ করলাম। দেওয়াল চিত্রণে সবুজ ও লাল রংয়ের বাড়াবাড়ি। গাইড ওদের সঙ্গে নীচে নেমে গেছে। লত আঁকায় ইতমদউদৌলার দেওয়ালে প্রচুর মীনা ব্যবহার করা হয়েছে। নীল তার রং – এখানে সবুজ রং। (পরে গাইড বলেছিল পান্না আর চুনী ছিল - তার কথা তখন বিশ্বাস করিনি, পরে এক আমেরিকান লেখকের লেখায় ও ফটোগ্রাফি দেখে বুঝি গাইড সত্যকথাই বলেছিল – ইংরাজরা সব চুরি করে নিয়েছে। এগুলির সামান্য .এক ভগ্নাংশ বৃটিশ মিউজিয়াম, লন্ডনে আছে)।

নবেন্দু বললো, এতদিনে ভ্রমণ সার্থক হলো। বললাম পরে কথা বলবো – আলোচনার জন্য সময় চাই। চল সব কিছু দেখি, যমুনাঘাটে যাই। নবেন্দু বললো, কমলের কথা মনে পড়ছে। কমল? কমল কে? নবেন্দু হেসে বললো, শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন। বা, আমি রবীন্দ্রনাথ ভাবছি, তুই শরৎ ভাবছিস। এটাকে কোন মতেই একবিন্দু নয়নের জল মনে হয়না। তাজের চুড়োটা দেখেছিস, পিঁয়াজী ঢংয়ের – সেটাকে দেখলে নয়নজলের কথাই মনে হবে – তবে গাইডের কথা যদি সত্যি হয়। তবে রবীন্দ্রনাথের লেখা উচিত ছিল হীরা পান্না মাণিক্যের চ্ছটা – মুক্ত মুক্তর কথা মনে পড়লো কেন কে জানে।

যমুনাঘাটে যাবার আগেই এক প্রহরী জানাল, 'ঘুমতি

চলিয়ে, পাঁচ বজনে চলতা'। ফলে ফিরতি পথ ধরলাম। বাস স্টেশনের কাছে নামিয়ে দিয়ে পাওনা বুঝে চলে যাবার আগে জানিয়ে গেল মথুরায় দিল্লীতে তাদের ব্রাঞ্চও আছে। মাছ কিনতে ছুটলো কজন। আমি বেঞ্চে বসলাম। সিধুদা এসে বসলেন। এবার সঙ্গী হরিদা আসেনি। কাশীদাও আসেনি, দুঃখ করলেন। কেউ তেমন ভাবে সঙ্গ দিচ্ছে না বলে। অনেক কথা বললাম দুজনে। কেশবদা আর কার্ত্তিক দাস ভরসা দিয়ে নিয়ে এসেছিল। এখন দুজনেই রান্নাঘর সামলাচ্ছে। কানাইকে, গোষ্ঠকে যতটা না সময় দিচ্ছে, তার চেয়ে বেশি সময় দিচ্ছে বুড়োর বৌমা দেবিকাকে।

দেবীকা? সে আবার কেডা? বাঃ, গণেশের কাকা, খুড়তুতো ভাই এসেছে না, সেই ভাইয়ের বৌ – বাঃ, গাড়িতে সাড়া পড়ে গেছে, তুমি দেখইনি? কৌতুহল হলেও প্রকাশ না করে কথার মোড় ঘোরালাম। চরৈবেতীকে ঘিরে কোন কুৎসা ছড়াক তা আমি চাইতেই পারি না। এ কোচে আমিই সবচেয়ে শিক্ষিত ব্যক্তি বলে সবাই জানে (শীলা শীল, সুশান্ত শীলের স্ত্রীই ছিলেন এ্যাকাডেমিক্যালী সবচেয়ে শিক্ষিতা, এম.এ. পাশ) ফলে সিধুদার ব্যক্তব্যে বিশেষ কান না দিয়ে বললাম, আগের বার আর এবারের মধ্যে কোনটা ভাল লাগছে? সিধুদা বললেন, গতবারে যেখানে গেসলাম, সেখানের লোকের কথা বুঝতেই পারিনি – এবারে তা থেকে বেঁচেছি। গতবারে যেমন ভয়ে ভয়ে ঘুরেছি - নস্করবাবু ও সেন বাবুর দাঁত খিঁচুনি খেতে হচ্ছেনা - তুমি, নবেন্দু, বিদ্যুৎ কত মান্যতা দাও – সে হিসেবে এবারে ভাল লাগছে। তবে এবারে মেঝেতে শুতে হচ্ছে – বড্ড ঠেসাঠেসি ভিড়। তবু বাবা একটা কথা বলি – গতবারে ছিলুম বাড়ির পোষা কুকুরের মত, এবারে আছি নেড়ি কুত্তার মত। কষ্ট আছে তবু স্বাধীন। শুনে আমি চমকে গেলাম, এমন ভাবে আমিও ভাবিনি।

কথা বলছি দুজনে। সাইডিং লাইনের প্লাটফর্মের বেঞ্চে

বসে। কাছেই অনেকগুলো কোচ। এলাহাবাদের মতই কিন্তু কোথাও পিলগ্রিম প্ল্যাটফর্ম লেখা নেই এলাহাবাদের মত – ঠিক আছে, এটা হিন্দুদের কোন তীর্থ নয় – তাহলে লেখা উচিত ছিল ট্যুরিষ্ট প্ল্যাটফর্ম – অনেক প্রদেশের মানুষই আগ্রায় আসেন, বিদেশের মানুষও আসেন। এখন দরিদ্র নিম্নবিত্ত মানুষদের দল বেঁধে ভ্রমণের তৃষ্ণা জেগেছে। দেশকে স্বচক্ষে দেখে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চাইছে। অতীতকে জানতে চাইছে। খুবই ভাল কথা – কিন্তু কর্মকর্তারা তাদের কাছে নানা সুবিধা নেয় – আর্থিক তো বটেই, মানসিকতার সুযোগও নেয়।

এক প্যান্টশার্ট পরা পুরুষ এলেন। হাতজোড় করে বললেন, নমস্কার, আমি ব্যানার্জী স্পেশালে এসেছি। আপনাদের মতই আমি কাঁচড়াপাড়া ওয়ার্কসপ স্টাফ। কেমন বেড়ালেন আজ ? আমি আমাদের দুজনেরই পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করলাম – আপনারা আজ সবটা দেখেননি ? ফতেপুর সিক্রিতে আপনাদের টাঙ্গা দেখেছি। ক্রমে জানা গেল তাঁরা ১৫ দিনের জন্য ১০০ টাকা দিয়েছেন। এলাহাবাদ ২, আগ্রা ৩, দিল্লী ৩, বারানসী ৩, গয়া ১, দিন এইলো প্রোগ্রাম। আমাদের প্রোগ্রাম জানালাম। উনি চমকে উঠলেন, বললেন এত কম টাকায় কি করে পারবেন? বললাম দক্ষিণ ভারতের ২৫ দিনে ৫০ টাকাও খরচ হয়নি। শুনে তিনি বললেন, আপনাদের সবাইকে খাটতে হচ্ছে- - আমাদের তো হাতে কিছু করতে হয়না। তবে যে সে গতরাতে – ওরকম কিছু যাত্রীতো থাকবেই, আনপড়, অশিক্ষিত মানুষ ম্যানেজার খাটিয়ে নেয়। উনি কম টাকায় যাচ্ছেন? সিধুদা এতক্ষণে প্রশ্ন করলো। ভদ্রলোক বললেন, না না - চাষী মানুষ, ম্যানেজারের জানা শোনা – নিজেই আগ বাড়িয়ে ঠাকুরদের সাহায্য করে - ওদের পটিয়ে হয়তো বেশি খায়? সব খাবার কি মাপা নাকি? দূর মশাই এলাম গল্প করতে – না কেবলি প্রশ্ন। হেসে বললাম – না না বসুন গল্প করুন, গল্প বলুন।

আমি প্রায় প্রতি বছর আগ্রা আসি। ৩৫ বছর রেলে পাশ

পাচ্ছি, এই নিয়ে ২২ বার আগ্রা এলাম।। বললাম বাঃ, সিধুদা বললো বাইশ বার? কী দেখতে আসেন? বাঃ, তাজমহল দেখতে আসি। বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্য্য। শ্বেত পাথরের নয়ন মুগ্ধকর প্রাসাদ। কত গায়ক গান বেঁধেছেন, কবি কবিতা লিখেছেন। প্রেমের এমন মাধুর্য্যমন্ডিত স্মৃতি এই পৃথিবীতে নেই। তাইতো তাজমহল পৃথিবীতে অন্যতম। আমায় তর্কে পেয়ে গেল। বললাম, কবিতা পড়েছেন, উপন্যাস পড়েননি। শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন। উনি বললেন, পড়েছি – কমল একটা পুরুষ চাখা মেয়ে ছিল – সে প্রেম কী বুঝবে? বললাম ইতিহাসেই পড়েছি শাজাহানের বেশ কয়েকটি বেগম ছিল – আপনার কথামত সাজাহানও ছিল মেয়ে চাখা। ভদ্রলোক বললেন, চলি।

বললাম কথা বললে বিরোধিতা থাকবেই। তাজমহল এক অপরূপ সৃষ্টি, বার বার দেখার মতই – এমন নয়ন তৃপ্তিদানকারী স্থাপত্য বিশ্বের কোথাও নেই – এমন পড়েছি। মেনেও নিয়েছি। কিন্তু তার জন্যে পত্নীপ্রেমের প্রয়োজন নেই। – সেটাতেই বাধা দিচ্ছি। আপনি ২২ বার এসেছেন, এর চেয়ে বেশি বারও কেউ কেউ আসতে পারেন – কিন্তু কারো কথায় দেখবেন না, দেখবেন নিজের চোখে – নিজের মতামত বলবেন। আমি ইতিহাস পড়েছি, তাজমহলের – তাজের স্থাপত্য কী কারণে শ্রেষ্ঠতম সেটা জানতে চেয়েছি। আপনি কি জানেন – তাজমহলের ভিত হচ্ছে তাঞ্জোরের শিব মন্দিরের মত ? আপনি কী জানেন – মান্ডুর এককালীন শাসন কর্তা হোসেন শাহের সমাধি থেকে তাজের আদল এসেছে। লত এবং এ্যান্টিডাইমেনশনাল স্থাপত্যরীতি এসেছে আগ্রারই ইতমদউদৌলা থেকে? ভেবেছেন কখনও কুতুবের পরই তাজমহল দ্বিতীয় সর্ব্বোচ্চ সৌধ ভারতের? কখনো ভেবেছেন, কেন আঙুলে পাকানো ফুটো দিয়েও পুরো তাজকে দেখা যায়? সেই সরু জলাশয়ে পুরো তাজ কেমন ভাবে প্রতিবিম্বিত হয়? ভদ্রলোক বললেন, সার্থক হলো আমার গল্প

করতে আসা – না, আপনি দেখছি অনেক কিছু পড়ে এসেছেন। (আরো কথা হয়েছিল, তা ভ্রমণ বিষয়ক নয় বলে বাদ দিলাম)।

খাওয়ার পরে শোওয়ার চিন্তা মেঝেয় শুই। যাতায়াতের পথ। বিছানা গোটানো থাকে। পেতে নিতে বিশেষ সময় লাগে না। দুজনেই ব্যাচিলার শ্রমিক। খাটতে ভয়ও পাই না, লজ্জাও পাই না – রঙের কাজ করি। ক্লিনিং (পরিস্করণ) তার অন্যতম অঙ্গ – তাই ঘৃণাও কম। এবারে সঙ্গে বোন এসেছে। তাকে রেখেছি অন্যত্র। সেখানে সেও যতটা পারে খাটে। দিদি ও দুবোন প্রস্তাব দিয়েছিল বিছানাটা তারা পেতে দেবে। তাতে সম্মতি দিইনি। কেননা, আমাদের সময় আমাদেরই অজানা। কত লোকের দায়িত্ব নিয়েছি। তারাই সব করছে, কিন্তু বেড়িয়েছে আমাদের ওপর ভরসা রেখেই। আমরা একক যুবক, অবিবাহিত থাকার প্রতিজ্ঞা করেছি – ফলতঃ আবার আসতে পারবো – কিন্তু অন্যেরা সবাই তা তো পারবে না।

বিছানা পাততে যাচ্ছি, নবেন্দু বললো, চল খুড়ো চাঁদের আলোয় তাজমহল দেখে আসি। তা কী করে সম্ভব? শুনেছি, দোল পূর্ণিমার আর কার্ত্তিক পূর্ণিমার রাতে তাজ দেখা যায়। এক চেকার বলেছেন, রাশিয়ার একদল ট্যুরিষ্টের জন্য তাজ খোলা হবে রাত বারোটায় – তিনিও সঙ্গে যাচ্ছেন। আমি ক্যামেরা কাঁধে বেরিয়ে পড়লাম। নূতন কমদামী রাশিয়ান ক্যামেরা – এক নেভিতে চাকরী করা বন্ধু দিয়েছে – মূল্য নিয়েছে মাত্র ৯২ টাকা। রিলে ৩৬ টা ফটো ওঠে। কম আলোতে (হ্যারিকেন) ফটো তুলেছি – (হাতে ষ্টান্ড নেই) সময় দিয়ে। নবেন্দু প্রশ্ন করলো, 'ফটো পাবি তো?' নিশ্চয়ই পাবো। বিদ্যুৎদাকে সজাগ থাকতে বলে চলে গেলাম।

চেকারটি স্থানীয় যুবক – বিজয় ভাটিয়া। সে টাঙ্গাও ঠিক করেছে। সঙ্গে আমরা তিন – সিধুদা সমেত। নবেন্দু বললো, ইচ্ছা ছিল মনাকে নেব – কিছু সিধুদা ছাড়লো না।

হতে পারে। তখনকার আলোচনা এই বৃদ্ধমনে দোলা দিয়েছে।। এখন স্পেশ্যাল টিকিট ১ টাকা। তখন ছিল আট আনা। পূর্ণিমা গেছে দিন তিনেক আগে। চাঁদ সামান্য কম শক্তিশালী - তবুও তাজমহল ঝকঝক্ করছে। খবর কেমন ভাবে রটে যায়। এত রাতেও প্রায় হাজার দর্শক ! যাই হোক এখন আমাদের নেতা বিজয় ভাটিয়া বাগানে নামতে নিষেধ করল। বাগানের নরম ঘাসের লনে কিন্তু অনেকেই বসে আছে। অধিকাংশই সম্ভবতঃ স্থানীয়। চাতালে কিছু বিদেশী / শিনীর ভিড় - সম্ভবতঃ নবাগত বলেই নির্দেশ মেনে শৃঙ্খলিত এবং জোটবদ্ধ। কিছুক্ষণ পরে ইংরাজী জানা গাইডের সঙ্গে তাজমহল চত্বরে উঠে পড়লো পুলিশ বেষ্টিত হয়ে। ভারতীয়দের মৃদুভাষায় নীচে নামিয়ে দেওয়া হলো। মনে মনে বিজয় ভাটিয়াকে অনেক ধন্যবাদ জানালাম। নবেন্দুকেও। আমরা বিজয়ের নির্দেশমত চাতালেই দাঁড়িয়ে আছি। সিধুদা হাঁ করে কী ভাবছে। কী দেখছে কে জানে, তবে চোখের মুগ্ধতা বোঝা যাচ্ছে। নবেন্দু মৃদুস্বরে ভাটিয়ার সঙ্গে কথা বলছে। তখন হঠাৎ পাশ থেকে ফ্লাশগানের আলো এসে গেল (তখন এও সহজলভ্য ছিল না ফ্লাশগান)। সরকারী ব্যবস্থাপনায় ফটো তোলা হচ্ছিলই – তারা ছিল দলের সঙ্গে। তাই ফ্লাশগানের আলোয় চমকিত হলাম। এদিকে আমি নিজে তখন টাইমিংয়ে তাজের ফটো নিচ্ছিলাম। হাত গেল কেঁপে। তাই রিলগুটিয়ে আবার ট্রাই করতে শুরু করলাম। ফটো তোলা শেষ হতে ফ্লাশগানের মালিক এক বিদেশীনি প্রশ্ন করলেন, Do you think, you will get it ? বললাম Sorry, Madam, I try only, don't know what will be, but see you that I have got picture in this Camera at the light of Haricane -- fuel is only Kerosine. "Oh, how beautifull, then, then you will surely get it. (পরে সত্যিই দ্বিতীয় ফটোটা ভালো এসেছিল। প্রথমটা ঘষা ঘষা অস্পস্ট হলেও তাজকে বোঝা

গেসলো) [এখন সে সবই উইয়ে নষ্ট করে দিয়েছে]।

বিজয়ের চেনা টাঙ্গা, অপেক্ষা করে আছে, তাতেই ফিরবো। নবেন্দুর তাড়ায় ফিরতে হল। সিধুদা টাঙ্গায় এসে বললো, মনে হচ্ছিল স্বর্গে এসে গেছি। এত সুন্দর কী মানুষ তৈরী করতে পারে? বিশ্বকর্মা ঠাকুরের করা – মিস্ত্রিদের হাতে বিশ্বকর্মা এসে ভর করেছিল। তখন গাইড বলছিল, দ্বিতীয় তাজ করতে বলেছিল সম্রাট। শিল্পীরা জানতো তারা আর পারবে না। দেবতা কী সব সময়ে ভর করে! আমি শুনে হাসলাম, কিন্তু বুঝলাম, সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা না বুঝলেও সিধুদার ঘোর কাটেনি। প্রায় নির্জন রাস্তা। টাঙ্গা চলছে, অশ্বক্ষুরের ধ্বনিকেও মধুর মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে শুধুমাত্র তাজমহলেরও সৌধ নয়, গোটা পরিবেশ ঘিরেই। মনে হচ্ছে, গাইড ঠিকই বলেছিল – গাছপালাগুলোও সুন্দর। (পরে আর কখনো তাজমহলকে রাত্রে দেখিনি) এখন শুনেছি। নানা রঙের আলো জ্বলে – প্রায় প্রতি রাতেই দর্শকরা ঢুকতে পান অর্থের বিনিময়ে। আমি সে রাতের পর ভেবেছি - এ সৌন্দর্য্য অপার্থিব।

ভোর চারটেয় প্যাসেঞ্জার কোচ টেনে নিল প্রোগ্রাম মত। সারা রাত প্রায় বিনিদ্র কেটেছে। এ্যাটাচমেন্টের ব্যাপারে বিজয় আর নবেন্দু সাহায্য করলেও ঘুম আসেনি। সাতটায় পৌঁছাল মথুরায়। ৫৪ কিমি পথ তিন ঘন্টা লেগে গেল। কোচ কেটে সাইডিং লাইনে এক গাছতলায় রেখে গানাররা চলে গেল। ফলে সেখান থেকেই যাত্রার আয়োজনে চলে গেল দলবল। আমি আর কানাইদা রয়ে গেলাম কোচে। কেমন যেন শীত শীত করছে – জ্বর এসে গেছে নাকি ? কানাইদা চা বানিয়ে কাছে এনে বললো – নরেনদা (নবেন্দু) বলে গেছে, ভাত, ডাল, নিরামিষ তরকারী করে রেখো – সব যোগাড় করে দিয়ে গেছে ওরা– তোমার জন্যে কটা লুচি রেখে দিই? ওরা টাঙ্গায় গেছে, লুচি আর বোঁদে করে নিয়ে গেছে। নবেন্দু বলে গেছে ফিরতে

বিকেল হবে। কাতু যেতে চাইছিল না, বুঝিয়ে ওদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছি। বললাম, এখনই কখানা আনো ক্ষিদে পাচ্ছে। খেয়ে দেয়ে লিখতে বসলাম। দুপুরে খেয়ে দেয়ে এস.এম.এর কাছে যাবো ভাবছি, তখন গানাররা এসে গাড়ি টেনে নিয়ে পিলগ্রিম প্ল্যাটফর্মে রাখলো। ফাইল বগলে একাই গেলাম এস.এম-র ঘরে। উনি বললেন রাতের প্যাসেঞ্জার লোড আছে। সে ট্রেনে গাড়ি জোড়া যাবে না – তাকে দুই রেলের ওয়ার্ক অর্ডার দেখালাম – তবু মানলেন না। ফিরে আসছি তখন এক টিটিই বললেন কিউ না দশ রূপেয়া দে দিয়া? তাঁকে বোঝালাম আমরা সবাই শ্রমিক, সবাই রেলশ্রমিক, তাদের চাইতে কম বেতন পাই – সেন্ট্রাল রেল আর ইস্টার্ণ রেলের ওয়ার্ক অর্ডার আছে। উনি আমায় নিয়ে আবার এস.এম-র ঘরে গেলেন। তাঁকে বোঝালেন, তখন তিনি বললেন, এ গার্ড বহুৎ টেঁটিয়া হ্যায়। ঠিক হ্যায় উও রাজী হোগা তো গাড়িমে কোচ জুৎ দেগা। হেসে চলে এলাম। কী করি আবার লিখতে বসলাম। আগ্রার কথা শেষ হচ্ছে না।

ওরা খেতে বসতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। বিদ্যুৎদা বললো, টিফিন শর্ট পড়ে গেসলো। মিল হিসাবে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। আমরা কজন দোকান থেকে কিনে পেট ভরিয়েছি। নবেন্দুকে এস.এম-র কথা বললাম। বললো দশ টাকা দিয়ে দিলি না কেন? বিদ্যুৎদা বললো পাবলিকের টাকা দেবে কেন? জানিস মাইনে পাই দুশো টাকা মানে ২০ টা ১০ টাকার নোট মানে আমাদের এক দিনের বেতনের চাইতে বেশি – সুভাষ বলছিল কেউ পয়সা চাইলে দিল্লীতে কমপ্লেন করে দেব। নবেন্দু হেসে বললো, প্রমাণ করতে পারবি যে, টাকা চেয়েছিল? প্রমাণ করতে গেলে গাড়ি আজ যাবে না। সবাই ঠিক কথা বলছে। ফলে ঠিক হলো রাতে গার্ডের সঙ্গে ফয়সলা হবে।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অসুস্থ শরীর। বিদ্যুৎদা ডেকে নিল। এ এক মজার দৃশ্য – নাটকেই মানায়। সাধারণ যাত্রীরা এদৃশ্য

কখনো দেখতে পাবেন না। কোচটা টেনে এনেছে গানাররা – কোচের থেকে দুফুট মাত্র দূরে। গার্ড জুড়তে দেবেন না, এ.এস.এম. জুড়বেন। আমাকে দেখতে পেয়ে গার্ড বললো দশ রূপেয়া দিজিয়ে পহলে তব কোচ জুতেগা। আমায় কথা বলতে না দিয়ে বিদ্যুৎদা বললো, এস.এম. সাহেবকো সাথ বাত পাক্কা হো গিয়া, সাহাব কুছ নেহি লেতা। উনে সমঝগেয়া হ্যমলোগ সবহি রেলকা লেবারিং স্টাফ। আপভি ছোড় দিজিয়ে। গার্ড বললো নেহি তব পাঁচ রূপেয়া জরুর নিকালো। নেহিতো কোচ নেহি জুতেগা। বিদ্যুৎদা বললো, দো রূপেয়া লে লিজিয়ে কৃপা করকে। গার্ড বললো, ঠিক হ্যায় তিন রূপেয়া। বিদ্যুৎদা বললো, ঠিক হ্যায় তব ডাই রূপেয়া লিজিয়ে আপকা বাতভি রহেগা, হামারা বাৎভি। ছ্যাঁচড়া গার্ডটা তাই নিল হাত পেতে। বিদ্যুৎদাও পকেট থেকে ঠিক আড়াই টাকা বার করে দিল। যেন জানতো এই ফয়শালা হবেই।

প্যাসেঞ্জার ট্রেন অধিকাংশ যাত্রীই নিদ্রিত। তাই এই রগড় বিশেষ কেউ বুঝলো না। ট্রেন ছেড়ে দিতে কোচে এই নিয়ে অনেক হাসাহাসি হলো। শীলা বৌদি বললেন, দ্বিতীয় একাদশী বৈরাগী যেন। কোষাধ্যক্ষ এমনই হওয়া উচিত। অখিল বললো জাটীদা, আপনি তো সবটা দেখেন নি। – বিদ্যুৎদা তো ফাইল নিয়ে আমায় নিয়ে এস.এম.- র ঘরে গেল, বললো সাহাব সহি কর দিজিয়ে। এস. এম. বললো উও আদমী কো বুলাও। ম্যয় তো বতা দিয়া ম্যয় কুছ না লে পাউ। তখন আমি বিদ্যুৎদাকে আপনাকে ডেকে আনতে বললুম। সাহেব কাগজে সহি ও স্ট্যাম্প করে আমায় দিয়ে বের হলেন। বা, সত্যিই এটা জানতাম না। (পরে কারখানাতেও অখিল আর সুভাষ প্রায়ই বলতো এই ঘটনার কথা)।

আজও প্রায় বিনিদ্র রাত কাটলো। দিল্লী আমাদের থেকে অনেকটা পশ্চিমে। এখানে আলো ফোটে দেরীতে। তবে ষ্টেশন এলাকা বলে আলোর ঝলকানি আছে। এএসএম এসেছেন কোচ

কাটাতে। কাগজপত্র দেখে গানারদের বললেন, নর্দান ইয়ার্ডমে রাখো। আমায় বললেন, সাথ মে চলিয়ে। সুভাষকে নিয়ে সঙ্গে গেলাম। রাজধানী ষ্টেশন । এসএম পোষ্ট নেই এখানে এসএম হচ্ছেন এসএস ষ্টেশন সুপারিনটেন্ডেন্ট। যাক, এএসএম ভদ্রলোকটি মহদাশয় ব্যক্তি, এমন মানুষ স্বভাবতই বিরল। বিরাট ঘর, কত যে টেলিফোন, কর্মীরা ছিটিয়ে ছিল এদিকে ওদিকে। কেউ বা কারোর সাথে আলোচনা করছে। পাশেই ইয়ার্ড মাষ্টারের কক্ষ। দুটো খালি চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন। কাগজপত্র দেখে বললেন, দো দিন কা ক্যা জরুরৎ? দুই দিল্লী দুদিনে দেখবো। খরচা তব যাদা পড় যায়েগা। রেষ্ট ভি তো চাহিয়ে? কাপড়া সাফা করনা হ্যায়। প্ল্যাটফর্ম ওয়াটার ইলেকট্রিক সবহি চাহিয়ে। হেসে হাত নেড়ে বললেন, সবহি মিল জায়েগা, তব থোড়া বাদমে, ভেরী বিজি ষ্টেশন। বহুৎ বদমাস আদমী হ্যায়। সাবধানীমে রহিয়ে – স্রিফ মছলী অউর আনাজ খরিদিয়ে – সব চোট্টা হ্যায়। অবাক হয়ে গেলাম তাঁর একম্বিধ ভাষণে । সুভাষ বললো, চাঁদনী চৌক মার্কেটমে– নেহি জায়গা, উধার বহুৎ পিক পকেট হোতা হ্যায়। প্রশ্ন করলাম, বসগুমটি কিধার? টুরিষ্ট সেন্টার মে যাইয়ে। বলে একটা কাগজে ঠিকানা লিখে দিলেন। বললাম, নিউ দিল্লী, তবতো ট্যাক্সি লেনা পড়েগা? যানা আনা পাঁচ রূপেয়া পড়েগা, তবভি পচাশ রূপেয়া বাঁচ যায়েগা। প্রাইভেট বাস সব ফেরেব্বাজ হ্যায়। শুনিয়ে তব একঠো বাত – হরদুয়ার মে খরিদ কিজিয়ে। এ হ্যায় রাজধানী – ইধার সবসে আচ্ছা আদমিভি রতা, খতরনাক আদমিভি রতা। উঠে হাত জোড় করে বললাম, We are very lucky, meet a noble man like you, pray for us উনি ষ্ট্যাম্প মারা কাগজপত্র ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, pray for me also হাত তুলে নমস্কার জানালেন।

তখন সকাল হয়ে গেছে। গাড়ি খুঁজে পেলাম ওয়াটার পয়েন্টে। গানার বললো, ধূপমে ১৩ নং প্ল্যাটফর্ম এর কাটআউট

মে প্লেস কর দেগা – এইসাই ইয়ার্ড মাষ্টার কা অর্ডার হ্যায়। আভি ইধারহি খানা পকাইয়ে, স্নান কর লিজিয়ে – বেফিকর রহিয়ে – ইধর সব রেলকা আদমি হ্যায়। ডরিয়ে মাৎ – এএসএম সাহাব ফোন কর দিয়া – আপকা দেখভাল হমলোগই করেগা। সুভাষ বললো তব তো বহুৎ খুশি কা বাত – আইয়ে থোড়া চায় পিজিয়ে।

চা পান শেষে নবেন্দুকে সব রিপোর্ট করলাম। নবেন্দু রাজী হতে ষ্টেশনের বাইরে এসে ট্যাক্সি ধরলাম। সে ঠিকানাটা দেখে বলো, এক রূপেয়া পঁচাত্তর পৈষা পড়েগা। আমরা ঢুকে পড়লাম। তার মিটারে লাল কাপড় বাধা। যাকগে সে খুব দ্রুতই ট্যুরিষ্ট অফিসের সামনে নামিয়ে দিয়ে পাওনা নিয়ে চলে গেল। সবে মাত্র এক যুবক এসে ঢুকলো, প্রশ্ন করলো, কী চাই ? ক্যায়া মাঙতা? নবেন্দু বললো, আমরাও বাঙালী – হিন্দীও ভাল জানিনা। ফলে বাংলাতেই কথাবার্তা হলো। অল্পদিন হলো চাকরী পেয়েছে – স্থানীয় বাঙালী সে, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। বললো দিল্লী বিশাল এলাকা – ভালভাবে দেখতে হলে পাঁচছদিন লাগবে। কতগুলো যাদুঘর আছে বলুন। আপনারা ৯০ জন আছেন, দুটো বড় বাস নিন ৪৪ সীটের – একবেলায় দূরের গুলো দেখিয়ে ওরা দুঘন্টার জন্যে ষ্টেশনে ছেড়ে দেবে – পরে কাছের গুলো দেখিয়ে ঠিক ছটায় লালকেল্লার সামনে ষ্টেশনে নামিয়ে দেবে।

ঠিক ৯ টায় বাস ষ্টেশনের সামনের গেটে চলে যাবে। তিনশো টাকা পড়বে, হাফ হাতে তখনই দিতে হবে। হাফ শেষে দিয়ে পাকা রসিদ পাবেন। টাকা নিয়ে আর রসিদ নিয়ে বললো, ট্যাক্সি ধরে দ্রুত ফিরুন – আটটা তো এখনই বেজে গেল। সবাইকে রেডি হতে বলে এসেছি। জানালো নবেন্দু। বললো, চল ট্যাক্সিতেই ফিরি। বাঙালী বলে সহজে সব বোঝানো গেল। হেসে জানালাম, দেরী হতো হয়তো কিন্তু বোঝানো যেতেই - মনে রাখছিস না এটা ওর জীবিকা। ট্যাক্সি এল, মিটার

দেখে বললো, টু ফিফটি, বললাম, যানে কা টাইমমে ওয়ান সেভেনটি ফাইভ লিয়া। ড্রাইভার বললো, নয়া আদমী – ওয়ান ওয়ে হ্যায়, ঘুমতি রাস্তা জাদ্দা হ্যায়। নবেন্দু বললো, দিয়ে দেনা, পাঁচ টাকার মধ্যেই তো খরচ পড়ছে – চল সময় কম।

সবাই যাবে না। গণেশদার কাকা কাকীমা, কানাইদা স্বস্ত্রীক, গোষ্ঠদা – পাঁচজন থাকবে। দুপুরের খাবার তৈরী করবে। গোষ্ঠদার বৌ অন্যদের সঙ্গে যাবে। সবাই টিফিন খেয়ে নিল – লুচি আর সুজি। গাড়িতে লুচি করাটাই সহজ। বাসের নাম্বার লেখা কাগজ নিয়ে আশু কুন্ডুরা বাইরে চলে গেল।

নবেন্দুর ব্যবস্থা মতই সবাই বাসে উঠলো। দুটো বাস – আমাদের বাসে নবেন্দু, অন্য বাসে কুন্ডু হচ্ছে নেতা। আমার পাশের সীটে বসেছে সিধুদা। আগ্রাতেই আমায় তার মনে ধরে গেছে। জানতো, আমি লেখাপড়া করি। কিন্তু এতজ্ঞানী লোক সে নাকি দেখেনি। স্তুতিবাদ ভালো না লাগলেও - মন্দও লাগছিল না। ফলে মাঝে মাঝেই আমায় জ্ঞান ফলাতে হচ্ছিল।

দিল্লীতে সেই একবার এসেছিলাম আগ্রা সফরের সঙ্গে। লালকেল্লা আর কুতুব ছাড়া কিছুই মনে নেই। ফলে বাইরের দিকে চোখ মেলেছি। প্রোগ্রাম মত বাস প্রথমেই যাবে লম্বা দৌড়ে – কুতুব চত্বরে একঘন্টা সময় দেবে। ফেরার পথে শেরমন্ডলে নামা হবে – বাকী সব দেখতে হবে স্লো ড্রাইভে – লাঞ্চ সেরে স্লো ড্রাইভে সব দেখাবে। – দুজায়গায় মাত্র নামাবে যনতরমনতর। শহীদ বেদী, শেষে লালকেল্লার ছেড়ে দিতে হবে – ঠিক ১৮ টায়। দুদিনে ধীরে সুস্থে দেখলে ৬০০ টাকা পড়ে যাবে যা আমাদের সাধ্যে কুলাবে না।

বাস জুমা মসজিদের পাশ দিয়ে (কাছেই চাঁদনী চক) ইন্দ্রপ্রস্থ ষ্টেডিয়ামের (তখনও নির্মীয়মান) পাশ দিয়ে, হুমায়ুন টুম্বস ক্রশ করে দ্রুততা বাড়ালো – জনাকীর্ণ পথ পেরিয়ে এলেও প্রাসাদপ্রতিম কিছু অট্টালিকা আছে এ পথে – বুঝতে পারা যেতে থাকলো পুরাতন দিল্লীকে। কিছু দরিদ্র মুসলমান

পল্লীও দেখা গেল, কোথাও রয়েছে কাঁটাঝোঁপের জঙ্গল, বিস্তৃত পোড়ো জমি, বাতিল মসজিদ ইত্যাদি (এখন আর এসব দেখা যাবে না)।

সিধুদা বললো, ইন্দ্রপ্রস্থ্ যদি এখানে হয়, তবে কুরুক্ষেত্র তো বেশি দূরে নয়। বললাম, স্টেশনে ফিরে সব বলবো। সিধুদা, এখন কথা বলা যাবে না। এখন হল দেখা ও বোঝার সময়। চলে এলাম কুতুব চত্বরে। একঘন্টা মাত্র সময়। অথচ এই চত্বরেই কত কিছু দেখার আছে। কুতুব ভারতের সর্ব্বোচ্চ সৌধ। পাঁচতলা বলে পড়েছি। প্রথম তল কার তৈরী তা নিয়ে তর্ক আছে। কেউ বলেন, পৃথ্বীরাজ নির্মান শুরু করেন – পরে কুতুবউদ্দীন আইবক তাকে সামান্য পরিবর্তন করে পারসীয়ান ঢং এনে দেয়। পরে তার জামাতা ইলতুতমিস (সুলতানা রাজিয়ার বাবা) এটিকে তিনতলা করে। পারসিয়ান ঢংয়েই, অনেক পরে ফিরোজ সাহই এটিকে সর্বোচ্চ সৌধহিসেবে গড়ে তোলে কিন্তু সম্ভবতঃ ভালোভাবে জোড় মেলেনি – তাই এই দুতলা ভেঙে পড়ে – ইংরেজ আমলে আবার পাঁচতলা করা হয়। ওপরের ভাঙা অংশটি কুতুব চত্বরে রেখে দেওয়া হয়। (পরে আর দেখিনি)। পুরা কুতুবের ফটো পাবার জন্য স্থান নির্বাচনে ব্যস্ত থাকায় অন্য কোন দিকে খেয়াল রাখিনি। এক সদ্যপরিচিত জার্মানি যুবকের সঙ্গে একমত হয়ে ফটো তুললাম (পরে দেখা গিয়েছিল তার গোড়াটা আসেনি, আমার ডগাটা – এর সাথে ফটো বিনিময় হয়েছিল) – আলা ই মিনার দেখলাম প্রায় ভগ্নস্তুপ। লৌহস্তম্ভের কাছে ভিড় – বোঝা গেল, সবাই রাজা হতে চায় – সবাই চেষ্টা করছে পিছন দিক থেকে জড়াতে। প্রবাদ যে পারবে, সেই রাজা হবে। না বাবা, আমি ওতে নেই – রাজা হতে চাই না। জানি, সিংহাসন মৃত মানুষের হাড়ের স্তুপের ওপর বসানো থাকে। লোভ মানুষকে সৎ মানুষ থাকতে দেয় না। সদ্য পরিচিত জার্মানি যুবককে ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে বোঝালাম ব্যাপারটা – তবু হেনড্রিকস্ গেল ট্রাই করতে – পারলো না।

লজ্জিত মুখে ক্ষমা চেয়ে সে তার সঙ্গীদের দিকে চলে গেল। (পাঠক মনে রাখবেন, তখন ক্যামেরা এত সুলভ ছিল না। লোকে বলতো, ক্যামেরা পোষা মানে হাতি পোষা)।

দলের কেউ কেউ মিনারে উঠেছে, কেউ নেমে লৌহস্তম্ভের দিকে যাচ্ছে। কেউ বা ভাঙা দেওয়াল পেরিয়ে আলাই মিনার দেখতে যাচ্ছে। তখন কুতুব চত্বরে নানা ভাগ ছিল, ইঁটের দেওয়াল ছিল। এখন পুরো কুতুব চত্বরে ফাঁকা করা হয়েছে। একই সঙ্গে আলাই মিনারে (সারানো হয়েছে)। লৌহস্তম্ভকে বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। কুতুবশীর্ষের (পড়ে থাকা) কোন হদিশ নেই – প্রবেশ মূল্য ভারতীয়দের জন্য পাঁচ টাকা, অভারতীয়দের জন্য পাঁচ ডলার। বাইরে বাসের কাছে যেতে এক আনজান আদমী, কোন কোচোয়ান হবে বললো, বাবুজী চা পিবেন? উটকা দুধ। আমি তার আগে উটের দুধের কথা কখনো ভাবিনি। থমকে গিয়েও মাথা নেড়ে সরে এলাম। (পরে শাম/ছামে/জয়শলমীরে উটের দুধের চা পান করেছি – একটু ঘেসো গন্ধ)। বাসে সবাই এসেছে কিনা জানতে চাইল। প্রত্যেকে পাশের লোককে দেখে নাও – ষ্টেশন অনেক দূরে চিনে ফিরতে পারবে না। আমি সিধুদাকে বললাম, গতবারে রাজকুমার দার বৌয়ের কথা মনে আছে? সিধুদা বললো, সে কী ভোলা যায়? মানুষ তো শুধু পড়ে শেখেনা, দেখে ঠেকেও শেখে। বা, খুব সত্যি কথা বলেছে – ভাবলাম, কিন্তু কথা বাড়ালাম না।

বাসের কন্ডাক্টরই এখন গাইড বনে গেছে। টিকিট কাটার দায়িত্ব নেই। সরকারী টুরিষ্ট বাসে এই সহায়তা মেলে হয়তো বা (পরের বছর পুণাতেও দেখেছি)। সে হিন্দিতে জানাল – দিল্লী অনেক পুরাতন শহর। পান্ডবেরা বসত স্থাপন করে ইন্দ্রপ্রস্থে – যমুনা নদীর তীরে। তখন এখানে ভারী জঙ্গল ছিল – বারিশ ভী জাদা ছিল। তারপর বহু বছরের কোন ইতিহাস নেই। রাজপুত রাজারা পরে এ অঞ্চলে দখলদারী নেয়। সূর্যকুন্ড তৈরী করে – তা এখন প্রায় শুখা হয়ে গেছে।

তারপর পাঠানরা এর দখল নিল। মুঘল এল। আবার পাঠান এল। মুঘলরা রাজধানী সরিয়ে নিল আগ্রায়। পরে সাহাজান ফির রাজধানী বানালো। দিল্লী তখন বেহেস্ত বনে গেল। বৃটিশ এল। রাজধানী চলে গেল কোলকাতায়। ফির ১৯৩৩ সালে রাজধানী হয়ে গেল দিল্লী। এখন আমরা যাব শের মঞ্জিল। লেকিন যো দেখা ওহি কুতুব কা কিসসা শুনিয়ে – বলে কুতুব কাহিনী শোনালেন।

নতুন যা জানা গেল – তাই লিখি – লেখনী শিল্প সংযমের শিল্প। কুতুবের উচ্চতা – ২৩৪ ফুট লালকিল্লা থেকে পাক্কা দশ মিল দূর (পরে পড়েছি ১৫ কিমি) সর্বোচ্চ সৌধ ওবেরয় হোটেল মুম্বাই – কাছেই আছে পৃথ্বিরাজ চৌহানের রায় পিথোরায় ভগ্নাবশেষ। প্রথম তিনতলা তৈরী হতেই সময় নেয় ৩৬ বছর। আলাই মিনার ভেঙে গেছে – সম্ভবতঃ আলাউদ্দীন খলজীর সময়ে তৈরী। লৌহস্তম্ভটি হিন্দু ব্রাহ্মনিক্যাল সময়ে সম্ভবতঃ ৪র্থ দশকে নির্মিত। পৃথ্বীরাজই নাকি এটিকে পিছন দিক থেকে ধরতে পেরেছিল। নানা কিসসা ছড়িয়ে আছে কুতুবকে ঘিরে। বইয়ে পড়েছি, কুতুব চত্বরে মসজিদও ছিল (এখন আবারহয়েছে - ১৯৩৩) – কুতয়াল উল মসজিদ (ইসলাম)। এছাড়াও দর্শনীয় ছিল, মামুদের কবর, ইলতুতমীসের ছেলের কবর। মেহেরইলি – আদম খাঁর কবর – এই আদম খাঁ ছিল আকবরের ধাত্রী মায়ের পুত্র, শ্যালক মানসিংহের পরেই তৎকালীন রণনিপুন যোদ্ধা (একেই আকবর মেরে ফেলে আগ্রা দূর্গে – পরে সুরম্য কবর বানিয়ে দেয়) তুঘলকাবাদ ফোর্ট (বর্তমানে ভগ্নস্তূপ) সফদরজঙ্গ টুম্ব – বিমানক্ষেত্রের পাশে – (এর নামে এলাহাবাদে বিশ্ববিদ্যালয় – টুম্বটিও তৈরী হয় তৎকালীন নবাব সুজাউদদ্দৌলার ইচ্ছায় ও অর্থে তার পিতৃস্মৃতিতে)– এটি অনেকটা হুমায়ুন টুম্বের মত (পরে দেখেছি)। বাস এসে দাঁড়ালো পুরানো কিল্লার সামনে। এটিই শের মঞ্জিল। শের শাহের হাতে কিছু পরিবর্তন হয়েছিল হয়তো। এর চূড়াটি অক্টাগোনাল – আর লাল রংয়ের।

এটি প্রায় শহরের মধ্যমণি। মাঝখান দিয়েই রাজপথ গেছে। কাছেই চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, প্রগতি ময়দান। এখনও শের শাহের তৈরী মসজিদ আর পাঠাগরটি যত্নে আছে। এই পাঠাগার থেকেই আফিম খাওয়া হুমায়ুন পড়ে গিয়ে প্রাণ হারান। বাসের কন্ডাক্টর বলেছিল – বৈরাম খাঁর লোক ঠেলে ফেলে দেয়। আকবর নাকি তার মাকে বৈরাম খাঁর সঙ্গে জড়িত ভাবতো – তাই বৈরাম খাঁকে আকবর হজে পাঠানোর নাম করে পথে খুন করিয়ে দেন – আর মা যখন হুমায়ুনের সমাধী তৈরী করতে চায় তখন এক দিনারও দেয়নি। (ইতিহাসে এর স্বীকৃতি পাইনি -- তবু মনে হয়েছিল সত্য।)

কাছেই খুনী দরোজা। বাস দাঁড়াবে না। গাইড বললো, ইংরেজরা যখন ১৮৫৭ সালের বিপ্লব সামলে দিল্লী দখল করে তখন সমস্ত সাহাজাদাদের (দিল্লীতে যাকে পেয়েছিল) মেরে ফেলে এই দরজায় ঝুলিয়ে দেয় – তাই এর এমন নাম। হুমায়ুন টুম্বসেও গাড়ী দাঁড়ালো না। বাইরে থেকেই কঠিন এবং ভগ্নপ্রায় এই সৌধটি দেখলাম (পরে দেখেছি দুবার) – গাইড বললো, আকবরের মা হাজী বেগম এটা তৈরী করতে নিজের গয়না পর্যন্ত বিক্রি করে। নানা রংয়ের পাথরে এই কবর। পরে সাজাহান এব পুনঃ রূপ দেয়। এখানের মসজিদটি ও বাগিচাটিও নাকি সাজাহানের সময়কার। আরো পরে ঔরঙ্গজেবের আমলে এখানে দারা মোরাদ এবং জাহানারার কবর রচিত হয়।

শের মঞ্জিলের কথা বিশেষ লেখা গেল না। ভালো করে সময় দিয়ে কখনো দেখিনি – তবে এর সংগ্রহশালাটিতে এক অমূল্য সম্ভার আছে। শের শাহের হস্তাক্ষরে লিখিত শাসন বিধি। আকবর নাকি তাই পড়েই রাজ্য শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলে। অথচ গাইড কাম কন্ডাক্টর বলেছিল আকবর লেখাপড়া জানতো না। যা কিছু লেখাপড়া করতো সব তার বাল্যবন্ধু আবুল ফজল আর টোডরমল। কোনটা সত্য তা জানি না। আকবরকে নিরক্ষর ভাবতে কষ্ট হয়। যাইহোক হুমায়ুন টুম্ব দেখেই

বুঝেছিলাম ষ্টেশনের কাছাকাছি চলে এসেছি। নবেন্দুকে প্রশ্ন করতে জানাল যে, বাকী সব পরে দেখাবে। এখন গিয়েই স্নানাহার। ফলে হোস পাইপের নলেই স্নান সেরে দ্রুত খেয়ে আবার বাসে চলে এলাম। একঘন্টাও লাগলো না। কোচ এখনো ওয়াটারিং পয়েন্টেই আছে। কানাইদারা বেশ শরীফ মেজাজেই আছে। না, কেউ কোন ঝামেলা করেনি। কয়েকজন কর্মচারীকে চা পান করিয়েছে।

এবারে বাস কন্ডাক্টর বলছে – কখনো বাঁয়ে কখনো ডায়ে। আকাশ বাণী ভবন, এয়ারলাইন্স অফিস, রেল অফিস (বরোদা হাউস), পার্লামেন্ট, রাষ্ট্রপতি ভবন, বাগান, বিড়লা ভবন (যেখানে গান্ধীকে মারা হয়), ইন্ডিয়া গেট, শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ (অনির্বান জ্যোতি দেখার জন্য কজন নেমেছিল), বিড়লা ধর্মশালা, কালীবাড়ি, সুইমিংপুল, এইসব দেখিয়ে যন্তর মন্তরের সামনে বাস দাঁড়ালো। অযত্নে শ্রীহীন। গাইড না নিয়ে কিছুই বোঝা যাবে না – কিন্তু তার কোন ব্যবস্থা নেই। আমাদের বাসের গাইডও জয় সিংহের নাম ছাড়া কিছুই বলতে পারলো না। (পরে দুবার থেকেছি – কালীবাড়িতে – হেঁটেই দেখেছি কিছু কিছু। আর হেঁটে দেখার কোন বিকল্প আজও হয়নি – যতই টি.ভি.তে দেখি) – এরপর বাস ছুটলো যমুনা নদীর তীরে (ফিরোজ শাহ কোটলার ময়দান তখনও দেখায়নি) – রাজঘাট, শান্তিবন, বিজয়ঘাট (তখনও নির্মীয়মান) দেখিয়ে (স্লো ড্রাইভে) বাস চলে এল জুম্মা মসজিদে - কিন্তু ভেতরে ঢোকা গেল না - - সেদিন শুক্রবার। হিন্দুদের প্রবেশ নিষেধ। নবেন্দু বললো, এটা তো হাঁটা দূরত্বে, পরে দেখে নেব। চলো, লালকেল্লায় চলে যাই। চলে এলাম লাল কেল্লায়। ড্রাইভাররা পেমেন্ট চাইতে বিদ্যুৎদা বললো, ছটায় টাকা দেব। গাড়িতে অনেক সামান আছে। নবেন্দু বললো, সাড়ে চারটে বাজে দিয়ে দে। বিদ্যুৎদা বললো না। নবেন্দু একটু বিরক্ত হলো।

পরিখার ওপর কাঠের সেতু পেরিয়ে লালকেল্লার গেটে

মাথাপিছু ৫০ পয়সার টিকিট। টিকিট কাটতে কাটতে বললো, বোঝ নবেন্দু, ওরা নিশ্চয়ই কিছু দেখায়নি, অথবা সময় মেরেছে। পেট্রোলতো ঝেড়েছেই – ওদের অত নাই দিসনি। নবেন্দু বললো, এখন কী হলো – সময় কমে গেল – সময় দিয়ে দেখতে পাবো না – ছটার মধ্যে ফিরতেই হবে। সে আমি আর জাটী ঠিক চলে আসবো। – তুই দলবল নিয়ে পরে আয়। বললাম ভয় নেই, কাছেই রেলের পার্সেল গেট। মনেই রাখছিস না, দিল্লী ষ্টেশনটা লালকেল্লার এস প্ল্যানেডে। বিদ্যুৎদা বললো, সে আবার কী ? এসপ্ল্যানেড মানে হল দূর্গ সম্মুখস্থ সমতলভূমি। নবেন্দু বললো, চল তো।

গেটে পাহারা। সে টিকিট নিল নীরবে। ডানদিকে যানা মানা হ্যায়। সেনা নিবাস ও অফিস কাছারী। বাঁদিকে দুপাশেই দোকান মহিলা বিক্রেতা। আগে এর নাম ছিল মীনা বাজার (পরে দেখেছি – বিভিন্ন দোকান হয়েছে – সব দোকানে মহিলা বিক্রেতা নেই) মীনা বাজার পেরুতেই দেওয়ানী আম। তারপর দেওয়ানী খাস। কিছুটা ছাড়ের পরই রঙমহল। শীশমহলটি কাঁচের - এটায় নাকি কেবল মমতাজের প্রবেশাধিকার ছিল। কাছেই স্নানাগার তাকে পার হয়ে বাগিচা। দর্শন এখানেই সীমাবদ্ধ (১৯৩৩ সালে দেখেছি, বাগিচাতেও যেতে দেওয়া হচ্ছে না)। লালকেল্লা লাল বেলে পাথরে নির্মিত। নামকরণ হয়েছে তাই থেকেই। গভীর (৩০ ফুট ছিল) পরিখা বেষ্টিত। সুউচ্চ দেওয়াল দিয়ে দুর্ভেদ্য করা হয়েছিল এই দুর্গকে। পড়েছি - যমুনার যোগ ছিল পরিখার সাথে। গেটে মুসলমানী ঢংয়ের খিলাপ ও গম্বুজ আছে। গম্বুজটি শ্বেত পাথরের। দেওয়ানি আম সজ্জিত হলেও আহা মরি রূপ নয়। অন্যদিকে দেওয়ানী খাস অপরূপ স্থাপত্য কলায় নয়নকে তৃপ্তি দান করে। কত যে সুক্ষ্ম জাফরীর কাজ। হলের সিলিংয়ের কাছে উর্দুতে লেখা 'স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তা এখানে তা এখানে।' রঙমহলও সুন্দরভাবে সাজানো। নানাভাবে চিত্রিত। শীসমহল-এর প্রতিটি কাচই

বিচিত্র। এখানে ঢুকতেই কেমন যেন ঘোর লেগে গেসলো আমার বিদ্যুৎদা ডেকে বললো আমায়, স্নানাগার বা বাগান দেখা হলো না আমার (পরে দেখেছি)। বিদ্যুৎদা আর আমি দুবাস থেকে সবকটি ব্যাগ নামিয়ে জমিতে রাখলাম। বিদ্যুৎদা টাকা দিয়ে রিসিট কপিতে ড্রাইভার-এর সই করিয়ে নিল। এখনও বিদ্যুৎদার ঘড়িতে ৫-৫৫ পার হয়নি। সামান্য পরেই সবাই চলে এল।

পার্সেল গেট দিয়ে সবাই ঢুকে পড়লাম। ১২-১৩ নং প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে কাট আউটে কোচ রেখেছে। শুধুমাত্র আমাদের কোচ। পুরোটাই আমাদের দখলে। একটাই সমস্যা রইল স্নানের জল। পানীয় জলের ট্যাংক কাছেই। ওরা একটা দড়িও টাঙ্গিয়েছে। মেয়েরা কেউ কেউ শাড়ি কেচে শুকোতে দিয়েছে। আমরা কজন চা পান শেষে একটা সিমেন্টের বেঞ্চে বসলাম। সিধুদা সেঁটে আছে আমার সাথে। বাচ্ছু বুড়ুও সঙ্গে তাদের মা। বুড়ু বললো, আকবরের গল্প শুনবো কাকা। বললাম, ওসব পরে হবে, এখন তোমরা আমায় মথুরা বৃন্দাবনের গল্প বলবে। জানো আমি যাইনি।

বৌদি বললো, বল্ বুড়ু, বুড়ু বললো, যা যা দেখেছি, তার নাম আমি লিখে রেখেছি – সব মনে নেই - তবে জানো তো কাকা মথুরায় সবচেয়ে বিখ্যাত হল কংসের কারাগার – এখানেই কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছেন। ভাবলাম কারাগারেই সূতিকাগৃহ ছিল ! নাকি কংস বোন, বোনাইকে কোন প্রাসাদে বন্দী করেছিল – সেখানে দেবকীর বাচ্ছা হয়। বুড়ু বললো, বিশাল এরিয়া - ফুলের বাগান আছে। মন্দিরের পাশেই – বেড়ার ওপারে মসজিদ আছে – তবে মনে হয় এখন সেখানে লোক যায় না। আওরঙ্গজেব লুঠ করেছিল পরে এখানে মসজিদ হয়। বৃটিশ আমলে হিন্দুরা আবার দখল নেয় – ওখান থেকে চলে যাই দ্বারকাধীশ মন্দিরে। এই মন্দিরটাই মনে হয় সবচেয়ে পুরোনো - এরও এরিয়া অনেকটা। সংগ্রহশালা আছে। খুব

জাগ্রত, নিত্য অনেক পুজো পান। ঠাকুরের মাথায় সোনার মুকুট।

এরপর দিদি তুই বল - দ্যাখ, এখানে ভুল বললে লজ্জা পাবার কিছু নেই - জাঁটী কাকা ঠিক করে দেবে। "আমি পড়েছি কিন্তু তোরা দেখেছিস - বল না বাচ্চু - ভয় পাবি না।" বৌদি বললেন, "বল না"। বাচ্চু একটু বড় হয়েছে। লজ্জা পাচ্ছে - তাছাড়া গতবছরেও দেখেছি কম কথা বলে। সে বললো, "অনেক মন্দির আছে- অনেক ছোট বড় মন্দির আছে। বহু বিধবা আছে প্রতিটি মন্দিরে - সব সময় কৃষ্ণ নাম জপ করছে - কোথাও বা চীৎকার করে কীর্তনও হচ্ছে। এক জায়গায় সবাই বললো 'সোনার তালগাছ।' পরে জানা গেল, সতী বুরুজ-এর নাম কোন রানীর স্মৃতিতে তৈরী। তারপর টাঙ্গা চলে এল বিশ্রামঘাট, কংসকে মেরে এখানে নাকি দুভাই বিশ্রাম নিয়েছিল। একজায়গায় নিয়ে গেল, বললো, "এটা কালীদহ - কালীয় দমন ক্ষেত্র - মূর্তিও আছে। সব শেষে দেখালো বস্ত্রহরণ ঘাট। এখানেও মূর্তি আছে। একটু থেমে লাজুক ভাবে বলল, "একদম ভালো লাগেনি ঈশকী বাজে।"

কিছুটা চুপচাপ থাকার পর সিধুদা বললো, "এবার তুমি কী পড়েছ বলো - বুঝিয়ে সহজ করে বলবে কিন্তু।" হাসলাম, বললাম, "আমিও তো সব জানি না, ঠিক না হতে পারে। শুনেছি, পড়েছি নানা কথা ভারতের - শুধু ভারতের কেন পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই 'পরের মুখে ঝাল খায়' 'কান শুনতে ধান শোনে।' 'শোনে এক বোঝে আর' - বুদ্ধিকম, খাটে-খায়, বড়দের মানে প্রমাণ চায় কম, ফলে নানা কাহিনী তৈরি হয়। বলে, কথা যোলো ধারায় বয়। তাই কৃষ্ণ রাম এরা কল্প কাহিনীর গল্পকথার মানুষ থেকে বাস্তব হয়ে গেছে। রাম বা কৃষ্ণ, শিব বা কালী এরা কেউই বাস্তব বা জীবন্ত মানুষ ছিল না। তাই তাদের জন্ম হয়নি কোনো জন্মস্থানে - মথুরাতে তো নয়ই। তাদের জন্ম হয়েছে কালি কলমে কোন তাল অথবা চীর পাতায়। তাদের একজনের জনক হচ্ছে বাল্মিকী একজনের হচ্ছে ব্যাসদেব। সেই কাহিনীকে সত্যতা দান করার জন্য ভক্তেরা এসব করেছে। গল্পে বলছে ১৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে কৃষ্ণ মথুরায় জন্মগ্রহণ করেছিল। ১৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে ভারতে লৌহযুগই

আসেনি - মানুষ দ্বিতল বাটী নির্মাণ কৌশল জানতো না - এমনকি আর্যরা তখনও যমুনা বেসিনে এসেছিল তার প্রমাণ নেই। সিধুদা আর বৌদি দুজনেই চুপ। বাচ্ছু আর বুড়ু মুখ চাওয়া চায়ি করছে।

এবার গল্প কথা বলি। মথুরা ছিল যমুনা নদীর পাড়ে। অন্য পাড়ে ছিল বৃন্দাবন। তখন নদীর পাড়ে স্বাভাবিক তৃণক্ষেত্র ছিল। সেখানে পশুপালন ছিল মূল জীবিকা - তবে মোষ ছিল কম, গরুই ছিল বেশী। কিছু কৃষি ক্ষেত্র ছিল - সেখানে কিছু কনক মানে গম হতো। এই দুধজাত এবং কৃষিজাত সম্পদ নিয়ে প্রায়ই লড়াই লাগতো এবং বুঝতেই পারছ - বেশিরভাগ লড়াই হতো মল্লযুদ্ধ। কিছুদিন এভাবে চলার পর সব দল মিলে ঠিক করে একজনকে শ্রেষ্ঠ মেনে নেয়। সেই শ্রেষ্ঠজন হল উগ্রসেন। সম্ভবতঃ মল্লযুদ্ধেই তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। তার ছেলে হল কংস। স্বাভাবিক কারণেই সে চাইত সেইই হবে পরবর্তী প্রধান। সে পিতার নিষেধ না মেনে পূর্ব দিকে যায় এবং অনার্য/শাসক জরাসন্ধের সঙ্গে পরিচিত ও তার দুই কন্যাকে বিবাহ করে এবং শ্বশুরের সাহায্যে ফিরে আসে মথুরায় - উগ্রসেনকে সরিয়ে প্রধান হয়ে বসে। এদিকে তার বোনের বিয়ে হয় বৃন্দাবনে বসুদেবের সঙ্গে। বৃন্দাবনেও বেশ কয়েকটি ঘরাণা ছিল। এই সময় জ্যোতিষী জানায় যে কংসের মৃত্যু হবে দেবকীনন্দনের হাতে। তখন ভারতে জ্যোতিষীকে খুব মানা হত। তাই কংস দেবকীকেই মেরে ফেলতে চায়। উগ্রসেন এবং বসুদেব বোঝায় - জাতককে মারলেই হবে। কংস তাতে রাজী হয়ে দেবকীকে বন্দী করে রাখে। এবং তোমরা সবাই বুঝতে পারছ, সেই বন্দী থাকা জায়গাটা কোন সুখদৃশ্য সুরম্য প্রাসাদ ছিল না।"

বিদ্যুৎদা এসে সভাভঙ্গ করে দিল - বললো, "চল, নবেন্দু ডাকছে।" "আচ্ছা পরে বলবো" বলে হাঁটা দিলাম। কোচে উঠে খেয়াল হলো দিল্লিতে আছি। এই এক মুস্কিল - ষ্টেশনে কোচে থাকলে খেয়ালই থাকে না কোথায় আছি। সব প্লাটফর্মই তো একরকম। গিয়ে বুঝলাম, ঝনঝাট পেকেছে চাঁদনী চক নিয়ে। দিদি, ঝর্ণা, নবেন্দু চাইছে কাতুকে (কাতু আমার বোনের নাম) কিছু টাকা দিই যাতে সে কিনতে পারে কিছু। ঝর্ণা তো বলেই বসলো "মেজদার (বিদ্যুৎদা) চাইতে তুমি বেশি কিপটে।"

বোঝালাম, এখানকার ASM বলেছেন, 'হরদোয়ারমে খরিদ কিজিয়ে ইধর সব চোট্টা হ্যায়।' কাতু কিছু বলছে না। ওরা নানান কথা বলতে থাকলো। শেষে বললাম, "কাতুকে কেনাকাটার জন্য ২৫ টাকা দেব, ভেবে রেখেছি - সে যদি চায় তো এখনই নিয়ে নিতে পারে।" কাতু নিতে রাজী হল না। নবেন্দু শেষে বললো। "হেরে গেলাম।" সে নাকি বলেছিল, আমি কিছুতেই টাকা দিতে রাজী হবো না।

রাতে পাশাপাশি শুয়ে বললাম, "মথুরা নিয়ে কিছু বল।" "তোরা দুজন তো লালকেল্লায় মোতি মসজিদ দেখলি না। সেটা আওরঙ্গজেবের তৈরী পুরোটা শ্বেত পাথরের, রাজপরিবারের লোক ছাড়া সে আমলে কেউ ঢুকতে পারতো না। আওরঙ্গজেব গোঁড়া মুসলমান ছিল।" "খুব ভাল জানি, একবার স্কুলের পরীক্ষায় মুঘল সম্রাটদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ছিলেন? এই প্রশ্নে আমি উত্তরে লিখেছিলাম আওরঙ্গজেব। হিন্দুদের পক্ষে। কেননা আওরঙ্গজেবের গোঁড়ামি, মৌলবাদী অত্যাচার শুরু করায় হিন্দু পুনরজাগরণ সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে আকবর হিন্দুর জাত মেরে হিন্দুধর্মে ক্ষয় এনে দেয়।" "বাবা, তুই স্কুল জীবনেই মৌলবাদ বুঝতিস" হাসলাম বললাম, "গুরু ছিল অচিন্ত্য ভট্টাচার্য্য। সে বন্ধু হলেও চার ক্লাশ উঁচুতে পড়তো।" যাক এখন মথুরায় কী দেখলি বল্! "কত যে মন্দির সব নাম মনে থাকে না - কেবল দ্বারকাধীশ মন্দিরের নাম মনে পড়ছে। বৃন্দাবন দেখাই হল না। সে নাকি নদীর ওপারে।" "হ্যাঁ, রাধার বাড়ি, নন্দ ঘোষের বাড়ি, গিরি গোবর্ধন, সংকেত কুঞ্জ। সবই নদীর ওপারে বলে পড়েছি। অনেক ভক্ত মথুরা বৃন্দাবন পদব্রজে প্রদক্ষিণ করে বলেও পড়েছি, মাঝে মাঝে ভাবি, কী মুখ্যু করে রেখেছে মানুষদের। এখনও এখানে কৃষ্ণের পদরেনু খোঁজে মানুষ, এখনও অমৃতের খোঁজে কোটি লোক গঙ্গায় স্নান করে কুম্ভ মেলায়।" "কিন্তু" "কিন্তু কিসের? বলবি, অনেকের জীবিকাও অর্জিত হয়, দানধ্যান হয়?" "না, না, ভাবছি। এ পারে তাহলে বস্ত্রহরণ ঘাট হলো কী করে?" হেসে বললাম "কেষ্ট কী কম লোকের বস্ত্রহরণ করেছে - পড়েছি ষোলোশো গোপিনী ছিল সবাই কেষ্ট বললে চিৎ।" নবেন্দু বললো, "এখানেও লিলুয়া চালাচ্ছিস খুড়ো?" থেমে গেলাম। (লিলুয়া = খিস্তি) লোকে মনেই রাখে না -

তখন নদী হিসাবে গঙ্গাকে চিনতো না আর্যরা তখন নদী বলতে সবাই (আর্যরা) সিন্ধুকে এবং তার উপনদীদের চিনতো। গঙ্গা অববাহিকায় আর্য সভ্যতার প্রবেশ অনেক পরে। ফলে গঙ্গায় অমৃত পড়তেই পারে না - এই গল্পটা পরে প্রচারিত। মনে মনে ভাবলাম। মিহিরকে কুম্ভ মেলার বিষয়ে জবাবটা দেওয়া হয়নি। ধর্মান্ধ হিন্দু ভারতবাসীদের নিয়ে কী বিশাল ধোকা চলছে কুম্ভমেলা নিয়ে। হর্ষবর্দ্ধন তো বৌদ্ধ ছিল। কে জানে কী গ্যাঁড়াকল। এই কবছর আগেই তো কুম্ভমেলায় জওহরলালের জেদে কত মানুষ মরলো! না এসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই। মিহির বামুন - সে এসব মানতেই চাইবে না। সবাই কংসের মতই বংশ পরম্পরায় সুবিধে চায় - 'অন্যদিকে সত্যকারের ব্রাহ্মণ হতে চায় না বা চেষ্টা করে না।' (গোরা - রবীন্দ্রনাথ)।

পরদিনটা গেল লিখে। জামা কাপড় কাচিনি। ওরা কে কী করেছে জানি না। শুধুই লিখেছি, মাঝে উঠে স্নানাদি ভোক্ষণ করেও লিখেছি। বিছানা তুলতে হয়নি। গাড়িতো চলছে না। স্নান করতে ওয়াটারিং লাইনে গেসলাম। কাল রাতে ছিল ডিমের কারী আর ভাত। আজ বড়ো মাছ এনেছে আশু, কুণ্ডুরা। বিদ্যুৎদা জানালো, "ওরা নিউ দিল্লি বাজার থেকে এনেছে।" কলম চালিয়েছি স্পিডে। দিনের আলো চলে যেতে লেখা থামালাম।

রাতে নবেন্দুকে বললাম, "কি দেখলি আজ?" "তুই সারাদিনে কী লিখলি।" "আগ্রা, মথুরা আর দিল্লির কথা।" "দিল্লির কথা? দেখেছিস - সব কটা মিউজিয়াম? ডলস মিউজিয়ামটা বিশেষ করে উচিত - জাপানী পুতুলের কালেকশন নাকি অপরূপ - দেবুদারা মাছ কিনতে গিয়ে দেখেছে বললো। জানলে যেতুম, আমরা চাঁদনী চক আর জুমা মসজিদ নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। ফিরে এসে চলে গেলাম কাচাকাচিতে। তোর বেশ সুবিধে পিসিকে দিয়ে কাচিয়ে নিতে পারবি। "না, তা আমি বাড়িতেও করিনা (এখনও না ১৯৩৩) যাক গে, জুমা মসজিদের কথা বল!" "এটা লাল ও শ্বেতপাথরের মিশ্রণে তৈরী সাজাহানের সময়ে করা। নামাজ পড়ার এত বড় চত্বর কোথাও দেখিনি। শুক্রবার ছাড়া অন্যদিন সবাই যেতে পারে। কতগুলো মেমছুঁড়িও ঘুরছিল, টপাটপ

ফটো তুলছিল। রাখাল আর তার বৌ দেবিকার একটা যুগল ফটো তুললো।" "তারা আবার কে?" "ন্যাকামি করিস না খুড়ো। তুই হলি যোগাযোগ রক্ষাকারী সবাইকে দেখেছিস - গণেশদার কাকার পুত্র আর পুত্রবধূ হলো রাখাল এবং দেবিকা। "বললাম, "হ্যাঁ মনে পড়েছে। দুজনেই বেশ সুন্দর-ফর্সাও আছে, রান্না ঘরের পাশের কিউবে আছে। তবে এখনো আলাপিত হইনি।"

কথাবার্তা থামতেও ঘুম এলো না। দ্বিতীয়রাতের কথাটা মনে পড়তেই শরীর গরম হয়ে গেল। পরে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলাম। গাঁয়ের মেয়ে শোয়ার অভ্যেস খারাপ-ওরকম হতেই পারে। পরদিনই রাখালকে বলেছি 'তোমায় আণ্ডারপ্যান্ট পরিয়ে শোয়াবে।' রাখাল লজ্জিত হলেও ব্যাপারটা সামলে নিয়েছে। দেবিকা আমায় লজ্জা পাচ্ছে - কথা বলছে না। না, এসব কথা নবেন্দুকে বলা যায় না। সে মনে হয়, দেবিকার রূপমুগ্ধ। খেয়াল করছে না কার্তিককে। কার্তিকও বুঝছে না। সে রাখালের চাইতে বেশি করে দেবিকার রক্ষক হয়ে গেছে। নো ডাউট, দেবিকা দৈহিকরূপে গাড়িতে বেষ্ট। তবু কাকের মত তা দেখতেই হবে। শিয়ালের মত মাচার তলায় হাঁ করে শুয়ে থাকা চলবে না।

ভোরেই হরিদ্বার। সুভাষ ডেকে নিল। সে বেশ চালু হয়ে উঠেছে। কোচ রেখেছে সাইড লাইনে। ট্রেন চলে গেছে দেরাদুনের উদ্দেশ্যে। এখনও সূর্য দেখা যাচ্ছে না। ঘুম চোখেই S M এর সঙ্গে দেখা করলাম। যাক্ বাবা খাস বাঙালী। সুভাষই কথাবার্তা বললো। সামান্য পরই পিলগ্রিম প্লাটফর্মে দেরাদুন এণে রেখে দেবেন। চোর চোট্টা নেই। ভিখারি নেই প্লাটফর্মে। কজন সন্ন্যাসী আসে যদি কিছু খাদ্যদ্রব্য মেলে। ইয়ার্ড দিয়ে যাবার রাস্তাও দেখিয়ে দিলেন তিনি। "স্টেশনের বেরুনোর পথে বাঁদিকে উত্তরে হরিদ্বার, ডানদিকে কনখল।"

স্টেশনে ফিরেই (কোচ প্লেসিং হয়ে গেসলো) নবেন্দু আর বিদ্যুৎদাকে রিপোর্ট করেই গামছা নিয়ে গঙ্গাস্নানে চলে গেলাম। কতদিন হয়ে গেল সাঁতার কাটিনি। সঙ্গে চললো সুভাষ। আশুর দাদা বৌদি আর বোন দীপালী সদ্য যৌবনপ্রাপ্তা। দক্ষিণেশ্বরের চালাক-চতুর মেয়ে কালো শক্তিশালী চেহারা। লোককে প্রশ্ন করে চলে গেলাম বিষ্ণু

ঘাটে। এখানে চেন আছে গঙ্গায়- বেড়া ঘেরা জায়গা আছে মেয়েদের জন্য - ঘেরা নয়, পুরুষরাও কেউ কেউ স্নান করছে সেখানে। ঘাটের ঠিক ওপরেই মকর বাহিনী গঙ্গার প্রস্তর মূর্তি আছে। কাছেই ভোলাগিরির সাধনাশ্রম (এখন এর পাশ দিয়েই ইন্দিরা সেতু হয়েছে।)

জলে প্রচণ্ড স্রোত। শুনেছি গঙ্গা এখানে দুভাগ হয়ে গেছে। ওই পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলেছে গঙ্গা। পাহাড়ের নাম চণ্ডী পাহাড়, মাথায় তার চণ্ডী মায়ের মন্দির। দুই গঙ্গার মধ্যিখানের চরে বড় বড় গাছ। সুভাষ কিছুটা সাঁতরে পাড়ে ফিরে গেল। আমি স্রোতের টানে অনেকটা ভেসে ওপারে গেলাম। কিছুটা হেঁটে আবার ওদের সামনে এলাম। এদের কয়েকজনের স্নান হয়ে গেছে। সুভাষ জলেতে দাঁড়িয়েই হাত নেড়ে বোঝালো যে সে আমায় খেয়াল করেছে। এপারে আসতে তবেই সে জল থেকে উঠলো। কাকচক্ষু জল। মাছ কিলবিল করছে। অথচ হরি দ্বারে নিরামিষ। উঠতে ইচ্ছা করছিল না। সুভাষের তাড়ায় উঠে পড়লাম।

একটা নালা নেমে এসেছে মনসা পাহাড় থেকে। সমতলে নেমে সেটা খালের রূপ নিয়েছে। তার উপর মেন রাস্তায় লোহার পোল - সেটা পেরিয়েছি স্নানে আসার পথে। এখন উঠে দেখি কাছেই একটা কাঠের সেতুও আছে। হয়তো এদিকের বাসিন্দাদের যাতায়াতের জন্য। (এখন মকর বাহিনী গঙ্গা মূর্তি এবং সেই সেতুর মাঝখান দিয়েই ইন্দিরা সেতুর শুরু) - যাই হোক, বাসুদার কথামত পুরাতন চেনা পথেই ফিরলাম। বেশ অনেকটা পথ। ইয়ার্ডের পথেই ফিরলাম। কাছেই বেশ কটি দোকান। রাস্তার অন্য পারে কয়েকটি ধর্মশালা।

ফিরেই টিফিন সারলাম। দুপুরেই কনখল যাওয়া হবে, ফলে এখন হয়েছে হাল্কা টিফিন - চিঁড়ে, বাদামভাজা ও সুজি। চাও পেলাম। মনার (প্রদীপ) জায়গায় বসে লিখতে শুরু করে দিলাম। ওরা টিফিন সেরেই চলে গেছে হর কী পৈড়ি বা ব্রহ্মকুণ্ডে। সেখানেই বর্তমানে মূল মন্দির - মেয়েদের জন্য পৃথক স্নানাগার আছে। যাক্ গে, এখানে তিনদিন থাকবো - হিন্দুদের অন্যতম তীর্থস্থান। কেউ বলে হরিদ্বার - বিষ্ণুভক্তরা ভাবে এটা হরি বা বিষ্ণুর ক্ষেত্র। কেউ বা, বিশেষতঃ শৈবরা বলে

হরদুয়ার। আসলে তো গঙ্গাদ্বার। সমতলভূমিতে গঙ্গার অবতরণ ক্ষেত্র। শুনেছি, সেই অবতরণ ক্ষেত্রের নিকটেই আছে সপ্তর্ষি আশ্রম। সপ্তর্ষিই প্রথম অগ্নিকে সর্বসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন। বিনা পারিশ্রমিকে যে কেউ অগ্নিগ্রহণ করতে পার তো তাঁদের অগ্নি কুণ্ড থেকে। সভ্যতার আদিযুগে অগ্নি ছিল সম্পদ - যে তার ব্যবহার জানতো, সে তার বিনিময়ে অন্যের কাছে ফলমূলাদি, শিকারে প্রাপ্ত মাংসের ভাগ নিত। সপ্তর্ষিরা তা চাইতেন না। তাঁদের অগ্নিকুণ্ড ছিল সর্বসাধারণের জন্য অবারিত। তাই তাঁরা সাধারণ্যে বিশাল প্রচার পান। আজও নাকি সেই অগ্নি কুণ্ডকে চিরজ্বলন্ত করে রাখা আছে। খুব দেখার আগ্রহ আছে। আজকাল কত জনকে 'ষ্টার' বলে, সিনেমা ষ্টার, ষ্টার প্লেয়ার - কিন্তু তখনকার দিনে সেই পুরাকালেই এই ঋষিদের নামেই নক্ষত্র নাম দেওয়া হয়েছিল। সপ্তর্ষির সাতঋষি এখন এক বিশিষ্ট নক্ষত্রমণ্ডলী - সপ্তর্ষি। কী অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। ভ্রমণে এসে এসব না জানলে একটা সত্য তো অজানাই থেকে যেত - আগুন ছিল তৎকালীন একমাত্র সম্পদ - এবং সেই আগুনই এখনো সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। আগুনই সভ্যতার অগ্রদূত।

ওরা এসে গেল স্নান সেরে। লেখা বন্ধ করে উঠে পড়তে হল। বাইরে বের হয়ে দেখি, নবেন্দু বিদ্যুতের সঙ্গে স্থানীয় মানুষ কথা বলছে। কাছে এগিয়ে দেখি, লছমন শর্মা। এই লোকটা আমাদের পাড়ায় শীতকালে যেত - কাঁধে চাদর, কম্বল নিয়ে ফেরী করতো - মাঝে মধ্যে আমাদের বাড়ির উঠোনেই বসতো। কে জানে সেই লোকটা কিনা, পরখ করতে প্রশ্ন করলাম, "লছমন চাচা - চিনতে পারো?" সে বললো, "চার পাঁচ সাল হোগা, বাঙালমে নেহি গ্যায়া - মালুম হোতা, খোকাবাবু তুমকো উত্তরপাড়ামে দেখা।" চমৎকৃত হলাম। বললাম, "হ্যাঁ ঠিকহি বতায়া - আবিভি কম্বল বিকাতা?" "লেড়কাকে লিয়ে একঠো দুকান বানায়া হরকী পাউরী ঘাটকা নজদিগ। সামকো আইয়ে, দেখিয়ে - বাবু লোগকা এহি বোল্‌তা।" বললাম, "ঠিক হায়, যায়েগা, পছন্দ হোগা তো খরিদ করেগা।" "হাঁ এহি তো সাচ বাৎ - পাক্কা বাৎ।"

নবেন্দু আর বিদ্যুৎদা সুভাষের ডেকে আনা S. M এর সঙ্গে চলে

গেল টাঙ্গার ব্যবস্থা করতো। সবাই আজ যাবে না। যদিও S. M সপরিবারে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। খাদ্য গ্রহণকালে বলেছেন, "হরিদ্বারে চোর ছ্যাচর নেই - ভিখিরি আছে। না চেয়ে কেউ কিছু নেয় না।" তবুও যেহেতু তিনদিন সময় আছে তাই সবাই নিজ সুবিধামত ভ্রমণে যাবে। নবেন্দুর ইচ্ছা আজই হরিদ্বার কনখল দেখে নেবার। কাল সকালে চণ্ডীপাহাড়, বিকালে মনসা পাহাড় - তৃতীয় দিনে সবাই একসঙ্গে হৃষিকেশ যাওয়া হবে। গণেশদার কাকা (এবার থেকে রাখালের বাবা লিখবো) চাইছিলেন তিনি সপরিবারে এখানের ধর্মশালায় থাকবেন - হৃষিকেশ, দেরাদুন, মুসৌরী যাবেন না। রাখাল তাতে নারাজ হয়। অনেকক্ষণ ঝগড়া হয়। শেষ পর্যন্ত রাখালই জয়ী হয়। এ ব্যাপারটা আমার শোনা।

এখন দেখি, দেবিকাও আমাদের সঙ্গে যাবে বলে সেজেগুজে রেডি। ছায়ার (সুশীল মিত্রের সদ্য বিবাহিত পত্নী) সঙ্গে খুব কথা বলছে। দুজনেই নতুন বৌ, ভাব হয়ে গেছে। ভাবলাম, সুশীল মনার বন্ধু সহকর্মী নাম করা স্কাউট, স্বাস্থ্যবান কর্মঠ যুবক। ছায়ার সঙ্গে এখনও ভাল করে পরিচয় হয়নি। এই ভিড়ের গাড়িতে কী হানিমুন হয়? এ ডিসিশনটা ওদের ভুলভাবে নেওয়া হয়েছে। মধুচন্দ্রিমার জন্যে 'মহাবলীপুরম' যেতে পারতো। এখানে মিলনে কত বাধা। টাঙ্গা হয়েছে গোটা আটেক। আমি, মনা, সুশীল আর ছায়া। চলতে চলতেই পরিচয় পর্ব শেষ। লিলুয়ার শ্রমিক আমরা। দ্রুতই শ্লীলতার (ভাষায়) পতন ঘটে গেল এবং সবাই সহজ হয়ে গেলাম। বুঝে নিলাম, ছায়া বেশ চালাকচতুর আছে। সুযোগ সুবিধামতো সুশীলকে সব পাইয়ে দিচ্ছে। একটু লাজুক ভাব অবশ্য বিদ্যমান।

টাঙ্গা থামলো, সিদ্ধবকুল দেখালো, গাছটি নাকি সুপ্রাচীন। শুনেছি, বকুলগাছ অনেক দিন বেশি বাঁচে। এটি আরো বেশিদিন বেঁচে আছে। পাশে গঙ্গা। ছোট্ট আশ্রম (পরে ১৯৩৩-এ দেখেছি আশ্রম বড় হয়ে গেছে)। আমার শরীর মন ভাল লাগছিল না। কেমন যেন জ্বর জ্বর ভাব এসে গেল। গঙ্গায় অতক্ষণ সাঁতার কাটাটা ঠিক হয়নি? - যাক্ , চুপচাপ টাঙ্গাতেই বসে রইলাম। নানা আশ্রম দেখে শেষকালে এল দক্ষ মন্দিরে।

তখন নামলাম। শরীরের জড়তা কিছুটা হলেও কমেছে। তবু সিঁড়িতেই বসে থাকলাম। মন্দিরের গায়ে নাকি অর্ধক্ষোদিত ভাস্কর্যে দক্ষযজ্ঞ কাহিনী চিত্রিত আছে। মন্দিরে আছে ছাগমুণ্ড ধারী দক্ষের মূর্তি। (পরে এখানকার আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে ও রামকৃষ্ণ মিশনে বার তিনেক এলেও কখনও দক্ষ মন্দিরে ঢুকিনি।) ফেরার পথে ষ্টেশনের কাছে টাঙ্গা থামিয়ে সকলকে জানিয়ে নেমে পড়লাম। কাতুকে কিছুটা বোঝাতে হল। (পরে বেশ কয়েকবার পবনধাম, ভারতমাতা মন্দির, ভীমগোড়া দেখেছি - সপ্তর্ষিতে পায়ে হেঁটেও গেছি।)

নবেন্দু বলেছিল, ব্রহ্মকুণ্ডে সন্ধ্যায় গঙ্গাপূজা দেখে ফিরবে। সে কথা জেনে সবাই চলে গেল। বন্ধ কোচে একা আমি। সঙ্গে বিদ্যুৎদার সমস্ত কালেকটেড টাকা। খুব ভয় করছিল - তবু সময় কেটে গেল। ওরা ফিরলো প্রায় রাত আটটায়। মনা বাইরে থেকে রুটি কিনে এনে দিল আমায়। রাতে শুয়ে নবেন্দু বললো, "তুই গেলি না" "আবার আসবো, তখন দেখবো।" "কাল সকালের প্রোগ্রামে" - "যাবো না, কাতুকে নিয়ে যাস।" "পিসি তো যেতে চাইছে না।" "বুঝিয়ে বলবি।" সকালে উঠে দেখি গাড়ি ফাঁকা প্রায়। কানাইদা বললো, "তুমি অঘোরে ঘুমুচ্ছ দেখে ওরা ডাকেনি।" অনুভব করলাম রাসটাস্ক ৩০ খুব কাজ দিয়েছে। শরীর একেবারে ফিট। ভাবলাম চলে যাই। বেরুতে গিয়ে সঙ্গী জুটে গেল - শচীন ব্যানার্জী। জনাইয়ের যুবক, আশুদের ব্যাচমেন্ট। বললো, "জাটীদা সঙ্গে নিন। আশুরা না ডেকে চলে গেছে।" এর দাদা রতনদা উপেনদার সঙ্গে ওয়াগন লেটারে কাজ করে - খুব নিরীহ ভাল মানুষ, বলেছিল বাবুলালকে (শচীনের ডাকনাম) দেখো একটু। ফলে সঙ্গে নিতে রাজী হলাম।

দুজনেই স্নানের পোষাক পরেছি - লুঙ্গি গামছা। ট্যাকে রয়েছে নস্যির ডিবে রুমাল ছাড়াও দুটাকার খুচরো। নদী পার হতে হবে নৌকায়। তাছাড়া কথা আছে - "আহাম্মক এক, যে খালি রাখে ট্যাক। কাঠের সেতু দিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে চললাম দ্রুত পায়ে। এক সাধু হাত বাড়িয়ে পারানি নৌকা ঘাটের নির্দেশ দিয়েছেন। পারানি ঘাটে এসে দেখি, নীলগঙ্গা বেশ চওড়া। তীর ঘন বনাচ্ছন্ন। যাই হোক, মাঝি দু আনা

পয়সার বিনিময়ে দুজন মাত্র সবারী নিয়ে ওপারে পৌঁছে দিল। সে জানালো, আমাদের দল দুবারে গেছে - শেষদল গেছে মাত্র আধঘন্টা আগে। ফলে, ওদের ধরে ফেলবো বলে মনে করলাম। জঙ্গল পেরিয়ে রাস্তায় এসে দ্বিধায় পড়ে গেলাম। বাঁদিকে যাবো না ডানদিকে? জনহীন পথ। কাকে প্রশ্ন করি? বাঁ হাতি চলতে থাকলাম। পথ ক্রমশ উঠছে। পথের দুধারে জঙ্গল বাড়ছে। কিছুক্ষণ পরে শচীন বললো, "জাটীদা, আমরা মনে হয় ভুল পথে চলছি।" বললাম, "পাহাড়ী পথ ঘুরে ঘুরেই উঠে।" এমন সময় একটা লোককে দেখা গেল - অদ্ভুত তার পোষাক - বুকে, বাহুতে বর্ম পরা, কাঁধে চকচকে এক কুঠার। প্রশ্ন করল - "কিধর চলতা?" খুব ভয় পেলাম - গম্ভীর তার কণ্ঠস্বর। বললাম, "চণ্ডী পাহাড়।" "গলৎ রাস্তা পকড়া ইয়ে চিলা যানেকা রাস্তা - চলিয়ে সিধা উল্‌টা।"

খুব ভয় পেয়ে গেলাম। অতটা ভীতু নই -তবু সমস্ত পরিবেশটা যেন ভয়ে কন্টকিত। শচীনও কথা বলছে না - সে লোকটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটছে। এখন তো নীচের দিকে হাঁটছি - দমে লাগছে না। হঠাৎ একটা বাঁকের মুখে সে মুখে আঙুল দিয়ে শব্দ করতে বারণ করে আমাদের নিয়ে ঢুকে পড়লো পথের ধারের এক বাঁশ ঝাড়ে। কুড়ুলটা বাগিয়ে দাঁড়ালো। ভাবলাম, এবার কাটবে। কথা বলতে যাচ্ছি এমন সময় সে মৃদুস্বরে বললো - "চুপ-হাঁথি"। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশে মন পালটে গেল - এক অভিনব দৃশ্য দেখে। হাতীর দল রাস্তা পার হচ্ছে। আবার ভয়ও লাগছে। যদি গন্ধ পেয়ে ধেয়ে আসে। দাঁতাল বড় হাতিটা দাঁড়িয়ে আছে। আটটা হাতী পার হলো - গুনলাম তার মধ্যে দুটি তরুণ হাতীর দাঁত আছে। মনে ভাবলাম, বাকী পাঁচটা মাকনা মানে হস্তিনী। শেষকালে এল একটা বাচ্ছা হাতি পিছনেই সম্ভবতঃ তার গর্ভধারিনী। হাতির দল অন্তর্হিত হতে লোকটা নির্বাক আমাদের বললো, "চলিয়ে।" আড়ষ্ট ভাব কাটিয়ে হাঁটা দিলাম। বুঝলাম, বৃথাই ভয় পাচ্ছিলাম লোকটাকে। সে আমাদের উপকারী বন্ধু। ঘাটের কাছে এসে বললো, "সিধা উপর চলা যাইয়ে - চণ্ডী মাঈকা মনদিল"। বলে নিজেই চলে গেল। শচীন বললো, "প্রায় আড়াই ঘন্টা পেছিয়ে আছি - ওরা

হয়তো ফিরে চলে গেছে।" হেসে বললাম, "ভয়ে তোর সময়জ্ঞান ঠিক নেই বড়োজোর দেড় ঘন্টা পেছিয়ে আছি। ওরা এখনো নামেনি, চল কিছুটা তো উঠি।" শচীন একটা বড় গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিল, ঘন তার ছায়া, বললো, "চলুন তবে।"

সামান্য উঠতেই একটা চায়ের দোকান। ছোট্ট তার আয়োজন। দীর্ণ তার দোকান - তবু তা মরুভূমিতে মরুদ্যানের মতো। মন আনন্দে ভরে গেল। তাড়াতাড়ি করে তাকে দুটো চা করতে বললাম। শচীন জল খেল এক ভাঁড়। প্রশ্ন করে জানা গেল বড় দল নামেনি। চা শেষ না হতেই আশু এসে গেল। শচীন বললো, বুনো হাতি দেখেছি, দশ হাতের মধ্যে।" ওরা অনেকে নেমে এসেছে। সবাই কলবল করে কথা বলতে শুরু করে দিল। কয়েকজন চা খেল। বিদ্যুৎদা বললো, "এতক্ষণে এলে?" নবেন্দু বললো, "রাত্রেও বললি-যাবো না।" "শোন, আমি চট করে ঘুরে আসি তোরা এগিয়ে যা।" "না পরে তো আসবোই কাল নিজেই বলেছিস তখন দেখে নিস।" (পরে আবার হরিদ্বার এসেছি ততবারই এসেছি একবার চিলাগ্রামেও গেছি - এখন চণ্ডীপাহাড়েও রোপওয়ে হয়ে গেছে-উঠিনি অবশ্য)।

পারানি ঘাটে এলাম। এক নৌকায় সবাই ধরবে না। দিদি (মনার), ঝর্ণা, কাতু, ছায়া, কালিদার বৌ - সবাই নানা অনুযোগ করলো। শচীন চলে গেছে প্রথম নৌকায়। সে মনে হয়, নানা কথা বানিয়ে বলেছে। নবেন্দু বললো, "ভয় পাসনি?" হেসে বললাম, "হাতিদের ভয় পাইনি - অনেকটাই দুরে ছিল তারা - হয়তো জলকেলী করতে নদীতে নামে প্রতিদিনই। চা ওলা তো তাই বললো। এত দিনেও কেউ এ পাহাড়ে বন্যজন্তুর কবলে পড়ে হতাহত হয়নি। সন্ন্যাসী থাকে এই পাহাড়ের গুহায় - পূজারী ব্রাহ্মণ থাকে সপরিবারে।" দিদি বললো, "তাহলেও কাতুকে বকাটা ঠিক হয়নি।" "সে সময় মাথা গরম হয়ে গেসলো - শচীনটা আচ্ছা গুলবাজ - সে হয়তো ভয় পেয়েছিল হাতিদের আমি ভয় পাচ্ছিলাম ওই দানবের মত আকৃতির লোকটাকে।" দেবিকা বললো, "অথচ ওই লোকটাই আপনাদের বাঁচালো?" "ধন্যবাদ - হ্যাঁ স্বীকার করছি বাইরে থেকে কোন মানুষকে চেনা যায় না। কাতু ভুল করেছি -

না ভুল নয় অন্যায়ই করেছি - স্বীকার করে নিচ্ছি তখন অন্যায় করেছি।" দেবিকা আর দিদি হেসে বললো, "ধন্যবাদ।"

ওপারে এসে বিষ্ণু ঘাটেই স্নান সেরে নিলাম। ওরা সকলে চলে গেল। শচীন কী করেছে জানা গেল না। গাড়িতে ফিরে দেখি সকলেই টিফিন খাচ্ছে - আমি লুচি হয়েছে দেখে জানলাম, "দুপুরে আর খাবো না" বলে বেশ কয়েকখানা লুচি খেয়ে নিলাম। লিখতে বসলাম বাইরে এক গাছের তলায় সিমেন্টের বেদীতে। কিন্তু দেবিকার চিন্তাটা মন থেকে তাড়াতে সময় নিল। লেখা এগুলোনা। এসে গেল বাচ্ছাগুলো। বাচ্ছু, বুড়ু, লালটু, বুলটু, কেঁচো আর দেবাশিসকে কোলে নিয়ে মঞ্জু (অখিলের বৌ) ফলে খাতা পেন (ফাউন্টেন পেন - তখন এসব ডট বা জেলের যুগ আসেনি।) গুটিয়ে সোজা হয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলতে থাকলাম।

এরা সবাই চণ্ডী পাহাড় গেসলো। উপরে উঠে চণ্ডী মাকে দর্শন করেছে। পূজারী তখনও ছিল না। "একটা কালীঠাকুরের মত ছোট্ট মন্দির - আর একটা বড় কাঁসারের ঘটি-জল ভর্তি" জানালো বুড়ু। লালটু জানালো, "একটা বুনো জানোয়ার ছিল - শেয়ালের মত দেখতে। বড়রা বললো নেকড়ে হতে পারে।" কেঁচো হেসে বললো, "নেকড়ে না ঘেঁচু শিয়ালই" - "কতগুলো বেজি দেখেছি, মন্দিরের কাছে - কাউকে ভয় পাচ্ছিল না।" মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে বললাম, "অখিল কোথায় গেল?" "সব কিছু বলে যায় নাকি?" বেশ ফুটফুটে ছোট্টখাট শীর্ণা - ছোট্ট একটা মা - খুব মিষ্টি দেখতে এখন ঝংকার শুনে বললাম, "রাগ হয়েছে নাকি?" "আমাদের কথা মনে আছে নাকি? কেবলি দোকান বাজার যাচ্ছে।" হেসে বললাম, "আমরা আর কদিন, অখিল সুভাষরাই তো পরে দল চালাবে - সব কাজ শিখে নিতে দে ভাই।" বুড়ু বল্লো, "কাতু পিসিও কাঁদছিল বলছিল আর আসবোনা সেজদার সঙ্গে। (এই কথাগুলো - অখিল সুভাষই চরৈবেতী চালাত, আর কাতু কোন দিন আমার সঙ্গে ভ্রমণ করেনি পরে সত্য হয়েছিল।)

ঘন্টাখানেক পরে ওরা চলে যেতে কিছুটা লিখলাম। রোদের তাপ বাড়ছে দেখে কিছুটা সরে বসলাম। সকালের আবহাওয়াটা থাকে

বেশ মনোরম-স্নিগ্ধ শীতল। দুপুরে কাল দেখেছি বেশ গরম। রাত ও ঠাণ্ডা। ভালই ঘুম হয়েছে। দিল্লি দর্শন পর্যন্ত লিখে ফেলেছি।

খেয়ে দেয়ে সবাই একটু ঢুলে নিল। নবেন্দু আর আমি বসলাম প্লাটফর্মে সেডের তলার বেঞ্চিতে। নবেন্দু বললো, "খুড়ো - রাগ কমা - শোন- আজ বিকালেই মনসা পাহাড় দেখে নেব। সন্ধ্যায় উলের বাজারে কেনাকাটা করবো। কাল সকাল ৯ টার মধ্যে ভাণ্ডারা সেরে নেব। ১০ টায় ষ্টার্ট করে হৃষিকেশ লছমনঝুলা দেখে ৫টায় ফিরে আসব। রাত ১০ টায় গাড়ি। নো প্রবলেম।" চুপ করে শুনে প্রশ্ন করলাম, "ভাণ্ডারা? অত টাকা কোথায়?" "ষ্টেশন মাষ্টার বলেছেন, পুরো দায়িত্ব নেবেন - সব স্টাফ খেটে দেবে - ২০০ জনের বেশি লোক আসবেন না - টাকা? গোপাল কাকা, রাখালের বাবা দুশো টাকা, সিধুদা একশো টাকা অলরেডি বিদ্যুৎকে দিয়ে দিয়েছে। দেবুদা বলেছে - আরো যদি লাগে তবে সে দেবে। অখিল সুভাষ, আশু কুণ্ডু সবাই রাজী।" হাসলো। বললাম, "এত সব হলো, করলি - আমি কিছু জানলাম না - অথচ আমি হলাম যোগাযোগ রক্ষাকারী।" মুখে হাসি দেখে নবেন্দু বললো, "তুই তো বলতিস -ভণ্ড সাধুদের খাওয়াবো না।" হেসেই বললাম, "তাতে তো বলতামই। জানিস তো এই সব সন্ন্যাসীদের দেখলেই রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গের জ্যাঠামশাইকে মনে পড়ে। তিনি বলতেন, এরা সংসারত্যাগী নয়, সংসার এদের যোগ্যতাহীন বলে তাড়িয়ে দেয়' - এদের মধ্যে কজন আছে বলতো, যে ছিল সিদ্ধার্থের মত রাজকুমার। যে সব পেয়েছির দেশ থেকে চলে এসেছে। সব ব্যর্থতার জ্বালা নিয়ে সন্ন্যাসীর ভেক ধরেছে। সুযোগ পেলেই, পয়সার গন্ধ পেলেই চলে যাবে, আশ্রম বানিয়ে মহারাজ বনে যাবে - আর পরকে, নিজেকেও ঠকাবে।" - নবেন্দু বললো, "থাম্-সবাই ধর্মভীরু মানুষ আমরা - সবাই তোর মত চিন্তাশীল নয়। আর চতুরঙ্গ ভালোভাবে পড়লেই বুঝতে পারবি - জ্যাঠামশাইও শেষ পর্যন্ত ধর্মভীরুদের নিয়েই কাজ কারবার করতো।" "সেটা ঠিকই বলেছিস, সংখ্যায় এরাই বেশি। সংসারে থাকতে গেলে এদের নিয়েই চলতে হবে।"

প্রায় সবাই চলেছে। কয়েকজন বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে নিয়ে কানাইদা কোচে

রয়ে গেল। আমি রয়েছি একা, সবচেয়ে পিছনে। রাস্তা ধরে চলতে চলতে খাল পেরিয়েই জমিতে নেমে পড়লাম। ষ্টেশন থেকেও নামা যেত, কিন্তু খালটা কেমন হবে বুঝতে পারিনি। এখানে পথ হারাবার কোন ভয় নেই - শীর্ষদেশের মন্দির দেখা যায়। লোকে মনসা পাহাড় বললেও শুনেছি, এর নাম বিল্ব পর্বত - চণ্ডীপাহাড়ের নাম নীল পাহাড়। পথ নেই - কিন্তু পথ দেখা যাচ্ছে - দলের কজনকে চেনাও যাচ্ছে। কিছুটা পরই ওদের কাছে এসে গেলাম। দেখি শচীন দাঁড়িয়ে। প্রশ্ন করলাম, "কী হল দাঁড়ালি কেন?" "আপনাকে দেখে, জানেন তো, আশু বলছে, ওরা নাকি নেকড়ে বাঘ দেখেছে।" "তুইও তো হেভি গুল মেরেছিস - তারজন্য কাতু কাঁদছিল।" "গল্প বললে সামান্য গুল তো দিতেই হয়।" "এটা কি গল্প? হাতির দল, সেই কুড়ুল ধরা লোকটা?" "না, তবে, একটু বাড়াতে গিয়ে -" "আশুর কেসেও তাই ভেবে নে। তবে এটা ঠিকই যে ওরা একটা বন্যজন্তু দেখেছিল- তা নেকড়েও হতে পারে, হায়নাও হতে পাবে, শিয়ালও হতে পারে। পড়েও এসেছি। নীল পাহাড়ের জঙ্গলে হাতি, বাঘ, চিতা, নেকড়ে, হায়না, সাপ প্রভৃতি জন্তুও আছে। স্বভাবতঃ এরা মানুষকে এড়িয়ে চলে - তবে নীল গঙ্গায় হাতিদের জলকৈলী অনেকেই দেখেছে। মনে হয়, তেমনই কোন দলকে আমবা দেখেছি। মোটেই তারা বাঁশঝাড়ের কাছে চলে আসেনি।" শচীন মাথা চুলকে বললো, "বানাতে গিয়ে -"

কিছুটা পথ গিয়ে পাকদণ্ডীতে নেমে পড়লাম দুজনে। দলের সবাই অনেকটা এগিয়ে গেছে। স্পীড বাড়ালাম। শচীনও হাঁফাচ্ছে। শেষধাপে উঠে পড়লাম। ওরা জয়ধ্বনি করে জানাল - মন্দিরের সামনে চলে গেছে। শচীন কিছু না বলে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। আমি ওদের কাছে চলে গেলাম। বাঃ সবাই খুব খুশি মনে। বিশেষ হাঁপায়নি কেউ। এই পাহাড়ের গায়েও গাছপালা আছে - তবে জঙ্গল বলা যায় না। প্রায় সবাই কিছু করে খুচরো পয়সা দিল মনসা মন্দিরে। পাশেই দুটি ছোট্ট ছোট্ট মন্দির। মন্দিরে কী মূর্তি আছে জানি না। মনে হচ্ছে, পাহাড়ে সাপ আছে - তাই মনসা মন্দির এত পুজো পায়। নবেন্দু বললো, "উল্টো পথে নামবো একেবারে ব্রহ্মকুণ্ডের সামনে - হরকী পৌঁড়ির

ঘাটে।" বাব্‌রা, গঙ্গার নামের সঙ্গে ব্রহ্মার নামও যোগ করে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব তিন দেবতাকেই জুড়ে দিয়েছে।

পথে ছাইয়ের প্রাবল্য। একজন গেরুয়াধারী যাচ্ছিলেন। কথা বলায় বোঝা গেল বাঙালী বলে। বললেন, "পাহাড়টা মরে যাচ্ছে।" বললাম, "পাহাড়তো মৃতই - জড় বস্তু!" বললেন - "ইঁট তো জড় - নোনা ধরে গেলে গুড়ো হয়ে যায় - তখন ইঁটটা মরে যায়। এই পাহাড়ের পাথরগুলো গুড়ো হয়ে যাচ্ছে।" কিছুক্ষণ কথা বন্ধ করে ধীর পদে নামলাম। নীচের দিকে ছাই কম। প্রশ্ন করলাম, "আপনি কী সন্ন্যাসী?" আশ্রমের প্রথামত শ্বেতাম্বর ত্যাগ করে গেরুয়া ধারণ করেছি - সন্ন্যাসী হওয়া সোজা নয়।" "কেমন করে এখানে জুটলেন?" সবাই এ প্রশ্নে বিরক্ত হলেও তিনি বললেন, "পূর্বাশ্রমকে ভুলে থাকাই বিধেয়।" দ্রুত পদে নেমে গেলেন।

নীচে নেমেই কটা খুচরো নোট আমার হাতে দিয়ে সমস্ত পোষাক পরেই শচীন জলে নেমে গেল। সবাই বিস্মিত হল। গুরুপদ গামছা পরে তাকে সঙ্গ দিল। স্নান শেষে টাকা নিয়ে ওরা দুজন টাঙ্গায় চেপে ষ্টেশনে চলে গেল। নদীর পাড়ে কজন মাটির বড় বড় জালায় তৈরি করে রাখা জলজিরা বিক্রি করছে। জনসমাগম ভালোই। দু-পয়সা গ্লাস। অনেকেই পান করছে। আমাদের মধ্যেও কেউ কেউ পান করলো। কজন অন্যদের দেখে প্রদীপও ভাসালো। (মনে রাখতে হবে - তখন হরকী প্যারীর ঘাট এখনকার মত সাজানো ছিল না। ঘড়ি বসানো ওই দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে পরে। গঙ্গার ওপারও বাধানো ছিল না - সেতু ছিল একটাই - বাজারের কাছে।)

ঘাটের শেষেই পশম বাজার/উল মার্কেট। প্রথম দোকানটাই (বর্তমানে সম্ভবতঃ তৃতীয়) লছমনের। সে হাতজোড় করে সবাইকে আহ্বান করলো। কোন রকমে ছাউনি দিয়ে সালের খুঁটি দিয়ে তার দোকান। খাতা বার করে বাঙালী খদ্দেরদের হাতের লেখা দেখাল। (এখন হয়তো অনেককে আমার হাতের লেখাও দেখায়)। হরিদ্বারের বিখ্যাত লুইয়ের চাদর, পশমের চাদর, কম্বল প্রভৃতি দেখালো। কজন কিনলো পছন্দ করে। আমি নিজে একশো টাকায় চারটে গরমের চাদর

কিনলাম। চার ভাই আমরা। কাতু জানালো, সে লক্ষ্ণৌয়ে চিকনের কাজ কিনবে। ২৫ টাকা দিয়ে দিলাম।

হেঁটেই ফিরলাম বাজারের মধ্য দিয়ে। প্যাঁড়া, বরফি, ক্ষীর দেখে জিভে জল এলেও লোভ সম্বরণ করলাম (কেউই কেনেনি দলের) - সবজি মার্কেট এল। ভোলাগিরি আশ্রম এল। তার তলায় বিক্রান্ত ট্র্যাভেলসের দোকান দেখিয়ে অখিল জানালো, "আমি আর কুণ্ডু এসে এখান থেকেই বাসের ব্যবস্থা করেছি।" কুণ্ডু আর দেবুদা ওদের দোকানে ঢুকে গেল। ফিরে এসে নবেন্দুকে বললো, "ওরা ঠিক ৯ টায় বাস দুটো লাগিয়ে দেবে।" নবেন্দু বললো, "বাসের নম্বর নিয়ে আয়, নইলে চিনবো কী করে? দেবুদা হেসে বললো, "নাম্বার দিয়েছে - তাছাড়া ও নিজেও থাকবে।"

ষ্টেশনে ফিরে চা বিস্কুট খেয়ে ওরা সব কেনা কাটা করতে গেল। সকালেই ভাণ্ডারা - সে তো মহাভোজ! যাক্ বাবা আমি ওর মধ্যে নেই। বসে রইলাম গাছ তলার বেদীতে। রান্নার দিকে সবাই রয়েছে ভিড় করে। পরিস্কার ঝকমক করছে প্লাটফর্ম। তাতে শতরঞ্জি বিছিয়ে কজন মহিলা সম্ভবতঃ আলু কাটছেন, কয়েকজন মনে হয় ময়দা মাখছে। রাত্রে ভাত হবে, সারাদিন লুচি খেয়ে আছি। রাত্রে তো ভাত খাই না - বাইরে থেকে রুটি কিনে আনি, আজ খাবো ভাত, কালও দুপুরে লুচি। বসে বসে আবোল তাবোল ভাবছি। অস্বীকার করতে পারছি না, দেবিকার রূপ একটা ঘোর লাগিয়ে দিয়েছে।

শচীন এসে বসলো পাশে। ওকে ওর আকস্মিক স্নানের কথা প্রশ্ন করলাম, "তখন কী পায়খানা করেছিলি তাই জামা কাপড় সমেত জলে নেমে পড়লি?" শচীন বললো, "সবাইকে তো তাই বলেছি - কিন্তু জাটীদা আমার শরীর এখনো কাঁপছে।" "জ্বর হয়ে গেলো নাকি - চল তবে ব্রায়োনিয়া খেয়ে নে।" "দূর জ্বর হবে কেনো - শোনো না - পায়খানা গেলাম তো ঝোপ খুঁজে - সেই যে তুমি মন্দিরের দিকে চলে গেলে -" "হ্যাঁ - সেটাই তো জানি"। "শোনো না সবটা - বসেছি, সবে মাত্র হাল্কা হয়ে নিঃশ্বাস ফেলছি এমন সময় মাথায়, চোখে, গায়ে গরমজল পড়লে চমকে তাকিয়ে দেখি, ঠিক ওপরের ধাপে দীপালী,

আশুর বোন - সে প্যান্টি ঠিক করে উঠে যেতে গা ঘিন ঘিন করতে থাকলো - আবার ভালোও লাগছিল ... নিলাম। মনে মনে ভাবলাম সুভাষদার সঙ্গে ঘুরছিস - ওকেই দেখাতে পারতিস।" (অনেক খারাপ শব্দ ও ব্যয় করেছিল - সে সব লেখা গেল না। এখন আবার শচীন হয়ে গেছে মঠাধ্যক্ষ - প্রমাণহীন কথা লেখা যায় না) ওকে বোঝালাম, "দীপালী কী করে জানবে যে তুই ওখানে আছিস - সেও তো আড়াল খুঁজে কাজটা সেরেছে।" "উঃ আমার সমস্ত শরীর এখনো জ্বালা করছে।" "সমস্তটা ভাব-এটা একটা দুর্ঘটনা।"

নবেন্দু দলবল নিয়ে এসে গেল। বললো, "খুড়ো বেশ গা দুলিয়ে কাটিয়ে দিলি?" "কোথায় গেসলি?" "বাঃ ২০সের দুধ লাগবে? যোগাড় করতে হবে না?" "সে তো কাল সকালে।" নবেন্দু বললো, কণ্ঠে বেশ ঝাঁজ মিশিয়ে "কাল সকালে কোথায় খুঁজবো।" "কেন, বিষ্ণু ঘাটের ওপরে যে মকর বাহিনী মন্দির আছে - সেখানে হরিদ্বারের সব গোয়ালা দুধ আনে।" "তুই জানতিস?" "প্রথম দিনই স্নান করতে গিয়ে জেনেছি। রাখালরাও তো দেখেছে। সে তো তোর সঙ্গে ছিল।" দেবিকা বললো, "শেষকালে নবেন্দুদাকে আমিই তো বোললুম।" ওরা চলে গেল। শচীনকে বললাম, "সব ভুলে যা। জীবনে অনেক আকস্মিক ঘটনা ঘটে, ঘটবে। এত দ্রুত রাগতে নেই - এত দ্রুত কামবৃদ্ধি ভাল নয়।" "ওকে দেখলেই -" "সহজ হ। কদিন চোখ ঘুরিয়ে নিবি।" রক্তমাংসের মানুষ আমরা - তার ওপর অধিকাংশই স্বল্প শিক্ষিত। স্বল্পজ্ঞানী শ্রমিক। আত্মসংযমী হওয়ার প্রচেষ্টাই কম। শচীন চলে যেতেও ভাবনা থামলো না। এই তো আমিও রূপমুগ্ধ কিন্তু সংযত বলে কেউ জানতে পারছে না।

পরদিন ভোর হতেই নবেন্দু ঠ্যালা মেরে তুলে দিয়ে নিজেই বিছানা গুটিয়ে তুলে ফেললো - বললো, "ঘুমুতে চাস তো মনার জায়গায় যা।" আমি না ঘুমিয়ে চলে গেলাম একটা খালিকামরায়। (পাশের একটা রেকে)। কাজ সেরে বসলাম প্রিয় গাছের তলায়। এটা একটা বকুলগাছ - বেঁটে আছে আমারই মত। S. M আর STN STAFF রা সত্যিই বেশ করিৎকর্মা। সমস্ত প্লাটফর্ম একেবারে ঝকঝকে পরিস্কার।

ধুলো উড়ছে দেখে ওভার ব্রিজে চলে গেলাম। সেখানে সব কটা বাচ্ছা। ওদের ইচ্ছা ও চাহিদায় সপ্তর্ষির গল্প বললাম - কিন্তু সাতটা নাম মনে করতে পারলাম না - ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ আর মনে পড়লো না (এখনও মনে করতে পারছি না)। ওরাও কেউ জানে না। অথচ এককালে ওরা ষ্টার ছিল - লোকের মুখে মুখে ওদের নাম ঘুরতো।

সন্ন্যাসীদের দুটো দলের খাওয়া শেষ হতে নীচে নামলাম। বুড়ু ওদের দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের গল্প বলছিল। আমি এবং বাচ্চু মাঝে মধ্যে কথা বলেছি। লালটু, বুলটু বিশেষতঃ কেঁচো খুবই মন দিয়ে শুনছিল। প্লাটফর্মে দুটো উনুন নামিয়ে রান্না হচ্ছে। মনে ভাবলাম, "এর মধ্যে পরমান্ন হল কেমন করে।" শীল বৌদি বললো, "ছেলেটা কোথায় গেল?" "আমার কাছে বসে গল্প শুনছিল।" "বাঃ" "গাছ তলায় বসে কেন?" "এখানটা আপনার এত ফে ভারিট কেন?" অপ্রতিভ হয়ে বললাম, "না, কেউ তো বসছিল না - তাই বলছি।" ভোর চারটে থেকে রান্না হচ্ছে জানেন! রাঁধছে কে জানেন? যান্ দেখে আসুন - মুখার্জী গিন্নিকে দেখে আসুন - আমার দেমাক ভেঙে গেছে - পালিয়ে এসে হাঁফ ছাড়ছি! হাসলেন শীল বৌদি। "ভাব হয়ে গেছে? আপনারা পারেনও বটে।" "সে তো সেই প্রথম রাতে - হয়েছিল কী বলুন তো - দুই বন্ধুকে এক জায়গায় রেখেছিলেন নবেন্দুদা - জানেই না তো দুজনেরই বৌ ধুমসী মোটা - হিহি - তাই শোবার জায়গা নিয়ে ঝগড়া - কর্তারা মেঝেয় শুতেই সব ঠিক হয়ে গেছে।"

থার্ড ব্যাচ ছিল বেশ বড়। তা মিটে যেতেই দলের বাচ্চারা ও ষ্টেশন স্টাফরা খেতে বসে গেল। বেলন চাকীর অভাবটা বোঝা গেল। ভাগ্যিস মুখার্জী বৌদি সঙ্গে এনেছিলেন। রাধুনিরা মাত্র দুটো চাকী বেলন এনেছে। ফিরে গিয়েই F-Shop থেকে বানিয়ে নিতে হবে।

কুণ্ডু জানালো "বাস এসে গেছে।" বাসের লোকেদেরও খাইয়ে দেওয়া গেল। কানাইদা জানালো, "পরমান্ন অনেকটা বেঁচে আছে। সেটাও বাসে তুলে নিচ্ছি।" "পরমান্ন খুব টেষ্টফুল হয়েছে তবু আরো কিছুটা ফুটে মরলে ভাল হতো।" "ওদিকে আমি যাইনি। পরমান্ন সামলেছে মেয়েরা - তাছাড়া সাধুরা আসতে শুরু করে দিয়েছে দেখে

সামান্য আগেই নামাতে হলো তো।"

বাস এসে দাঁড়াল দইওয়ালা বলে এক জায়গায়। কৃষ্ণমন্দির দেখে এল সবাই। S. M-এর দায়িত্বে পুরো কোচ চাবি দিয়ে সবাই এসেছি। নবেন্দু বলেছিল, "ভয় পাসনি বুড়ো, চোর সাধু সবাইকে খাইয়ে এসেছি - কেউ নেমক হারামী করবে না।" লছমনঝুলার ঝুলার কাছে বাস দাঁড়িয়ে গেল। সবাই নেমে যেতে বাস চলে গেল। সঙ্গে রইল বিক্রান্তের ম্যানেজার গাইড হিসাবে। কী জানি কেন, আজও শচীন আমার সঙ্গ নিল। সিধুদা গোপালবাবুর পরিবারের সঙ্গে চলেছে। অথচ বলেছিল, "হৃষিকেশে সঙ্গে নিও।"

হিমালয়ের অন্দরমহলে ঢোকার মূল তোরণদ্বার হল হৃষিকেশ। প্রায় সারা বছর ধরে এই পথ ধরে চলে কত পর্যটক, কত সাধারণ মানুষ, কত ব্যবসাদার, চোর আর সাধুমানুষ। বাস চলেছে সারাক্ষণ। কালিকম্বলী ধর্মশালা সর্বদা পূর্ণ। অন্যান্য আশ্রমগুলোও তাই। হিন্দিতে একথা জানিয়ে গাইড বললো - "চলিয়ে ঝুলামে।" এ লছমন কে? লছমন পাঁড়ে না রামের ভাই লক্ষ্মণ? গাইড জানে না। কী করে রামের ভাই এখানে এল, ঝুলা তৈরী করল তার জবাব নেই। একমাত্র বাঁদররা তাঁদের বাঁদরামির পরিচয় দিয়ে রামায়ণের গল্পের সঙ্গে মিশে আছে। সতর্ক, অসতর্ক কারোর রক্ষা নেই। ডাণ্ডা হাতে পাণ্ডাদের ছেলেরা সব সময় তাদের তাড়াচ্ছে। তবু কারোর বা চশমা খুলে নিচ্ছে, কারও ঘাড়ে চেপে পকেট হাঁটকাচ্ছে। ইচ্ছেই হচ্ছিল না। ওপারে যাই। শচীনের ভরসায় গেলাম। যাক্ সুরক্ষিত অবস্থাতেই ওপারে পৌঁছেচি। ওপারে গিয়ে নবেন্দুর কাছে জানা গেল, চানা ছড়িয়ে ওরা আক্রমণ থেকে বেঁচেছে ; যাক বাবা, আর আসছি না (পরে তিনবার হৃষিকেশে কোচ রেখেছি - কিন্তু ঝুলায় চড়িনি - হৃষিকেশের হৃষিকেশ মন্দির কখনই দেখিনি।) ঝুলা তো ঝুলাই। দোল খাওয়া যায় - মাঝে কোনো পিলার নেই। অতীত কালেও এমনই ছিল হয়তো বা। ইংরেজ আমলে এই সেতু হয়েছে। গঙ্গা এখানে খুব একটা চওড়া নয়। দুতীরের তারের বাঁধনে ঝুলন্ত সেতু (এখন হাওড়া - কলকাতার দ্বিতীয় সেতুও কিছুটা এমনই। আর হাওড়া ব্রিজ দাঁড়িয়ে আছে তার অগুনতি নাটবোল্টের

জোরে)। সেতুটি দেখতে বেশ সুন্দর (একবার সময় দিয়ে স্কেচ করেছি)।

ওপারে প্রথমেই ভারতমাতা মন্দির। আহামরি দেখতে নয়। কিন্তু এখানে বিশিষ্ট জিনিস হল, চতুর্মুখ শিব। মূর্তি আমি দেখি না। কিন্তু এই মূর্তিটা পথ থেকেই দেখা যাচ্ছিল। জানি যে চতুর্মুখ হল ব্রহ্মা - তাই গাইডকে প্রশ্ন করলাম, কিন্তু সে এ বিষয়ে কিছু জানে না। বাসের ব্যবসা করে 'পুরাণ কথা' সে বিশেষ জানে না। গীতা ভবনের দিকে চলেছি ডাইনে বাঁক নিয়ে। নবেন্দু দলবল নিয়ে স্বর্গাশ্রম যোগট্রেনিং সেন্টারে ঢুকে গেল। শচীনকে নিয়ে আমি চলে এলাম পরমার্থ নিকেতনে। এখানে হাফ কাট ভাস্কর্যে ক্ষোদিত কয়েকটি স্থাপত্য কীর্তি দর্শন করে চলে এলাম গীতাভবনে। ছবিতে মহাভারত - তবে গীতার অংশই প্রধান। এই গীতা ভবন ভারতের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম ধনিক প্রতিষ্ঠান। কত জায়গায় যে এদের প্রতিষ্ঠান আছে তা ভাবাই যায় না। হরিদ্বারের পবনধাম (আয়নার ও কাঁচের ম্যাজিক) ও এদের প্রতিষ্ঠান। তিরুপতি, নাথদ্বারকে সবচেয়ে ধনী বলে বোঝা যায় তারা একজায়গায় কেন্দ্রীভূত বলেই। গীতা ভবন বিকেন্দ্রীয় বলে বোঝা যায় না। শচীনকে এসব বোললাম (আগেই জানিয়েছি সে পরে ধর্ম ব্যবসায়ী হয়ে যায়)। নৌকা পেরিয়ে বাসের কাছে চলে এলাম। জল ঝকমক করছে। নীচের পাথরও দেখা যাচ্ছে। মাছ আছে অনেক। যাত্রীরা কেউ কিছু খেতে দিলে খাচ্ছে। শচীন বললো, "মাছগুলো হরিদ্বারের তুলনায় আকৃতিতে ছোট।" হবে, আমি তাও লক্ষ্য করে দেখিনি।

খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে, কিছুটা পদচারণা করে তবে বাসে ওঠা হল। যতটা সময় লাগবে ভেবেছিলাম ততটা লাগলো না। তবে কোচে ফিরে স্বস্তিই পেলাম। চা পান শেষে কজন আবার উল মার্কেটে গেল। আমি গাছের তলার বেদীতে একা। এ্যাটাচমেন্ট, ডিটাচমেন্টের কাজ এখন সুভাষই করছে। কাজটা খুব একটা পরিশ্রমের নয়। S. M ভালো হলে কোনো সমস্যাই নেই। গত বছরে কষ্ট পেয়েছি, কেননা বিষয়টা জানতাম না। এবারে সব ফর্ম রেডি করে সাইক্লোস্টাইল করিয়ে এনেছি তখন জেরক্স সিস্টেম এত চালু ছিল না। রাত ১০-৫০ বেশ রাত্রি এখানে। তবু এত রাত্রে কী যাত্রী হয়? কে জানে লাষ্ট প্যাসেঞ্জারে কোচ জুড়বে।

কাল ভোর রাতে দেরাদুন। দুদিনের প্রোগ্রাম। দুন এক্সপ্রেসে তার পরে লক্ষ্ণৌয়ে। না, এখন এসব ভেবে লাভ নেই।

ভোরে যখন ঘুম ভাঙল, তখন অবাক। নতুন গড়ে ওঠা পিলগ্রিম প্লাট ফর্মে গাড়ি প্লেস হয়ে গেছে। এতদিন এত সুন্দর সাজানো গোছানো প্লাটফর্ম পাইনি। হরিদ্বারের মত এখানেও আমরা একেশ্বর - অন্য কোন কোচ নেই। দীর্ঘ প্লাটফর্ম সবটাই বর্তমানে আমাদের দখলে। কেবল সামনেই RPF অফিস। নবেন্দু বললো, "সুভাষ তোকে ডেকেছিল। আমিই গেলাম। S. M লোক ভাল। আমাদের কোন সমস্যা হলে যেন জানাই। হ্যাঁ বলে দিয়েছেন, প্যাসেঞ্জার প্লাটফর্মের কল না ব্যবহার করতে। ৯ টা নলমুখ আছে। ৪টে ল্যাভেটরি আর ৫টা করে ইউরিন্যাল আছে - সেগুলো ব্যবহার করতে। সব যেন নীট অ্যণ্ড ক্লিন থাকে। শোন্ আমি, বিদ্যুৎ আর দেবুদা - কুণ্ডু যাচ্ছি বাস ঠিক করতে।" চলে গেল। আমি চায়ের সন্ধানে গেলাম।

নবেন্দু বলেছিল, "প্রথম দিনই মুসৌরী যাবো, পরদিন হাফবেলায় দেরাদুন দেখবো - রিস্ক করবো না। সাড়ে আটটায় গাড়ি।" কিন্তু বাস নিয়ে জানালো, "আজই দেরাদুন দেখবো - কাল সকালেই দুটো বাসে সবাই যাবো।" এ বিষয়ে কী আর করতে পারি। ফলে বললাম, "আজ আবার কারা যাবে না জানিস, এইমাত্র RPF OFFICER বললেন, শহরে ক্রাইম থাকলেও রেল ষ্টেশন বা ইয়ার্ডে কোন দুষ্কর্ম হয় না।" "মিউনিসিপ্যাল বাস মাথাপিছু দুটাকা। এর চাইতে সস্তা হয় না। তবে আগামীকালের দুটো বাস ২৫০ টাকার মত পড়বে। ট্যাক্স ওরাই দেবে।"

এক বস্তা প্রায় মুড়ি দিল রাখালের মা। সুজি, মুড়ি আর বাদামভাজা (ছাড়ানো) হলো টিফিন। দ্রুত খেয়ে নিয়ে বাসে বসে গেলাম। আজ আবার পাশে বসেছে সিধুদা। বাস দ্রুত ছুটে, শেষকালে ধীরগতিতে নিয়ে এল সহস্রধারার কাছে। কিছুটা হাঁটতে হল - টিলার মত উঁচুতে সহস্রধারা - (এখন অনেক কাছে নিয়ে যায় আর জঙ্গল কমে গেছে।) মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য। দুপাশে ঘন জঙ্গল ঘেরা আলো আঁধারির পথ। উচ্চতা সামান্যই ফুট চল্লিশ হবে। ঝর্ণাই বলা চলে। পাথরের গা দিয়ে সহস্রাধিক ছিদ্রপথ দিয়ে জল বের হচ্ছে। অবিরাম ধারায় বয়ে চলেছে।

একটা নাতিদীর্ঘ কুণ্ডে জল সঞ্চিত হচ্ছে - সামান্য করে উপচে পড়ে চলে যাচ্ছে নালায় - যে নালা নাকি তমসা নদীতে পড়েছে। কাছেই একটা উষ্ণ প্রস্রবণ আছে - তারও জল এসে পড়ছে ঐ কুণ্ডে -তাতেই বোতল ভর্ত্তি করে জল নিচ্ছে - পেট নাকি খুব ভালো থাকে - জহরলাল (প্রধানমন্ত্রী) ও এই জল পান করে - বোতলে ভর্তি করে দিল্লি যায়। আমাদের দলেরও কেউ কেউ বোতল ভোরলো। তার মানে হল, তারা এটা জানতো, অথচ আমিই জানি না। হায়!

সিধুদা বাসে এসে বললো, "এটা কী করে হয় - কত কাছাকাছি ঠাণ্ডা জলের ঝর্ণা, গরম জলের ঝর্ণা?" আমার মনে প্রশ্নটা ছিলই। বললাম, "পরে বুঝিয়ে বলবো প্লাটফর্মে। এটা বুঝছি যে, পাথরটায় অনেক ছেঁদা আছে। হয়তো এমন কোনো জিনিস ছিল পাথরের মধ্যে যা জলের চাপে বা দ্রবণ শক্তিতে মানে জলে মিশে বেরিয়ে গেছে। তাই পাথরটায় ফুটো হয়ে গেছে।" সিধুদা উত্তরে মন দেয়নি, বললো, "রোজ নাকি এখান থেকে জল নিতে আসে অনেক লোক, নিয়মিত বাস চলে" - ডাকাতে গুহায় এসে গেলাম। অতীতে হয়তো ডাকাতরা থাকত। এখনও বেশ নিরিবিলি জঙ্গল আবৃত - গাছমছমে পরিবেশ। গুহায় কেউই ঢুকলো না ভাঙাচোরা, কঠিন পথ। সবাই দ্রুতই ফিরে চললো বাসের দিকে। যাই হোক, তবু স্থানটির সৌন্দর্য্য আছে। বাসের কণ্ডাকটর বললো, "তমসা নদীকে এখানে মাঝে মাঝে দেখা যায়, মাঝে মাঝে নদী পাথরের মধ্যে ডুব মারে।" সে দু তিন জায়গায় নদী বলে জল দেখাল। মনে হয় সময় দিয়ে সত্যতার খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল (এখন আর ডাকাতে গুহা দেখায় না)।

ওখান থেকে বাস চলে এল টপকেশ্বর শিবের গুহায়। সহস্রধারার মত। গুহার মাথা ভেদ করে শিব (পাথরের লিঙ্গ মূর্তি) এর মাথার জল টপে টপে পড়ে - তাই নাম হল টপকেশ্বর। এখন পূজার্থী নেই - আমরা কজন দর্শনার্থী। গাইড জানালো, এটা নাকি মহাভারতের অস্ত্র গুরু দ্রোণাচার্য্য পূজা করতো। কাছেই ছিল তপস্যারত দ্রোণাচার্য্যের ডেরা - তাই থেকে ডেরা দ্রোণ থেকে দেরাদুন নামের উৎপত্তি। যাইহোক স্থানটি বৃক্ষছায়ায় শীতল - ফলে যাত্রীরা কিছুটা এদিক ওদিক ঘুরে নিল।

মনে রাখতে হবে, তিনটি দর্শনীয় স্থানের খুব কাছাকাছি বাস যায় না - তিনটিই পাহাড়ী ভঙ্গিল পথ। এবারে বাস চললো সামরিক বিদ্যালয়ের দিকে। আগে থেকে অনুমতি নিলে ভিতরে প্রবেশ করা যায় - জানাল কণ্ডাকটর কাম গাইড। বাস SLOW DRIVE করে ধীরে ধীরে সব দেখালো। ছাত্রদের পরিচর্যায় রচিত ফুল বাগিচা। গোলাপ বাগ দেখা গেল মনোরম পরিবেশ।

দুপুরের মধ্যেই ফিরে এলাম। কদিন পরে মাছ ভাত পেয়ে সকলেই ভালো টানলো। ভাত কম পড়ে গেল। আবার বসাতে হল। আমাদের খেতে সাড়ে তিনটে বেজে গেল। কয়েকজন শহর দেখতে গেল। কজন গেল S.M-এর পারমিট নিয়ে কেরোসিন আনতে। হরিদ্বারে এটা অবারিত ছিল। ফিরে এসে দেবুদা জানালো, কাছাকাছি দুটো ধর্মশালা আছে, তবে জল কিছু কম। বিরাট বড় ব্যবসায় কেন্দ্র। দেরাদুন রাইস, বাসমতী চাল, নানারকম ডাল প্যাকেট বিক্রি হবার বাজার আছে। রিজার্ভেশন সেন্টারের পাশেই মুসৌরী যাবার বাসস্ট্যাণ্ড ইত্যাদি।

বিকালে অখিল এসে বললো, "স্পোর্টস হবে - বাচ্ছাদের মেয়েদের নিয়ে। আপনাকে দুটো ফার্স্ট প্রাইজ ১০×২ = কুড়ি টাকা দিতে হবে।" বললাম, "কুড়ি পারবো না, দশ নে।" দিয়েও দিলাম। অখিল কাছে থাকা বাচ্ছাদের নিয়ে চলে গেল। আমি খাতা কলম নিয়ে বসলাম। সামান্য পরই রেজাল্ট জানিয়ে গেল অখিল আর সুভাষ এসে। ছোট ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে বুড়ু (শিখা আদক) বড় মেয়েদের মধ্যে চ্যম্পিয়ন হয়েছে দীপালী চক্রবর্তী (আশুর বোন)। যুবক ছেলেদের মধ্যে চ্যম্পিয়ন হয়েছে স্বয়ং অখিল, সেকেণ্ড হয়েছে সুভাষ। চাঁদা উঠেছিল ৫০ টাকা। সুভাষ বললো, "জগুদার বড় ছেলে ছোটদের মধ্যে নামেনি। আপনার বোন কিছুতেই দৌড়ালো না, মঞ্জুবৌদি সেকেণ্ড হয়েছে - প্রাইজ নিয়েছে অখিল লজ্জায় সেকথা বলেনি। তিনটে ফার্স্ট ত্রিশ টাকা, তিনটে সেকেণ্ড ও বিপ্রতীপের নাম বলা হয়নি - ছোটদের মধ্যে সেকেণ্ড হয়েছে সে-ওর মা ওকে প্রাইজ নিতে দেননি। বলেছেন বাকি দশটাকায় সকলকে মিষ্টি খাইয়ে দিতে।" প্রশ্ন করলাম, "ষ্টাটার ছিল কে?" "বাঃ নবেন্দুদা - সে তো পাশ করা C. R. A (ক্যালকাটা

রেফারী) বললো অখিল। সুভাষ হেসে বললো। "কাতুর হাত দিয়ে আপনার দেওয়া প্রাইজ দেওয়ালাম - বাচ্ছাদের ফার্ষ্ট প্রাইজ।" হাসলাম। বললাম, "তা কী খাওয়াচ্ছিস?" "দেখি কী পাই - ৬ ডজন লাড্ডু খাইয়ে দেব।" অখিল বললো, "আজ রাতে হাতে গড়া রুটী আর মাংস হবে।" "রুটি? অত রুটি কে বেলবে? প্রায় ৬০০ রুটি লাগবে তা জানিস?" মেয়েরা সব রাজী হয়েছে।" বলে চলে গেল ওরা। আমি গেলাম রান্নার ওখানে। তিনটে মাত্র চাকী বেলন। বাড়িতে কেউ কুড়ি পঁচিশটার বেশি রুটি বেলে না। সবাই ধীরে ধীরে কেটে পড়লো। গোষ্ঠদার বৌ আর জগুদার বৌ থেকে গেল - অন্য চাকী বেলন নিয়ে আমায় বসতে দেখে কটা মেয়ে হাসলো। শেষ হতে উঠলাম যখন জগুদার বৌ বললো, "বাঃ আপনি তো দেখছি এ ব্যাপারে চাম্পিয়ন"। এটা একটা সত্যকার সার্টিফিকেট। জগুদার বৌ অত মোটা হলে কী হবে খুব খাটিয়ে। শীলা বৌদি স্বীকার করেছে। সত্যিই আমি প্রায় ১৫০টা রুটি বেলেছি (পরবর্তী জীবনেও রুটি হলেই আমায় ডাকতো রাধুনিরা)।

পরদিন দুটো বাস ভোর বেলাতেই ষ্টার্ট করা গেল। কানাইদা গোষ্ঠদার ওপর খুব চাপ গেছে। লুচি, আলুর দম, বোঁদে বানিয়েছে রাত জেগে। মুসৌরীতে খাবারের দাম বেশি। শহর থেকে ২২ মাইল পাহাড়ী পথ এঁকেবেকে চলেছে। আগেকার নাম ছিল মধুপুরী, পরে চাষের মুসুর ডালের জন্য নাম হয় মুসুরী পরে ইংরাজদের সময়ে নাম হয়েছে মুসৌরি (রাহুল সাংস্কৃত্যায়নের একটা বইয়ে একথা পড়েছি জানিনা একথা সত্য কিনা।) এখানকার লালটিব্বা ৮৫০০ ফুটের সেখান থেকে নানা শৃঙ্গ দেখা যায় - ডরোথীর সিট থেকেও দেখা যায় (এগুলোর হদিশ পরে আর পাইনি-১৯৩৩) এখন বাসকে গান্ধীদ্বার (প্রবেশ পথ) এরপর আর যেতে দেওয়া হয় না। ছোট অন্য বাসে করে দর্শনীয় স্থান দেখতে নিয়ে যাওয়া হয়। তাতে লালটিব্বায় নিয়ে যায় না আর ডরোথীর সিট এলাকায় বহু দোকানপাট বসে গেছে। যাক্ ফিরি পুরাতন দিনে।

বাস নিয়ে এল লালটিব্বার নীচে। তখনও সকাল। আমাদের বাসের কেউ বমি করেনি। অন্য বাসে দুজন করেছে। বাঁকগুলো S টার্নের। বাস ঘুরলে মাথা ঘুরে যায় অনেকের। তাই এটা হয়। যাই

হোক সবাই চড়বে না - দুঘন্টা সময়। কণ্ডাকটর গাইড সঙ্গে রইল। প্রতিযোগিতার মুড এসে গেল কজনের মধ্যে। আমরা কজন ধীর পদক্ষেপে চললাম। মাঝপথে কজন দাঁড়িয়ে গেছে। নবেন্দু হেসে বললো, "খালি পেটে পাহাড়ে চললে দম কমে যায়।" শেষে দেখা গেল সেইই প্রথমে উঠলো শীর্ষ দেশে। লেখা রয়েছে 8560FT শীর্ষদেশটিও বেস প্রশস্ত। নীল আকাশ। দূরে কাছে কত বরফ মোড়া শৃঙ্গ। এক জায়গায় বোর্ডে ছবি এঁকে দেখানো আছে সবচেয়ে কাছেই বাঁদর পুঞ্জ, তারপর নীলাঙ্গ, শ্রীকান্ত, সতোপন্থ, কেদার, কামেট, বদ্রীনাথ - সামান্য পূর্বদিকে নন্দাদেবী ত্রিশূল। অবাক বিস্ময়ে দেখছি আর প্রাণভরে প্রশ্বাস নিচ্ছি -শীত শীত করছে। কাতুকে খুঁজলাম, দেখলাম না। নামতে শুরু করে দিয়েছে দলবল। নবেন্দু কাছে এসে বললো, "চল খুড়ো।" নামতে ইচ্ছেই করছে না। নামতে নামতে নবেন্দু বললো, "গাইড বলছে, কাছেই কাঠগোদাম টিব্বা আছে। ৬০০০ ফুট উঁচু নয় সেখান থেকেও এই শৃঙ্গগুলো দেখা যায়। গান্ধীদরজার কাছে বসে ইয়াং সাহেবের বৌ ডরোথী নাকি প্রায়ই স্নো পিক দেখতো - তাই সেখানে ডরোথীর সীট বলে চিহ্নিত জায়গা আছে।" বললাম, "ইয়াং সাহেব? ডরোথী এরা সব কারা? বললো, "এরাই প্রথম ইউরোপীয়ান দম্পতি - এরাই প্রথম পাকা বাড়ি তৈরি করে সারা বছর থাকেন। তবেই ধীরে ধীরে বসতি তৈরি হয়।"

বাস এসে দাঁড়াল ঝাউয়া ঘরের সামনে। রোপওয়ে ঘর। গান হিল যাওয়া যায়। সেখানের সৌন্দর্য্যও নাকি অপরূপ। ফ্লাওয়ার ভ্যালি আছে। কিন্তু কেউ যেতে রাজী নয়। তখন কণ্ডাকটর গাইড বললো, গান্ধী দরজায় তারা বাস নিয়ে অপেক্ষা করবে - যাত্রীরা যেন পায়ে হেঁটে যায় - হেঁটে না গেলে কামেলস্ ব্যাককে বোঝা যাবে না। কয়েকজন ক্যামেল্স্ ব্যাক দেখতে নারাজ হয়ে বাসেই ফিরে গেল। আমরা হেঁটে আকাশমুখো হয়ে চলতে চলতে উটের পিঠের মত পাহাড়ী দৃশ্যকে অনুভব করলাম। কে এমন নাম দিয়েছে - তবে যেই দিক, তারনাম দেওয়া সার্থক।

বাসে ফিরেদেখি, ঝগড়া হচ্ছে। নবেন্দুর মত না নিয়েই খাওয়া

শুরু করে দিয়েছে। বিদ্যুৎদা থামালো। পড়ে থাকা কয়েকটা লুচি আর সামান্য বোঁদে খেয়েই চললাম কেমটি ফলস দেখতে। আমাদের দেরী হয়েছিল দুর্গা মন্দির দেখতে গিয়ে। খাবার নিয়ে ঝগড়া ভালো লাগেনি ঠিকই, কিন্তু দলের এটা খেয়াল রাখা দরকার - খাবার ব্যবস্থাটার সর্বদা নজরদারীতে রাখা প্রয়োজন বিশেষতঃ এই জাতীয় শ্রমিক নিয়ে দল গড়লে এরকম ঘটনা ঘটবেই।

প্রায় ১০ মাইল দূরে কেমটি ফল্‌স্‌। হাজার খানেক ফুট উঁচু থেকে পড়চে জলধারা। জলধারা যেখানে নেই সেখানটাই ঘন সবুজ ঘাস গজিয়েছে। এখন বসন্ত কাল - বর্ষাকালে হয়তো প্রচুর জল পড়ে। মাঝখানে গড়ে তোলা পার্কগুলো তখন কেমন হয় কে জানে! এখন দেখছি, কজন মানুষ এখানে ঘুরছেন। হাতে সময় কম। নবেন্দু এখনো রেগে আছে। বলেছে, ''গিয়েই গাণ্ডে পিণ্ডে গেলাবো।" আমি কাছ থেকে সরে এসেছি। বিদ্যুৎদা, সিধুদা ঠাণ্ডা করছে। দ্রুতই ফেরা গেল। বাস গান্ধীদ্বারেও না দাঁড়িয়ে নীচে নামতে থাকলো। ফলে পিকচার প্যালেস আর দেখা হলো না।

পরদিন সকালেই লক্ষ্ণৌ - এখান থেকে 10DN DOON EXP এই আমাদের বেনারস যাওয়া হবে। ২৪ ঘন্টা সময় লক্ষ্ণৌ শহর দেখার পক্ষে যথেষ্ট। শুনেছি রাতে নবেন্দু নাকি খেতে চাইছিল না -কানাইদাকে নাকি NO MEAL করে দিয়েছিল - মেয়েরা বিশেষ করে শীলা বৌদি আর দেবিকা নাকি অনেক ক্ষমা চেয়ে ওকে খাইয়েছে। আমি অন্যত্র ব্যস্ত ছিলাম। পরে এসে এসব শুনেছি। দেখা গেল সম্পাদক খুব ফিট। একটা টাঙ্গাওয়ালাকে হেড বানিয়ে ১৯টা টাঙ্গা ঠিক করেছে। প্রধান টাঙ্গাওয়ালার শ্বেতশুভ্র দাড়ি, মাথায় তাজ, গায়ে চুমকি বসানো জামা - ঘোড়া দুটো ধবধবে সাদা।

নবেন্দু ভেবেছিল, এরা ভাল টাকা চাইবে। রাজধানীর চালাক চেকার। কিন্তু আমি আর সুভাষ যেতে ওরা আমাদের প্রোগ্রাম পড়ে খুব খুশি - ষ্ট্যাম্প মেরে সই করে বললেন, "খুশ দিলমে দেখিয়ে শহর। সামকো যাইয়ে গোমতী কিনার মে, দেখিয়ে নয়া বানানা হুয়ে শহীদ মিনার।"

লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত কিসসা, বিনয়ের বাড়াবাড়ির "পহেলে আপ" এর গল্প কালই শুনিয়েছি বাচ্ছাদের। তারা হেসেছে। আজ আমরা দুজনও হেসে নবেন্দুকে জানালাম, "এক পয়সাও চায়নি কেউ।" সুভাষ বললো, "অনেকগুলো রাজধানী শহর দেখলাম - এলাহাবাদ, আগ্রা, দিল্লি, লক্ষ্ণৌ (এখন দেরাদুনও রাজধানী) কেউ খারাপ ব্যবহার করেনি।" নবেন্দু বললো, "মথুরাও এককালে রাজধানী ছিল কংসের।"

টিফিন খেয়ে যাত্রা শুরু। জনা আটেক যাচ্ছে না। ১৯টা টাঙ্গার শোভা যাত্রা যেন। হরিদ্বারেও টাঙ্গা হয়েছিল, কিন্তু তা এত সুশৃঙ্খল ছিল না। মাথা পিছু এক টাকা ভাড়া। ওরা দেখাবে অধিকাংশই চলন্ত অবস্থায় "বড়ে ইমাম, ছোটে ইমামমে পয়দল।"

শহর বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। যদিও স্টেশন চত্বরে ভিখারী আছে। টাঙ্গায় আমাদের গ্রুপ, মনা, সুশীল, ছায়া ওরা তিনজনেই খুব মাঞ্জা দিয়েছে। শহরের ঠিক মাঝখান দিয়ে নদী - আমাদের হাওড়া-কোলকাতার মত। তবে নদী তত চওড়া নয়-তাই শহর দুতীরেই গড়ে উঠেছে। রেসিডেন্সীর পাশ দিয়ে চলতে চলতে টাঙ্গা থেমে গেল। গায়ের গোলা চিহ্নগুলোকে দেখা গেল। এখান থেকে ১৮৫৭র সিপাহী সংগ্রামের মোড় ঘুরে যায় লক্ষণাবতীর রেসিডেন্সি দখলের যুদ্ধে ইংরেজদের ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায় - লক্ষণাবতী হয়ে যায় LOCKNOW জানি না, এ গল্প সত্য কিনা কিন্তু ঘটনাটা বাস্তব।

টাঙ্গা এসে দাঁড়ালো বড়ে ইমামবাড়ার কাছে। সুন্দর সুসজ্জিত উদ্যানটি এর মাধুর্য বর্ধিত করেছে। টাঙ্গাওয়ালাদের প্রধান সেই চালক বললেন, এটি নবাব আসফ-উদৌলার পছন্দ মত করা হয়েছে। নবাব পিতৃস্মৃতিতে এলাহাবাদ মহাবিদ্যালয় নির্মাণ করেছিলেন। দিল্লিতে মিনার বানিয়েছিলেন, আর এখানে বানিয়েছিলেন ভুলভুলাইয়া - তার নীচেই দেওয়ানী খাস। এর দীবারবা কথা শোনে - সামান্য শব্দই শোনা যায়। তবু নবাবের অনুপস্থিতিতে তাঁর পুরানো তিন বেগম ছোট বেগম সাহেবকে ভুলভুলাইয়ার ফাঁদে ফেলে মেরে ফেলেন। এখনও কেউ কেউ ছোট বেগমের নিঃশ্বাস, হাহাকার ধ্বনি শুনতে পায়।

ভয়ের ব্যাপার তাই গাইড নিল নবেন্দু। অনেক সময় নিয়ে বড়ে

ইমাম দেখলাম। খিয়াফৎ হোসেনের তৈরী গোলকধাধা সত্যই এক শিল্প কর্ম- অনবদ্য এর গঠনশৈলী। কজন চেষ্টা করতে গিয়ে হারিয়ে গেলাম - দেওয়াল টোকা দিতে গাইড ঠিক খুঁজে আনলো। বাতায়নে দাঁড়িয়ে দেশলাই জ্বালিয়ে শুনিয়ে দিল শব্দের বিষমতা। নীচের সভাকক্ষ দেখিয়ে, ছাদে উঠে সোজা সিঁড়ি দিয়ে একেবারে বাইরে চলে এলাম। চত্বরে অনেক কটি মসজিদ আছে। তার মধ্যে একটি থেকে দুরে লক্ষণ টিলা দেখা যায়। রামের ভাই লক্ষণের রাজধানী ছিল এই লক্ষণাবতীতে লক্ষণ নাকি ঐ টিলা থেকে নগর দর্শন করতেন। শুনে হাসি পেল।

বাইরে বের হয়ে গাইড বললো, "পয়দল চলিয়ে ছোটে ইসাম।" পথে সুদৃশ্য ক্লক টাওয়ার। গাইড বললো, "এহি ঘড়ি মিনার শোনে কা পাতসে বনা হুয়ে - সফদরজং ইসকো বনা হুয়ে - লেকিন ইংরেজ লোগ ইসকো চোরা লিয়া।" হবে, আমি তো ইংরেজদের 'দস্যু' ছাড়া কিছুই ভাবি না। জানা গেল ছোটে ইমামবাড়ার নাম হুসেনাবাদ। আকৃতিতে সত্যিই ছোট, কিন্তু স্থাপত্য রীতি নয়ন মনোহর। ভিতরে নানা ডৌলের তাজিয়া আর ঝাড়লণ্ঠন আছে প্রচুর প্রিজম (তিনকোনা কাচ আছে। (হুগলির ইমামবাড়াতেও দেখেছি নানা রঙীন প্রিজম) - সামান্য পশ্চিমেই সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য জুম্মা মসজিদ - বড় কিন্তু আহমরি নয়। এরপর অন্যপথ ধরে প্রত্যাবর্তন। ছাত্তার মঞ্জিল বর্তমানে গবেষণাগাব হয়ে গেছে - আগেও ইউনানী চিকিৎসার ভেষজগার এখানেই ছিল। এটা ছিল মুসলিম আমলের আগের রাজবাড়ি। নবাবের বাড়ি? বড়া ইমামবাড়ার পাশে ছিল - ইংরেজরা তা ভেঙে দেয়। বর্তমানে তার চিহ্ন মাত্র নেই।

ওই রোদ্দুরেও কজন গেল গোমতী নদীতে স্নান সারতে। নবেন্দু গেলেও আমি যাইনি। হোস পাইপে স্নান সেরেছি। বিকালে কজন বাজারে গেল - চিকনের কাজ করা জামা কাপড় কিনবে। আমরা কজন গেলাম গোমতী নদীর ধারে। শহীদ মিনার আহামরি লাগেনি - তবে মনে হচ্ছিল এমন ব্যবস্থা বহু জায়গায় থাকা উচিত। রাতে ফিরে জানা গেল - কাতু এখানেও কিছু কেনেনি। তবে অন্যেরা বেশ কেনাকাটা করেছে। ছায়াকে অনেক কিছু কিনে দিয়েছে সুশীল।

পরদিন বারানসী (এর সম্বন্ধে জানতে হলে ১ম খণ্ড পড়তে হবে) এসে গেলাম। (ডায়েরী ফলো করা যাচ্ছে না - অনেক অশ্লীল বাক্য এবং ঘটনা আছে - ফলে নূতন ভাবে লিখতে হচ্ছে।) প্রায় দুদিন আমি ষ্টেশনের বাইরে যাইনি। ডাইরীতে প্রথমেই লেখা আছে - সাজাহান দিল্লির দেওয়ানী খাসের দেওয়ালে লিখিয়ে ছিলেন, স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তা এখানে, আমি লিখছি, নরক যদি কোথাও থাকে তা বারাণসী ষ্টেশনে।

বারাণসী হিন্দুদের কাছে পবিত্রতীর্থ। বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন শহর। হয়তো অনার্যদের হাতে এর গোড়াপত্তন। হিন্দুরা পরে এসেছে। নাম ছিল কাশী। রাজা বর্ণার আমলে নাম হয় বারাণসী। এখানের বিশ্বনাথ মন্দির আসলে অন্নপূর্ণার মন্দির - বেশ কবার লুণ্ঠিত হয়। আওরঙ্গজেব ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় মসজিদ তৈরী করে, কালাপাহাড় লুঠ করে। ভক্ত ও পূজারীরা শিবমূর্তিকে জ্ঞানব্যাপীতে লুকিয়ে রাখে। পরে অহল্যাবাঈ নাকি নূতন মন্দির করে মসজিদের পাশে - মন্দিরের প্রবেশ পথ সংকীর্ণ করে দেয়। তার পরে শিখ নেতা রণজিৎ সিংহ মন্দিরেব চূড়াটা সোনার পাতে মুড়ে দেন। ১৯৪৮-এর বন্যায় মসজিদ নাকি ধ্বসে যায়। তুলসী মানস মন্দির রামায়ণ রচয়িতা তুলসী দাসের স্মৃতি নির্মিত দেওয়াল চিত্রণ অনবদ্য। বিড়লার করা বিশ্বনাথ মন্দির - বিশ্ববিদ্যালয় - দুর্গা মন্দির, তিলভাণ্ডেশ্বর প্রভৃতিও দর্শনীয়। গঙ্গা স্নান ও নৌভ্রমণ ভালো লাগবে। দূরে আছে সারনাথ। আর গঙ্গাপারে আছে রামনগর, ব্যাসকাশী। আমাদের দল গঙ্গাপারে যাযনি। প্রায় দুদিন আমরা জল সংগ্রহে গলদঘর্ম হয়েছি। ষ্টেশনে ষ্টার্ফ (সবাই না হলেও) অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছে। ফলে ফেরার সময় কোচ এ্যাটাচ্‌মেন্টের সময় গয়া প্যাসেঞ্জারের গার্ডকে আমাদের মহিলারা শীলা শীল বৌদির নেতৃত্বে ঘেরাও করে। প্রায় পনেরো মিনিট পরে S. M আর গার্ড দুজনেই কর জোড়ে ক্ষমা চান এবং মোগল সরাইয়ে ফোন করে জলভরে দিতে বলে পরিত্রাণ পায়।

মোগলসরাইয়ে জল ভরে নিই আমরাই - ষ্টাফরাও সাহায্য করেন। ধীর গতির গাড়ি। সকালে পৌঁছাবে। গয়ায় আমাদের এবারের ভ্রমণ

শেষ হবে। মন অনেক নিশ্চিন্ত। বিদ্যুৎদা বলেছে এখনো ৩/৪ খরচ হয়নি। গয়াতে নিরামিষ, সুতরাং খরচ কম হবে। নিরুপদ্রব ঘুম ভাঙলো গয়া ষ্টেশনের ৩/৪ নং প্লাটফর্মের কাটইনে।

সিধুদা বলেছিল গত বিকালে বাবার পিণ্ডদান করেতে - নইলে নাকি গয়ায় রাত কাটানো যায় না। শুনে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছি। এখানে এসে নবেন্দু বলে 'পিসিও চাইছে তুই পিণ্ড দান কর।' আমি বলি, 'এখানেও আমি ষ্টেশনের বাইরে যাবো না।' "কেন, এতো তোর না দেখা জায়গা খুড়ো।" "বুদ্ধ গয়া প্রোগ্রাম করলে যেতাম - এ শালা হিন্দুদের ঠকানোর জায়গা।" "সিনিক বিউটিও দেখতে পাবি।" "না, মনস্থির করে ফেলেছি - যাবো না। কাতু যদি যায় তো নিয়ে যাস।" চা বিস্কুট খেয়ে S. M এর কাছে চলে গেলাম।

বাবা মালকড়ি রেখে গেলে ছেলে অনেক রকম ভাবে, অনেক জায়গায় পিণ্ডদান এবং পিণ্ডিচটকানোর ব্যবস্থা করতে পারে। বেঞ্চে বসে বসে ভাবছিলাম। আজ আমি আর শচীন (অসুস্থ) ছাড়া সবাই গেছে। শচীনের জ্বর খুব বেড়েছে - বেনারস থেকেই তার জ্বর। আমাকে কাছে পেয়ে মন খুলে সে একজনের কথা বলে। তাকে আমি অনেক বোঝাই - জীবন কত মহার্ঘ্য তা বোঝাই। শেষে বিয়ে করে ফেলতে বলি। [(তা সে শোনেনি - পরবর্তী জীবনে প্রথমে সন্ন্যাসী ও পরে আশ্রমে চলে যায়। হাওড়া ষ্টেশনে একবার দেখা হযেছিল - চ্যালা চামুণ্ডা পরিবৃত অবস্থায়। আমায় এবং উপেনদাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে, ফলে বিপদে বেড়ে যায় - ওর শিষ্যরা সবাই লাইন করে প্রণাম করে - হাওড়ার ষ্টেশনে সে এক (কেলেংকারীময়) দৃশ্য। (এক ঈশ্বর অবিশ্বাসীকে গেরুয়াধারীর প্রণাম - ক্যাপশন হতে পারতো।)] ওরা প্রায় সবাই ১১টায় ফিরল। কেউ চা পর্যন্ত খেয়ে যায়নি। নিজে রেলের স্টলে চা খেয়েছি - শচীনের জন্য গ্লাসে চা এনেছি। গাড়িতে লোক ফিরতে আমি নেমে ষ্টেশনের বেঞ্চে বসলাম। লিখছি আর লিখছি।

নবেন্দু এল অনেকক্ষণ পর। সে সম্পাদক - চতুর্দিকে তাকে চোখ রাখতে হচ্ছে। লেখা থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন করলাম, "কি কি দেখলি?" সে বললো, "সহজেই যেতে পারতিস্। এও এক ধরনের স্বীকৃতি।"

"হ্যাঁ তবে এতে বিরোধীতাটা প্রকট হয়। বাচ্ছাদের মনে প্রশ্ন জাগে - বুঝতে পারে - হয়তো অনেক পরে - বুঝতে পারবে এই সত্যতা। তাছাড়া পাণ্ডাদের দৌরাত্ম্যটাকে খেয়াল করে।" "ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ থেকে এই দৌরাত্ম্য বন্ধের প্রচেষ্টা চলছে। আমরা কজনের জন্য তাঁদের সাহায্য নিয়েছি এবং কত দ্রুত, কত কম অর্থে সব শেষ করে, দর্শন সেরে চলে এসেছি। কতজন কথা না শুনে অন্য পাণ্ডাদের খপ্পরে পরে এখনও আসেনি।" "যাক্ কী দেখলি বল্ - নাই বা গেলাম, পরে আসবো আবার বুদ্ধ গয়া দেখতে - তখন দেখে নেব।"

"তুইই বলিস সব কিছু দর্শনীয়।" "তবু তার মধ্যে বিশেষরা থাকেই ভ্রমণকারীরা তারই নাম জেনে আসে।" "পড়ে আসিসনি?" "হ্যাঁ পড়েছি -গয়াসুরের কথা - বিষ্ণুপাদ মন্দির আছে, আছে ব্রাহ্মনী দেবীর মন্দির - ১০০০ সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। কেউ উঠেছিল!" "সবাই"। হাসলো নবেন্দু। "সবাই খুব ধর্ম ভীরু দেখছি, দ্যাখ দেব দেবীর দরকার হয় পাপী আর ভীরুদের জন্যে। পাপ করবে ধর্ম করার নামে দেবতাকে ঘুষ দেবে। ভয় পাবে, দেবতার নাম জপ করবে। তাতে কেউ না বাঁচলে বলবে ও ছিল পাপী। দেবতারা যদি থাকতো তাহলে যাজকশ্রেণীর পতন ঘটতো না। তাহলে ভারতীয় হিন্দুরা এতদিন পদানত থাকতো না। এবং মন্দির লুণ্ঠিত হতো না।" নবেন্দু বললো, "চলি। খেয়ে দেয়ে হিসাবে বসবো। কালকের কাজের নিখুঁত চক আউট করতে হবে। রাত একটায় গাড়ি।" "সে আমি জানি S M খুব ভালো, ফোল্ডারের দুদিকেই ষ্ট্যাম্প মেরে সই করে দিয়েছেন।" "রান্না হতে দেরী হবে চল কাছেই একটা সূর্য্যমণ্ডপ আর গান্ধীমন্দির আছে। দেখে আসি- অমনি প্যাঁড়ার খোঁজ নিই।" "ফল্গু নদী দেখিসনি?" "হ্যাঁ, শুধু বালি আর পাথরের চড়া - কোথাও কোথাও খুঁড়ে জল তুলছে স্থানীয় মেয়েরা। বর্ষায় মনে হয়, বেশ জল থাকে। নদীর পাড়ে বেশ ঘন গাছপালা।"

সূর্য্য মন্দির আর গান্ধীমণ্ডপ দেখলাম। প্যাঁড়া আর টকদই দেখলাম লোকে বাড়ি বাড়ি করে। ছ সের মোষের দুধে এক সের প্যাঁড়া হয় - সামান্য চিনি দেয় - কেউ বা বাতাসা দেয়। টক দই পেতে কম্বল চাপা

দিয়ে দেয়। হাঁড়ি উল্টালেও দই পড়ে না। এখানে প্রচুর সজনা গাছ, ডাঁটা ঝুলছে অগুনতি - কেউ নাকি খায়না, সবাই কিন্তু এর ফুল খায় ভেজে - কত ছোট ছোট এর ফুল কী করে কুড়োয়? (এখন এখানেও এটা বেশ চালু - তখন কেউ আমায় পাত্তাই দেয়নি।) কয়েক মন প্যাঁড়া উঠলেও টক দই ওঠেনি। আমি আর নবেন্দু এক বাড়িতে ঘোল খেয়েছি। জানিনা দলের অন্য কেউ দই বা ঘোল খেয়েছে কিনা। হরিদ্বার, বারাণসী, গয়া তিন জায়গায় দুধের খাবারের খ্যাতি আছে। আমার কাছে, হরিদ্বারের ক্ষীর, রাবড়ি, বারাণসীর হালওয়া আর কালাকাঁদ, গয়ার প্যাঁড়া আর টকদই ভালো লেগেছে। (একবার অমরকণ্টকে আমরা ২২ কিলো দুধ ১ কিলো চিনি কিনে দিয়ে এক দোকানদারকে দিয়ে প্যাঁড়া বানিয়ে নিয়েছিলাম - দুসেরের মত প্যাঁড়া হয়েছিল আর বেশি মিষ্টি হয়ে গেসলো। ওরা জ্বালানী ও মজুরি নিয়েছিল পঞ্চাশ টাকা। ২১০ টাকায় পেয়েছিলাম ২সের প্যাঁড়া অথচ বাইরে ৯০ টাকা কিলো দরে প্যাঁড়া বিক্রি হচ্ছিল।)

ভ্রমণ শেষ হয়ে গেলেও এ জাতীয় ভ্রমণের রেস থাকে অনেকদিন। এখানে পরবর্তী ভ্রমণে চান্স পাবার ব্যাপার থাকে। সভাপতি, সম্পাদককে পর্যন্ত ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। সংগঠনটা শ্রমিক শ্রেণীর। সেখানে কেউ একেশ্বর নয় - প্রত্যেকেই সমালোচিত হয়। জীবনের মতই কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জায়গা ছেড়ে দেয় না। নবেন্দু তাই মতামত লেখার খাতা করেছে। গতবারে নরেশ উকিল প্রস্তাব দিয়েছিল।

শীলা শীল বৌদি সভাপতি দেবুদাকে সভা ডাকতে বলেছেন। প্লাটফর্মে একা আমরা আছি। ফলে, প্লাটফর্মে সভা ডাকা হল। সন্ধ্যা ঘনায়মান। সকলেই গাড়িতে অথবা প্লাটফর্মে। ফলে দ্রুতই সভা করা গেল। ডাক পেয়ে গিয়ে দেখি নবেন্দুই তদারক করছে। শীলা বৌদি খাতা পড়ে শোনচ্ছেন। পড়া শেষ করে বললেন, "আমি লিখেছি, উচ্চ প্রশংসাও করেছি - আবার চান্স পেলে বেড়াতে চাই - এসবই সত্য কথা তবু সংগঠকদের মনে রাখতে হবে - সবাই যখন সমান টাকা দেয় - সবাই তেমনই সমান সুযোগ পাচ্ছে না। মেঝেতে কেউ শুয়ে যাবে কেন? কম লোক নিতে হবে - প্রয়োজনে বাদ দিতে হবে।" নবেন্দু কী

বলতে যাচ্ছিল তাকে দেবুদা বললো, "জবাবী ভাষণে সব বলবি। বৌদি আপনি কিছু বলুন" বলে জগুদার বৌকে ডাকলেন। তিনি হাত জোড় করে বললেন, "খাতায় কিছু লিখিনি সে আপনাদের কর্মী যিনি তিনি লিখবেন। আমার সত্যি খুব ভাল কেটেছে। মোটা মানুষ ফ্যান অচল হলেই ঘেমে মরি। ছেলেরা সব জাটীদার চ্যালা বনে গেছে - বসে বসে যতটা পেরেছি খেটে দিয়েছি - নয়নভরে সব দেখেছি - মনভরে গেছে আবার সুযোগ পেলে বেড়াবো আপনাদের সাথে। কাল থেকে খুব ফাঁকা লাগবে। নমস্কার।"

গুরুপদ কারোর ডাকের অপেক্ষা না করে উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললো, "দেবুদা, সভা ডেকেছেন - আপনি সভাপতি - ডাকতেই পারেন। তবে জেনে রাখুন কেউ আলাদা কথা বলবে না। শ্রমিক মানুষ আমরা অধিকাংশই আনপড়, রাগ হলে সঙ্গে সঙ্গে বলে দেয় - কিন্তু সভায় দাঁড়িয়ে বলতে পারবো না। তাই বলি কী সভায় গল্প বলুক কেউ, কেউ গান গাক, কেউ কবিতা বলুক। যদি মত দেন, আমি একটা কালিকীর্তন শোনাই।"

গান শেষ হতে সবাই তারিফ করলো। সভা পাল্টে গেল। বুড়ুর আনা সঞ্চয়িতাটা নিয়ে বাচ্ছারা কবিতা বলতে শুরু করলো। (এটাও লিখতাম না - লিখলাম, এই ধরনের সভা আমরা চলন্ত গাড়িতেও করেছি পরে। সময় কাটাবার এক সুন্দর উপায়। হয়তো ইনট্রোভার্টদের ভালো লাগবে না।)

পরদিন সকাল ১০টায় বর্ধমান ষ্টেশনে অনেকেই নেমে গেল। তার মধ্যে রাধুনিরাও ছিল। উদ্বৃত্ত বস্তুসামগ্রী একশত টাকায় কিনে নিযেছেন গোপাল কাকা। বিদ্যুৎদা সবাইকে পাঁচটাকা করে ফেরৎ দিয়ে খাতায় সই করিয়ে নিয়েছে। নামার সময় অনেকে অনেককে জড়িয়ে কান্নাকাটি করল। আমি কাউকে পাত্তা দিইনি। জানি কদিন একসঙ্গে থাকলেই মানুষের মনে নানান মায়া জন্মায়। এও জানি, অদর্শনে মানুষ আবার ভুলে যাবে। কয়েকজন হয়তো যোগাযোগ রাখবে।

হাওড়ায় নেমেছি। প্লাটফর্মের ঘড়ি সবেমাত্র দুপুর দুটো ক্রশ করেছে। কাজ মিটতে তিনটে বাজল। প্রদীপ, দিদি, আর কাতু অপেক্ষায়

আছে। নবেন্দু, বিদ্যুৎদা, ঝর্ণা, আশু এরা নবেন্দুর বাড়িতে সব মালপত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করে তবে C. C. R ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরবে। উত্তর পাড়ায় নেমে দুদলে ভাগ হয়ে যে যার বাড়ি ফিরেছি। (সবাকার কথা লেখা গেল না। যারা সামনে এসেছে তাদের কথাই লিখলাম। জানি এবং মানছি এটা এই ভ্রমণের পূর্বাঙ্গরূপ নয়।)

— ০ —

স্বাধীন ভ্রমণ ২য় পর্ব

চরৈবেতীর সঙ্গে

পশ্চিম ভারতের সামান্যাংশ

চরৈবেতীর তৃতীয় ভ্রমণকালও ছিল দোলের সময়ে। লিলুয়া কারখানার শ্রমিকদের এই ভ্রমণে কম ছুটি নিতে হত। হোলি ছিল শ্রমিকদের উপভোগ্য উৎসব। কথাতেও ছিল 'দোল দুর্গোৎসব'। কারখানায় প্রচুর অন্যপ্রদেশের কর্মচারী ছিল। বাঙালীদের দুর্গাপুজোর চাইতে তারা দোলকেই বেশি উপভোগ করতো। ফলে কারখানায় দোলের ছুটি থাকতো বেশ লম্বা। কারখানা থেকে স্পেশ্যাল রেক ছাড়া হত শ্রমিকদের জন্য। এই ভ্রমণকাল ছিল সতেরো দিনের। দক্ষিণভারত বেড়িয়েছি ২৫দিনে, উত্তরভারতের কিয়দংশ বেড়িয়েছি ১৯ দিনে। ধীরে ধীরে কমছে ভ্রমণ কাল। সব মানুষ সময় দিতে পারে না - একই মানুষ সব ভ্রমণে যেতে পারে না। আমরা কজন সারা বছর তাকিয়ে থাকি ভ্রমণের জন্য। সারা বছর মুখ বুজে খাটি - অসুখ, কষ্ট, ঝড়-রোদ-বৃষ্টি মানিনা, দারিদ্র্য মানিনা - মনে রাখি চরৈবেতীর সঙ্গে ভ্রমণে যাবো।

চরৈবেতী আমাদের নিজেদের হাতে গড়া দল! সবাই আমাদের বসিয়েছে এর মাথায়। গর্ববোধ যেমন আছে, তেমনি ভালোবাসা আছে, আছে দায়িত্ববোধ, আত্মত্যাগ করার মানসিকতা, আর শ্রমিকের পরিশ্রমক্ষমতা তো আছেই। পথ রেখাটা জানিয়ে রাখি - হাওড়া থেকে পুণা (পুনে) এবং প্রত্যাবর্তন - ভায়া এলাহাবাদ। যাত্রাভঙ্গ সাতনা, জব্বলপুর, জালগাঁও, মানমদ, বোম্বে (মুম্বাই) ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস (শিবজী)। সাতনা থেকে দেখা হবে খাজুরাহো, জালগাঁও থেকে অজন্তা, মানমদ থেকে আওরঙ্গাবাদ ও ইলোরা ফেরার পথে জব্বলপুরে দেখা হবে নর্মদা নদী খাত।

আগের দুটো কাহিনীতেই বলেছি, কারখানা কর্তৃপক্ষই কোচ এলট করতো। এবারে কোচ পাওয়া গেল প্রথম বারেরটাই। ফলে লোকসংখ্যা গেল কমে। এবং ফার্স্টক্লাশ পাস পান এমন জন লোককে নিতেই হল।

এবারে ম্যানেজার হলো গোপাল দাস-এ এস এন - সহকারী ম্যানেজার হলো পরেশ ঘোষ। বাকী সব পদ বহাল রইল শ্রমিকদের মধ্যেই। পাওয়ার হাউস থেকে অনেকে যোগ দিল।

এবারে আমায় একজন সাহায্যকারী দেওয়া হয়েছিল - আমার স্থানীয় সহযাত্রী দীর্ঘদেহী সিতাংশু বিশ্বাসকে, পাওয়ার হাউসের কর্মী সে। এই ভ্রমণকালে সে ছিল সবচেয়ে অ্যাকটিভ (বুঝতে পারিনি সে পাওয়ার হাউসে বিজলী ট্রাভেলস বলে দল খুলবে বলে চরৈবেতীতে ঢুকেছে। ষষ্ঠ ট্যুর পর্যন্ত থেকেই সে চরৈবেতী ছেড়ে দেয়। বর্তমানে সে প্রয়াত।)

অন্য দুবারের মতই কোচটিকে কারখানার মধ্যেই সাজিয়ে নেওয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তুলে নেওয়া হয়। ফলে হাওড়া ষ্টেশনে মালপত্র তোলায় বিশেষ কষ্ট পেতে হয়নি। আমি আগা গোড়া COPS OFFICE-এ এবং STN-এ যোগাযোগ রক্ষা করেছি। সমস্ত কাগজপত্র জমা করে গোপালদাকে বুঝিয়ে দিয়েছি - ফোল্ডার এবং অন্যান্য কাগজ পত্রাদি রেখেছি নিজস্ব ফাইলে। বিদ্যুৎদা ক্যাশ সামলাচ্ছে - তাকে সাহায্য করছে আমার দাদা কেনারাম (এবারে কাতু, ঝর্ণা বা দিদি কেউই যাচ্ছে না - বাড়ির লোকেরা তাদের দেখেনি - অভিযোগ এসেছিল, বুঝতেই চায়নি - আমরা প্রত্যেকেই ছিলাম দায়বদ্ধ।) এবারে ভ্রমণের কথায় ঢুকে পড়ি। হাওড়া - বোম্বে মেলে আমাদের যাত্রা শুরু। ভায়া এলাহাবাদ। রাত্রি ৮টায় ছাড়বে - সাতনায় পরদিন বিকালে ডিট্যাচ করে চলে যাবে। অন্য দুবারের মতই সবাইকে জানানো হয়েছে প্রথম রাত্রে 'নো মিল'। ছোড়দা সহযাত্রী ফলে ব্যাগ-ব্যাগেজ ক্যামেরা সব তার জিম্মায় রেখে দুপুরেই হওড়ায় চলে গিয়ে ফোল্ডার আর স্পেশ্যাল টিকিট সংগ্রহ করলাম। রেলের অফিস অর্ডার আর ফায়ার প্রোটেক্টিভ পেপার গত কালই সংগ্রহ করে গোপালদাকে দিয়েছি।

ফলে হাল্কা হয়েই কোচে ঢুকলাম। গত দুবারই অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। এবারে দেখছি, গোবর্ধন আদক বলে নূতন এক শ্রমিক এসেছে। সেই থেকে অনেক পরিশ্রম করছে। মনা (প্রদীপ) জানাল, "আঁদুলে থাকে পাওয়ার হাউসের কর্মী।" (পরে সে চরৈবেতীর একটা

এ্যাসেট হয়ে যায়।) এবারে সঙ্গে চলেছে আমার অন্যতম প্রিয়পাত্রী গৌরী (ছন্দা) সে এখন সি সপের কর্মী (পরে SS হয়েছিল) চিত্তমুখার্জীর স্ত্রী। তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি - কালিদার দুই মেয়ে বাচ্ছু আর বুড়ুর সঙ্গে। ছোট্টখাট কিশোরী গৌরীকে তারা বৌদি করে নিয়েছে।

এবারে আবার জায়গা পেয়েছি রান্নাঘরের পাশের কিউবে। সঙ্গে আছে ছোড়দা ছাড়াও নবেন্দু, বিদ্যুৎদা, কর্ণদা আর সিতাংশু - সাইড বার্থে কানাইদা আর গোষ্ঠদা (রাধুনি)। ফার্ষ্ট ক্লাস অংশে আছে গোপালদা, পরেশ তার স্ত্রী ও শ্যালিকা (আভা)। সবাই গদি মোড়া বার্থে আছে, গতবারে ছিলাম মেঝেয়।

গাড়ি ছেড়ে দিতে দরজায় গিয়ে দেখি প্রথম কিউবে গতবারের সভাপতি, সহসম্পাদক প্রশান্ত কুণ্ডু, আশুকে নিয়ে বেশ জমিয়ে গল্প করছে, গোবর্ধনের সঙ্গে দরজা খুলে বলিষ্ঠ চেহারার এক যুবক গল্প করছে। দরজা বন্ধ করে দিতে বলে পরিচয় নিলাম। তার নাম শম্ভু রায়। গোবর্ধন তাকে বলে দিল, "ইনিই জাটীদা।" জানা গেল, সেও পাওয়ার হাউসের কর্মী, ওয়ার্কশপ দলের ফুটবল খেলোয়াড়। অন্য দরজায় গিয়ে দেখি, পরেশ দরজা খুলে গল্প করছে। পরেশ ঘোষ চার্জম্যান রং ঘর। সে EX TRADE APPRENTICE. নবেন্দু বাঙালের ব্যাচ মেট, আমার সামান্যই সিনিয়র, সামনাসামনি পরেশদা বলি - কিন্তু অন্যত্র নামই ধরি। (আগে সে ছিল পরেশ ভাট - জনাই নৈটীতে বাড়ি। ওখানে তখন রেলের এক কর্তা থাকতো D.G. MUKHERJEE. তার সাহায্য পেয়েই চার্জম্যান হয়েছে হয়তো। বিয়ে করে মাখলার বিখ্যাত ঘোষ পরিবারের কন্যা প্রভাকে। সেখানেই থেকে যায় এবং ঘোষ পদবী গ্রহণ করে। ওর সহোদর এই কিন্তু ভাট পদবী ত্যাগকরেনি। তাই ততটা শ্রদ্ধেয় ছিল না।) তাদের দরজা বন্ধ করে গল্প করতে বললাম। পালিত হতে দেখে কিউবে ফিরলাম।

নবেন্দু বললো, "কেমন বুঝছিস?" হেসে বললাম, "চরৈবেতী এবারে বড় লোকের চালাকচতুর লোকের দল হয়ে গেছে। সবাই রীতিমত চালাক চতুর।" সিতাংশু বললো,"চালাক চতুর লোকই তো ভাল।" "উদ্দেশ্য নিয়েই গড়ে ওঠে দল। জানি জাটী রেগে গেছে,

তবুও উপায় নেই, এই গাড়িতে মানে কোচে আনপড়, অশিক্ষিত মানুষ আনা যেত না। তারাও এবারে বেশি যেতে চায়নি। তীর্থস্থান তো নেই।" নবেন্দু আমায় চুপ করিয়ে দিল।

সবাই লুচি আলুরদম মিষ্টি এনেছে। অত খেতে পারা গেল না। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ায় ব্যস্ত হচ্ছিলাম। এমন সময় সুনীল কাড়ার এসে গেল। সে নবেন্দুর পাড়ার লোক - MR-SHOP এর কর্মী। এক্স ট্রেড এ্যাপ্রেন্টিস - রং ঘরের পাশের বে (Bay) তে কাজ করে। নিত্য আলাপিত, হোমিওপ্যাথি নিয়ে পড়াশোনা করে। সে বললো, "জাটীদা খেয়ে শোবেন না, কিছু হাঁটুন - বসে বিশ্রাম নিন - তারপর দাঁত মেজে শোবেন।" বললাম, "জায়গা কই? তাছাড়া চলন্ত গাড়ি।" সে বললো, "কেন এ কোচ তো বেশ ফাঁকা।" ফলে হাঁটতে থাকলাম তার সঙ্গে। চলতে চলতে সে বললো, "দুটো ছড়া বলি - লোকে বলে খনার বচন, জানিনা, সত্যই কিনা - 'হেগে খায় খেয়ে মুতে - তাকে ধরে না যমদূতে।' আর একটা হলো, 'খেয়ে হাগে আর শুয়ে জাগে - সে কোনো কাজে না লাগে।" হেসে বললাম, "প্রথমটা ঠিক আছে, দ্বিতীয়টা পুরো ঠিক নয়। কথায় আছে , 'Idle brain is devils workshop.' ওটাও একটা প্রবাদ - কিন্তু মনে রাখার কথা devil ও কারোর মধ্যে পড়ে।" সুনীল বললো, "সত্যিই নবেন্দুদা ঠিকই বলেন।" "কী বলে?" "বলে জাটী হল একটা বিতর্কিত চরিত্র।"

[(জানি অনেকেরই ভাল লাগছে না - ভ্রমণকাহিনীর বদলে মানুষের কাজ ও কথা পড়তে ভাললাগছে না। কিন্তু ভ্রমণ তো আসলে মানুষেরই কথা ও কাজ। অন্য প্রাণীরা কী ভ্রমণ করে? কালিদাসের মেঘ কী ভ্রমণ করেছিল? দেখেছেন তো কবি নিজেই। প্রাণীরা খাদ্যান্বেষণে পরিযায়ী হয়।) ভ্রমণ একা একা হয় না। মানুষ থাকে বলেই কাহিনী তৈরী হয় নইলে তা ভ্রমণ গাইড হয়ে যেত।]

পরদিন সকালে এলাহাবাদ আসার পর ঘুম ভাঙলো। ডেকে তুললো গৌরী (সে আমায় দাদু বলে - তার মা আমায় বাবা বলে - আগেই জানিয়েছি যে আমার স্থানীয় কন্যা বয়সের ফারাক অনেক) "দাদু -এই তুমি যোগাযোগ রক্ষা কারী?" হেসে বললাম, "কাল রাতে

ঘুমের মাধ্যমেই সকলের সাথে যোগাযোগ ছিল - আর জানিসই তো সর্বক্ষণ যোগাযোগ রক্ষা করা যায় না - উচিত নয় - তুই বড় হয়েছিস, বিয়ে হয়ে গেছে - একটুখানি নিভৃতি - একটু আড়াল, একটু সময় তো সবাইকে দিতেই হবে।" "দোহাই দাদু এমন প্রশ্ন থেকে সরে আসছি - কাল থেকে একবারও খোঁজ নাওনি - এটা তো সত্যি কথা।" "দ্যাখ, এলাহাবাদ পর্যন্ত গত বারে দেখেছি, এবারে জানলার ধারে বসবো। চল না বসি"- "তুমি কেবলই কথা ঘোরাও।" "আরে এসেছিস কর্তার সঙ্গে সদ্য বিবাহিত দম্পতি - I Can't peep out in any newly married couples toilet." "বাংলায় বলো দাদু, জানো তো ক্লাশ এইট পর্যন্ত বিদ্যে আমার।" "ঠিক এর বাংলা হয় না, মানে হল, নববিবাহিতের প্রসাধনে উঁকি মারা যায় না।" বললো, "দাদু তুমি সেই লিলুয়া ছাড়ছ ?"

বিদ্যুৎদা চা এনে দিল আমার বিরাট মগে। গৌরী বললো, "রাজার হালে আছে দাদু - ফিরে গিয়ে খালি গপ্পো মারো।" বিদ্যুৎদা বললো, "সত্যিই তো গতবছরে খুব কষ্ট পেয়েছি - ৯০ জন লোক ছিল।" বললাম, "বিদ্যুৎদা, এ হলো গৌরী - ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক তামাসার। ঝগড়া হয়, ভাবও হয়।"

কুড়ি মিনিট স্টপেজ। এ হলো মেলট্রেন। ডাক যায় আসে। যেখানে দাঁড়ায় সেখানে সময় দেয়। "অনেকে হয়তো জানেই না - মেল ট্রেন মানে ডাক গাড়ি।" গৌরী পাশে বসে বললো, "আমিই তো জানতাম না।" পাশের দৃশ্যপট পাল্টাতে থাকলো। এতক্ষণ এসেছি নদী অববাহিকার সমতলভূমি দিয়ে - না, এগাড়ি এসেছে গয়া হয়ে। ঘুমুচ্ছিলাম তাই দেখিনি - সে পথে জঙ্গল আছে ছোট ছোট টিলা পাহাড়ও আছে। এখানটা তেমনি - অবশ্য জঙ্গল তত ঘন নয়। দেখছি, ভাবছি - কাছেই শংকরগড় - এখানে কেন কেউ দুর্গ গড়েছিল? গৌরী বললো, "দাদু কথা বলছো না কেন?" "কেন তোর কথা বলার লোকের অভাব আছে নাকি, ছায়া-সুশীল, সুশান্ত মঞ্জু তিনটেই প্রায় নববিবাহিত দম্পতি রয়েছিস একই কিউবে - ওরা দুবছরে পড়লো, এক্সপিরিয়েন্স তোর থেকে বেশি।" গৌরী বললো, "জানো এই পথে সীতা বনবাসে

গিয়েছিল। চিত্রকূট তো এই পথেই পড়বে?" "হ্যাঁ এসব আলোচনা ছায়া বা মঞ্জুর সঙ্গে করা যাবে না। তাই বাচ্চু বুড়ুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম। তারা বয়সে ছোট হলেও ভ্রমণ যে একটা জ্ঞানদানকারী বিষয় তা তারা জানে। তিনটে ভ্রমণেই তারা এল। কালিদা বলে ওরা সারাবছর এমনকি পূজোতেও কোন বায়না করে না - কেবল এই ভ্রমণের জন্য ছাড়া - ওদের মাও তাই - তাইতো বেড়াতে পারি। গৌরী বললো, "বেড়ানোর জন্য মন চঞ্চল হলেই তো চলে না, টাকা চাই, সময় চাই।" "হ্যাঁ, সেই ভাবনাটা মানুষকে ভাবতে হয়, কোন অন্য প্রাণীকে ভাবতে হয় না। হ্যাঁ, তুই বলছিলি, সীতার বনবাস নিয়ে কথা বলছিলি - তুই রেগে যাবি, তবু বলি, রামায়ণ একটা পিওরলি গপ্পো। রামায়ণ কার লেখা বল্? বামুনের ঘরের একটা বখে যাওয়া ছেলের লেখা - অনেকটা শরৎচ্যাটার্জীর শ্রীকান্তর মত।" "কী যে সব বলছো দাদু - পবিত্র ধর্মগ্রন্থের সম্বন্ধে এসব বলো না বলছি।" "যা বলছি তা তো রামায়ণ থেকেই বলছি - রত্নাকর নাম ছিল বাল্মীকির - রত্নাকর তো দস্যুতা করতো - বামুনের ঘরের বকে যাওয়া ছেলে নয় সে?" "তুমি খুব পাজি আছ দাদু -" "শোন বলতে চাইছি বাল্মীকির ভৌগলিক জ্ঞান ছিল অত্যন্ত কম - তখনকার মানুষ সবে অক্ষরজ্ঞান পেয়েছে, জানিস তো পৃথিবীর সব পণ্ডিতরা মেনে নিয়েছেন যে রামায়ণই প্রথম লিখিত কোনো গল্পের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ। তার আগেকার সব গল্পই মৌখিক।" "তাতে কী?" "তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে জ্ঞান তখন ছিল মৌখিকতায় সীমাবদ্ধ - তাই তা সঠিক ছিল না। বাল্মীকির আমলে অযোধ্যা কোথায় ছিল তা বোঝা সাধারণের পক্ষে সহজ নয় - যাইহোক মনে হয় কানপুরের পর রামেরা চিত্রকূটের দিকে নেমেছিল এলাহাবাদ হয়ে নামেনি। এলাহাবাদ তখন ছিল ঋষি ভরদ্বাজ ক্ষেত্রম।"

বাচ্চু আর বুড়ু এসে গেল। কিন্তু ভেঙ্গে গেল একান্তে গল্পকথা। অনেকে এসে পড়ল। টিফিন দেওয়া হবে। পাশেই রান্না ঘর। ভিড় বাড়তে আমি সরে গেলাম। শংকর গড় চলে গেল। টিফিন শেষ হতে বিমল এসে বললো, "জ্যাটীদা আসুন তাস খেলি।" বললাম, "ছোড়দা তাস এনেছে তাকে ডাকো।" "ডেকেছি, এসো চিত্রা আর দুর্গার সাথে

আলাপ করিয়ে দিই।" পাশেই আমাদের কিউব। ওদেরটায় সারাক্ষণ প্ল্যাংক পাতা (দুই সিটের মাঝখানে গদিমোড়া একটা সীট আঙটা দিয়ে জোড়া - প্রয়োজনে খুলে রাখা যায়) ফলে তক্তাপোষের মত। হবেই তো দুটো বাচ্ছা আছে - নীহার সাহা আর বিমলের দুটো বাচ্ছা আছে - তাদের পড়ে যাবার ভয় আছে।

নীহার সাহা চার্জম্যান MR Shop পরেশের ব্যাচমেট - চন্দননগরে বাড়ি - রেলের উঁচুদরের স্কাউট। তার স্ত্রী হসপিটালের নার্স - তার বোন ইভা আর মেয়ে আড়াই বছর। বিমল মুখার্জী মিস্ত্রি পাওয়ার হাউস, ভালো ক্যামেরাম্যানও কোলকাতাই। তার স্ত্রী চিত্রা কোতরংয়ের মেয়ে - তার বোন দুর্গা - আর মাস দসেকের ছেলে। মোটামুটি ভাবে জানা ছিল (কেননা পাস লিষ্ট ছিল আমার ফাইলে) আমরা কিউবে যেতে নীহারদার বৌ বাচ্ছা নিয়ে ফার্স্টক্লাসের দিকে চলে গেল। চিত্রা আর দুর্গা বাচ্ছাসহ সরে বসলো জানালার ধারে - ইভা আমার পাশে বসলো। সে পৃথুলা যুবতী। বেশ দীর্ঘকায়াও। বললাম, "জানেন নাকি ব্রিজ খেলতে?" "এমা, জাটীদা তুমি আমায় আপনি বলছ কেন?" "সাধারণত তুইই বলি ছোটদের কিন্তু তুইতো ছোট নোস, আড়ে বহরে বেশ বড়সড় - তাই পারমিশান চাই।" "কত কথা শুনেছি তোমার সম্বন্ধে।" "আমিও তাই - তাই তো বিভূতিদাকে চিনি।" "এমা, ওসব কথা বলছো কেন?" "বাঃ নীহারদারা তো নেই আর এরা সবাইই ব্যাপারটা জানে।" "এমা"। "Open secrete."

বিমল বললো, "জাটী ইভাকে তো চেনো, এখন এদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই।" "ওরাও আমায় চেনে, আমিও ওদের চিনি।" "কেমন করে?" "দেখ বিমল, চিত্রা আমার লোকাল মেয়ে - কোতরংয়ে বাড়ি - ছোটবেলায় ফাংশনে নাচতে দেখেছি। আর দুর্গাকে চিনেছি কলোনীর রাস্তায় - অবশ্যই তোমার বিয়ের পরে - এরা সেদিন দুজনেই ছিল - পাশ লিষ্ট আছে আমারই কাছে সে তো জানোই।" "কি রকম?" জানতে চাইল কর্ণদা। সে এখন আমার পার্টনার। ছোড়দা বসেছ বিমলের পার্টনার। "বলেই ফেলি" - দুর্গা বললো, "জাটীদা, দেখুন সত্যিই আমরা জানতাম না যে এই বেঁটে রং মাথা কারিগরটাই সুশীল জাটী।"

'সে পরে বুঝেছি' বলে কর্ণদাকে বললাম, "ফোরম্যানের কোয়ার্টারে রঙ মেখে ফিরছিলাম তখন আলাপ হয় আরকি।" (আসলে ওরা দুই যুবতী কন্যা আসছিল - চিত্রা সদ্যবিবাহিতা - ননদ সুন্দরী নাচ গান জানা তৎকালীন রেল কলোনীর নয়নমণি, খুব ডাঁটিয়াল, বাবা রেলের অফিসার, দাদা নামকরা ফটোগ্রাফার ফলে আমায় রাগাতে চায় - বেঁটে রংমাখা পোষাক পরা ছেলে চলেছে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে! বলে, "বাবা রঙের কারিগরও রবীন্দ্রনাথ আওড়াচ্ছে।" আমি থেমে গিয়ে বলি, "দুঃখিত এটা মোহিতলাল মজুমদারের কবিতা - "Probably you have never heard his name even " তখন দুর্গা বলে, "তোমায় কিছু বলা হয়নি।" "আমিও কাকেও বলিনি - তবুও যাঁরা শুনেছেন, তাঁদের বলি, আমার নাম সুশীল জাটী N1168 যদি পারেন জেনে নেবেন সে কী এবং কেমন চীজ নমস্কার।)"

তাস খেলা শুরু হল। ইভার চুল মাঝে মাঝেই জানলা দিয়ে বয়ে আসা হাওয়ায় আমার নাকে মুখে লাগছে। বার বার সরাচ্ছি। কবার সাবধান করলাম - কবার ওকে তাস নিয়ে বসতে বললাম। ও খেয়ালই করছে না - পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নবেন্দুর সঙ্গে বকবক করেই যাচ্ছে। রেগেমেগে দিলাম এক টান। বিস্মিত হয়ে দেখি একদলা চুল আমার হাতে - বুঝলাম ইভা উইগ (পরচুলা) পরে, তাই সে চুল সম্বন্ধে এত বেখেয়াল। ইভা লজ্জা পেয়ে আমার হাত থেকে উইগ নিয়ে চলে গেল। ওরা দুই ননদজাও বিস্মিত। চিত্রা বললো, "এ বোঝাই যাচ্ছিল না পরচুলা পরেছে বলে!" দুর্গা বললো, "ভালো উইগ পরলে বোঝা যাবে কেন?" ছোড়দা বললো, "কত সিনেমা আর্টিষ্টই পরে।" আমি নবেন্দুর হাতে তাস দিয়ে চলে গেলাম প্রথম কিউবের দিকে।

মাণিকপুর এসে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই - আউটার সিগন্যাল গাড়িকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। মণিকপুর এসে গেল। এখান থেকে ঝান্সী পর্যন্ত রেললাইন আছে। তিন নম্বর ষ্টেশনের নাম চিত্রকূট করভি। এখান থেকে চিত্রকূট যাওয়া যায়। রামায়ণের বর্ণনামত ভক্তরা সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে। এ রকমই ব্যাপার নাকি সাজানো গোছানো আছে মথুরা বৃন্দাবনে। (পরে দেখেছি, অযোধ্যায় যাইনি কখনো।) অবশ্য

এখানে আছে গুপ্ত গোদাবরী, সতী অনুসূয়ার মন্দির, মন্দাকিনী নদী।

বিকাল হবো হবো সময়ে সাতনায় এলাম। এক নাগাড়ে গাড়িতে বন্দী থাকা যাত্রীরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন। কিন্তু ASM এসে কোচ ডিটাচমেন্টের জন্য সকলকে কোচে উঠে পড়তে বললেন - তারপর আমায় নিয়ে চলে গেলেন অফিসে। কাজ চুকতে জানালেন - কোচ প্লেসিং হয়ে গেছে। সিতাংশু ছিল সঙ্গে। সে প্রশ্ন করে জেনে নিল, প্লাটফর্ম, ইলেকট্রিক, জল সম্বন্ধে। নিশ্চিন্ত মনে কোচে এসে জানা গেল, নবেন্দু আর নীহারদা গেছে বাসের জন্য। চা পান করছি সে সময় এসে নবেন্দু জানালো, "সরকারী বাস ডিপো প্রায় ১০ কিমি দূরে। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, কাছেই একটা বেসরকারী বাস ডিপো আছে, তারা তীর্থযাত্রীদের বাস দেয়। তুই আর সিতু গিয়ে দ্যাখ।"

তখন সন্ধ্যা হবো হবো। অনেক খুঁজে গেলাম বাস ডিপোয়। তারা ৫৬ সীটের একটা বাস দেখালো। এর চাইতে বড় বাস এ অঞ্চলে নেই। ঘাট এরিয়ার 'হেয়ার পিন বেন্ট' আছে - তারা খাজুরাহো ছাড়াও পান্নার রাজবাড়ি ও মন্দির, পাণ্ডবগুহা এবং বালখিল্য মুনিদের আশ্রম দেখাবে। ৪৫০ টাকা পড়বে। আমি বললাম, "৪০০ লিজিয়ে।" "নেহি।" মালিক জানাল। ফলে সিতাংশুকে রেখে একা গাড়িতে ফিরে নবেন্দু আর গোপালদাকে জানিয়ে ফিরে গিয়ে ৪৫০ টাকায় রাজী হয়ে ২৫০ টাকা এ্যাডভান্স করে রিসিট বানিয়ে নিলাম - লিখিয়ে নিলাম কী কী দেখাবে। কাজ সুষ্ঠুভাবে করে দুজনে ফিরে সবাইকে রিপোর্ট করে জানালাম। সকাল ৬টায় ষ্টেশন চত্তরে বাস আসবে। সাড়ে ছটায় যাত্রা শুরু।"

নবেন্দু জানালো, "নীহারদারা এবং দেবুদারা, কানাইদা, গোষ্ঠদা যাবে না।" জানা গেল, নীহারদারা গতবছরই দেখে গেছে। দেবুদার বৌ মীরা বৌদির পেট খারাপ হয়েছে। এই দেবুদা হলো আমার দাদার বন্ধু আবার আমার প্রিয়তম বন্ধু অমিয় ভট্টাচার্যের দাদা, রেলের U.D clerk প্রায় সদ্যবিবাহিত। ফলে খোঁজ নিতে গেলাম। আমাশার মত হয়েছে, তাই রিসক নিতে চান না।

বাচ্ছু, বুড়ু, গৌরীকে বলতেই হলো বালখিল্য ঋষিদের কথা।

হরিদ্বারে ওরা গজকচ্ছপ কাহিনীর রূপদানকারী ভাস্কর্য দেখেছে। গরুড় উপাখ্যানে মহাভারতে এদের কথা আছে। বাস্তবে জানি পিগমী ব্যাঙের হটেনটট (আফ্রিকা), এশিয়া, ইউরোপের 'বামন' মানুষদের। অবনঠাকুরের 'বুড়ো আংলার কথাও এসে গেল। গৌরী মনে করিয়ে দিল গ্যালিভারস ট্রাভেলসের কথা লিলিপুট।

খেয়ে হেঁটে শুয়ে পড়লাম। সুনীল আছে গৌরীদের কিউবের সাইড বার্থে। সুশান্ত তার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। তার ওপরের বার্থে আছে মনা। এরা সবাই আমার ঘনিষ্ঠ লোক। নানান চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোরে বিদ্যুৎদার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি প্রভাতী কাজকর্ম সমাপন করে নিয়ে প্রস্তুতি নিলাম। দেখি, সবাই রেডি। কানাইদারা অমানুষিক পরিশ্রম করেছে। দুই বড় ঝুড়ি ভর্তি লুচি, এক ডেকচি আলুর দম, দু ট্রে ভর্তি মিহিদানা রেডি - এগুলো গাড়িতে যাবে। গোবর্ধন আর শম্ভু নিয়ে গেল। সবাই এখন খেয়ে যাবে ডিম সেদ্ধ, পাউরুটি স্যাঁকা ২ পিস একটা করে সন্দেশ। (সন্দেশের কথায় মনে পড়ে গেল, বিভূতিদা হাওড়ায় একটা প্যাকেট দেয় ইভাকে গোপনে দেওয়ার জন্যে তা এখনো দেওয়া হয়নি। আজ দিয়ে দেব, কেননা আজ নীহারদা যাচ্ছে না)। ব্যাগে তাই সন্দেশের প্যাকেটটা ঢোকালাম। সব শেষে আমরা কজন যখন চা পান শেষে বাসে উঠলাম তখন ৬টা ২০ মিঃ (সিতাংশুর রিষ্টওয়াচ)।

নবেন্দু চা খায় না। সে সবাইকে বসিয়েছে। আমি জায়গা পেয়েছি একেবারে শেষ বেঞ্চিতে। তাতে ছজন বসেছি - ছায়া, সুশীল, মনা, আমি, সুনীল, কর্ণদা। ছোড়দার কাছে আমার ক্যামেরা। নিজের কাছে ঝোলা ব্যাগে গামছা, কিছু বই খাতা, মানিব্যাগ ইত্যাদি। নবেন্দু সবাইকে চেক করে দেখে নিয়ে কণ্ডাক্টরকে বললো, "আভি ছোড়িয়ে।"

এই উপত্যকাটি সমতল এবং অসমতল জমির সমাহার। জানি, পৃথিবীর অন্যতম পান্নার খনি এলাকার নামেই পান্না নাম এখানকার। পড়েছি, পান্নাও এক রকম হীরা - সবুজ রংয়ের। হীরা আবার পাওয়া যায় কয়লা খনিতে। গণ্ডোয়ানার এক হীরাই পৃথিবী বিখ্যাত - তার নাম কোহিনুর।

এখন বসন্তকাল। গত পরশু গেছে দোলপূর্ণিমা। গাছ পালারা সবাই এখনও সেজেওঠেনি। পর্ণমোচীরা কেউ কেউ এখনও নগ্নাঙ্গী। কেউ বা তাম্রাভ, কেউ হরিয়ালী। কয়েকটি পলাশ লালবর্ণের পুষ্প শোভিত। গাছ মানুষের অন্যতম বন্ধু। বসেছি, পিছনের সীটে। দৃষ্টি বারে বারে ব্যাহত হচ্ছে। চিত্ত ও বিক্ষিপ্ত। কোন ভাবনা দানা বাধছে না।

হঠাৎ মৌনতা ভেঙ্গে সুনীল বললো, "জানেন জাটীদা, একটা বইয়ে পড়েছি, পান্নার রাজার কাছ থেকে সাজাহান অনেক পান্না লুঠ করেছিল। পান্নার রাজা সেই পান্নার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পান্নাটি দেয়নি - তাকে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলেন গৃহদেবতা রাধাকৃষ্ণের চরণতলে। তা নাকি এখনো আছে।"

"আমিও পড়েছি এক আমেরিকান সাংবাদিকের লেখায় - পান্নার রাজার থেকে সম্রাট সাজাহান লুঠ করেছিল প্রচুর পান্না। তার কিছু তো ব্যবহাব হয়েছিল তাজমহলে। দামী কিছু পান্না ব্যবহার হয়েছিল মমতাজের ঘরের অলংকরণে - মমতাজের গহনা নির্মাণে এমনকি একটা আয়নার ফ্রেমও ছিল পান্নার। এগুলোর ফটোও দিয়েছিল সেই পত্রিকায়। তা থেকেই বোঝা যায় -বৃটিশরা কত বড় লুঠেরা ছিল। সেই সাংবাদিকই লিখেছিলেন বৃটিশদের ভারতলুণ্ঠিত সম্পদের এক ভগ্নাংশই আছে বৃটিশ মিউজিয়ামে।" (সুনীলের উল্লিখিত পান্নাটি পরে অন্যবার দেখেছি।)

এইভাবে ঘাট এরিয়ায় এসে গেলাম। স্বল্পোচ্চ পাহাড় - ঘন বনাবৃত। উঁচু নীচু রাস্তা। কেটে কেটে বানানো পথ। পথ ধীরে ধীরে উঠছে। সমস্ত টার্নই S এর মত ঘুর্ণায়মান। কোথাও পথ খুবই সংকীর্ণ। মুসৌরী যাবার কথা মনে পড়ছিল। তবে সে পথ আরো উঁচু। চালক দক্ষতার সঙ্গে চালাচ্ছে। গাড়ি বিশেষ লাফাচ্ছে না। এ পথে ওভারটেক নিষিদ্ধ। বিপরীত গামী গাড়িকে রাস্তার চওড়া এলাকায় দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে। ধীরে ধীরে শেষ ধাপ থেকে বাস নেমে পড়লো সমতলভূমিতে। পাহাড়টা খুব একটা চ্যাটালো নয়। বড় বাসের পক্ষে শেফ নয় শেষ ধাপটা। সামান্য সময় স্টপেজ দিয়েই বাস গতি বাড়ালো। সমস্ত বাস কোলাহল মুখরিত। প্রায় সবাই কথা বলছে। মনে হয়

এতক্ষণ ভয়ে চুপচাপ ছিল।

কিছুটা পরই বিপরীতগামী অনেক যানবাহন দেখা গেল। রাস্তা মোটামুটি চওড়া এবং পরিস্কার। এই সময় একটা লরি বাসে সামান্য ধাক্কা লাগিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালালো। নামলাম কজনেই। বাসের গায়ের প্লেটটা কেউ যেন ছুরি চালিয়ে কেটে দিয়েছে। বাসের ক্ষতি হলেও যাত্রীরা কেউ সামান্যতম ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। গাড়ি থেকে একমাত্র মহিলা নেমেছে ছায়া। স্বামীকে কী বলে ঝোপের আড়ালে চলে গেল। কণ্ডাকটর জানালো বাসের বিশেষ ক্ষতি হয়নি। কাছেই রিপেয়ারিং সপ আছে। আধঘন্টার মধ্যে সারাই হয়ে যাবে। প্রশ্ন করতে জানা গেল কাছেই বেনীসাগর। ওকে বললাম, পথ থেকে তুলে নিও, আমরা হেঁটে এগুচ্ছি। কর্ণদা চলে গেল বাসে। মনার ডাকে ছোড়দা, গোবর্ধন আর শম্ভু নেমে এল।

বেনীসাগর বেশ বড় জলাশয় - প্রাকৃতিক হ্রদ। আশেপাশের বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে জলদান করে। মনে হল, বর্তমানে এর তীরভূমিকে পিকনিক স্পট হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কয়েকটি চন্দ্রাতপ মার্কা স্থান করা হয়েছে। সেখানে উনুন করা আছে। হ্রদের পাশে কোথাও ঝোপজঙ্গল, কোথাও বা মহীরুহ শ্রেণী। একটি আম গাছে বোল এসেছে। দূরে দুটি ছোট মন্দির দেখা গেল। মাইল দুয়েক হাটার পর বেনীসাগরের মাঝবরাবর বাস আমাদের তুলে নিল। তারপর একদৌড়ে নামিয়ে দিল খাজুরাহের মন্দির গোষ্ঠীর সামনে। যাত্রীরা হুড়মুড় করে নেমে পড়লো। কণ্ডাকটর জানালো তারা সরকারী গেষ্ট হাউসের সামনে থাকবে। হাতের নির্দেশে স্থানটির অবস্থান বুঝিয়ে দিল।

জীবনের প্রথম স্বাধীন ভ্রমণেই কোনার্ক দেখেছি - সেখানে কিছু কাম কলার ভাস্কর্য্য দেখেছি - অনেকের সাথেই দেখেছি তা অনেকের মত আমাকেও কামুক করে তুলেছিল। তবু পড়েছি (পরে দেখেছি স্কেচও করেছি কিছু) তার অধিকাংশই শৈল্পিক গুণান্বিত - কিন্তু খাজুরাহোর খোদিত কামকলা যতটা জান্তব ও বাস্তব ততটা শিল্প সমৃদ্ধ নয়। পড়েছি, তার অনেকগুলিই অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। তাই ঠিক করেছিলাম খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে ঘুরবো এবং ফটো তুলে নেব। তাই ক্যামেরাটা ছোড়দার

কাছ থেকে নিয়ে গলায় ঝোলালাম।

কিন্তু বিরক্ত চিত্তে দেখলাম সবাই যে যার মনোমত সঙ্গী জুটিয়ে ঢুকে পড়েছে। একা সঙ্গীহীন অমিয় গুপ্ত অপেক্ষমান। সে প্রথম ট্যুরে গেসলো (সেই যে ম্যারিনার বীচে মাছ কিনেছিল।) উত্তরপাড়াতে থাকে। এনট্রি ফী নেই (এখন আছে) সামনেই বরাহ মন্দির। কিছুটা দূরেই বিখ্যাত মন্দির কাণ্ডেরীয় মহাদেবের। মন্দিরটি ছোট-সাত আটটি ধাপ পেরিয়ে উপরে উঠতে হবে। মাথায় চন্দ্রাতাপের মতো ছাদ - পিলারগুলো ফাঁকা ফাঁকা। বিশাল বরাহমূর্তি তার গায়ে নানা দেবদেবীর মূর্তি। কোন জায়গা থেকেই পুরো বরাহের মূর্তিটা ক্যামেরার লেন্সে ধরা পড়ছে না। ফলে পিলার ধরে সরু পাঁচিলে উঠে ফটো নিতে গিয়ে পপাত ধরণীতল হলাম। নীচে কঠিন প্রস্তরবেদী। কোমরে প্রচণ্ড কষ্ট পেলাম। তবু ক্যামেরাটা ক্ষতিগ্রস্ত হল কিনা দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে কষ্টে সৃষ্টে পথের বাইরে সবুজ ঘাসের লনে বসলাম।

অমিয় স্কেচ করছিল কাণ্ডেরীয়র সম্মুখভাগে দাঁড়িয়ে। শব্দ শুনে এসে বললো, "উপুড় হয়ে শোও।" সে বিখ্যাত বক্সার সুদেহী - শুনেছি ভালো ম্যাসাজ জানে। সে আমায় ম্যাসেজ করতে থাকলো। অন্য কেউ দেখে খবর দিয়েছিল হয়তো - মিনিট দশেক পরে ছোড়দা, চিত্ত গৌরী এসে হাজির। ওদের চলে যেতে বলে ছোড়দাকে ক্যামেরাটা দিয়ে দিলাম। জানলাম, "খুব একটা কষ্ট আর নেই। দেখে নিগে যা গৌরী। আমি আবার পরে আসবো তখন দেখবো।" ওরা চলে যেতে অমিয়কে বললাম, "তুমিও গেলে না কেন?" সে বললো, "কাউকে ফেলে পালানো আমার স্বভাব নয়।" বললাম, "ঠিক আছে, আমি বসছি, তুমি গিয়ে তোমার স্কেচ ফিনিস করো"। "না থাক, আবার উপুড় হও ম্যাসেজ করি।"

(এখানেই জানিয়ে রাখি, অমিয় প্রয়াত। আমাদের সঙ্গে রূপকুণ্ডু ভ্রমণে গিয়ে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ৯২ দিন হাসপাতালে থেকে সে সেরে ওঠে। পরের বার সে আর সারেনি। মারা যায় B. R. Singa RLYHOSPITAL -এ আমিই মর্গ থেকে তার মৃতদেহ বার করি। দাহকার্য্যও আমায় সম্পন্ন করতে হয়।)

কিন্তু বিশ্রাম নেওয়া হল না। ইভা এসে জানালো, "জাটীদা, সুনীল গোস্বামীর সানষ্ট্রোক হয়ে গেছে। সে অজ্ঞান হয়ে গেছে। দেবুদা আর কুণ্ডু আপনাকে ডাকতে বললো।" বললাম, 'আমিও ওখান থেকে পড়ে কষ্ট পাচ্ছি - তা হোক, চল ভাই অমিয়।"

কষ্ট নিয়েই গেলাম। সরকারী গেষ্ট হাউসের কভার্ড বারান্দায় শুইয়েছে। বালীর গোস্বামী - ফর্সা ল্যানকি ফিগার - কুণ্ডুর বন্ধু। কুণ্ডু বললো, "ডাক্তার চাই।" "ডাকোনি কেন?" "কেউ ভাষা বুঝছে না।" কুণ্ডুকে সঙ্গে নিয়ে অফিসে গেলাম। জানা গেল, কাছেই ডাক্তার শর্মার বাড়ি, গেলাম। ডেকে আনলাম। আধঘন্টা লেগে গেল। তিনি সব শুনে, পরীক্ষা করে বললেন - "It is not a case of sun stroke. It is but Nefritics." নামই শুনিনি এই রোগের (তখনও পর্যন্ত) প্রশ্ন করলাম "How then, we will serve him?" বললেন "I may prescribe the medicine, but to day the mart is closed cant give him any medicine. Pl. arrange to take him to Panna or Satna, entire him in a hospital - no fear, he will not die soon. He will get his sense aback swiftly but remember." -- বলে সুনীলকে ম্যাসাজ করে দিলেন গলার পিছন দিকে সুনীল চোখ খুলতে বললেন - "Give him no salty food to eat. Salt is his foe for life time."

জল চাইতে ইভার ফ্লাস্ক থেকে জল পান করিয়ে দিলেন - পরে সুনীলকে উঠে বসতে সাহায্য করলেন।

সবাইকে বুঝিয়ে বললাম। লবনাক্ত খাবার সুনীলের পক্ষে বিষ। ডাক্তার প্রেসক্রিপসন লিখে দিয়ে ১০ টাকা নিয়ে চলে গেলেন। আমি, অমিয় আর গোস্বামী রইলাম। কুণ্ডু আর দেবুদা গেল দাবা খানার মালিককে খুঁজতে। তারই বন্ধু, সে টাকা দিয়েছে, প্রেসক্রিপসন তারই হাতে। ইভা বলে গেল, কাছেই মিউজিয়াম, সেটা এক ঝলক দেখে আসি।" চলে গেল শম্ভু আর শচীন। আমরা কেবল তিনজন। দুজন অসুস্থকে নিয়ে একা অমিয়।

কুণ্ডু আর দেবুদা ফিরলো হাসিমুখে। সঙ্গে দুজন মোটর বাইক আরোহী ডাক্তার। বাইকে রেড ক্রশ আঁকা দেখেই কুণ্ডু তাঁদের

প্রেসক্রিপশন দেখায়। তাঁরা দেখতে এসেছেন। বাঃ কী চমৎকার। সুনীলের সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা বলে বললেন, "Yes, diagonasis is correct but see you that I have not the said medicine as prescribed by the doctor. I have a separate medicine of Nefrities. I have to meet the doctor." কুণ্ডুকে বাইকে বসিয়ে ডাক্তারের বাড়ি গেলেন। ফিরে এসে একটা কুড়িটা ওষুধ আছে এমন ফয়েল দিলেন কুণ্ডুর হাতে। দুপুরের মিলের আগে রোজ একটা করে খেতে হবে। বললেন, নুন খাওয়া জীবনের মত নিষিদ্ধ। ট্যুর শেষ করতে এর কোন অসুবিধা হবে না, যদি লবনাক্ত খাবার আর না খায়। কিছুতেই কোন টাকা নিলেন না। জানালেন, ওষুধটা ফ্রি স্যামপল। সবাইয়ের সঙ্গে করমর্দন করে গেলেন। (এরাও সব ইংরাজীতে বলেছিলেন - সংক্ষেপে বাংলায় লিখলাম।) ইতিমধ্যে কয়েকজন ফিরে এসেছে দেখে অমিয়কে বললাম, "চলো, মিউজিয়ামটাই দেখে আসি" গেল না সঙ্গে - তখন ইভাকে পেয়ে তার কাছে জেনে চলে গেলাম একাই। আট আনা প্রবেশমূল্য। সদ্য গড়ে উঠেছে - উপরে নীচে মাত্র চারখানা হল। দর্শনার্থী প্রায় নেই। মন্দির গাত্রের কিছু কামকলার রেপ্লিকা আছে। এইসব জেনে প্রবেশ করলাম না। একটা গদিওয়ালা চেয়ার পেয়ে বাইরের বারান্দার ছায়ায় বসে পড়লাম। কোমরের যন্ত্রণার কথাটা মনে পড়লো। এতক্ষণ কী করে কার্জ করলাম এই যন্ত্রণা নিয়ে?

দেরী হয়ে গেল ফিরতে। সবায়ের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। সুনীল গোস্বামীকে তরমুজ খাওয়াচ্ছে অমিয়। বেশ কয়েকজন বাসে উঠে পড়েছে। নবেন্দু প্রশ্ন করলো, "কোথায় ছিলিস?" "বোধ হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।" "সুনীল খুঁজছিল - খাসনি তো?" ডেকচিতে মাত্র গোটা আটেক লুচি। সামান্য আলুরদম। ইভা একা দাঁড়িয়ে - বললাম, "মিহিদানা কোথায়?" "সবার খাওয়া হয়ে গেছে।" "আমি তো খাইনি।" "ঈশ, তাই কাঁড়ারদা তোমায় খুঁজছিল।" আমি কথা না বাড়িয়ে চারটে লুচি আর দুটো আলু তুলে নিলাম। "সবটা নিয়ে নাও।" "শোন্, বিভূতিদা তোকে একটা প্যাকেট দিতে বলেছিল হাওড়ায় ওটা আজ ব্যাগে এনেছি - ব্যাগ থেকে প্যাকেটটা নিয়ে নে"। "এমা!"

"নীহারদা তো আজ নেই - তাই এনেছি।" "যাক ভালই হলো - এতে সন্দেশ আছে তুমি মিহিদানা নাওনি - সন্দেশ দিয়ে সব কটা লুচি খেয়ে নাও।" "বা জলভরা সন্দেশ দেখছি - সুনীল গোস্বামীকেও একটা খাওয়াস।" "তুমি খাও তো।" বলে হেসে চলে গেল সুনীল গোস্বামীর দিকে। আমি খেতে থাকলাম।

খেয়ে উঠে বাসে গেলাম। অনেকেই উঠে বসেছে। সুনীল গোস্বামীকে আমাদের সীটে শোয়ানো হয়েছে। কুণ্ডু আর দেবুদা তার কাছে আছে। নেমে দেখি বাস কণ্ডাকটর বাসের তলা থেকে বের হল। প্রশ্ন করলাম, "ক্যা ফৈজৎ?" "কুছনা - চলিয়ে বাস আবি তৈয়ার।"

বাসে উঠে নূতন সমস্যা। জায়গা কম। দুজন অপরিচিতা মহিলা - পোষাকে আসাকে উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের। আমাদের মহিলারা অভিযোগ করছেন, অথচ তাঁদের প্রশ্ন করছে না। প্রশ্নিত হতে জানালেন, তাঁর কণ্ডাকটরকে টাকা দিয়ে সীট নিয়েছেন। ফলে কণ্ডাকটরকে ডাকা হলো। সে স্বীকারও করলো। তখন তাকে জানলাম, বাস এখন তার নয়, বাস এখন আমাদের। সে যেন এঁদের নেমে যেতে বলে। মহিলা তখন জানান যে, তিনি সাতনা থানার O.C র স্ত্রী আর সঙ্গীনী হচ্ছে তাঁর বোন। তাঁরা বর্তমানে হেল্পলেশ, 'তাঁদের লিফট দিতেই হবে। তখন জানালাম, লিফট দিতে অস্বীকার করিনি - তাদের নেমে যেতে বলছি না, বলছি কণ্ডাকটর লিফ্‌ট দিচ্ছে না, আমরা দিচ্ছি। কণ্ডাকটর টাকা ফেরৎ না দিলে তাকে গাড়ি নিতে দেব না। তখন ননদ ব্যাপারটা বুঝে কণ্ডাকটরকে খাস মধ্যপ্রদেশীয় ভাষায় কী বলে ৪০ টাকা ফেরৎ নিল। কণ্ডাকটর রেগে গেল আমার ওপর।

রড ধরে চলছি সিতাংশু, কর্ণদা, আমি, সুনীল কাঁড়ার, অমিয় আর শম্ভু। কাঁড়ারকে আমার পতনকাহিনী বললাম। সে বললো, "গাড়িতে ফিরেই আর্নিকা খাইয়ে দেব। আপনি তাহলে দাঁড়ালেন কেন?" "ব্যস্ত হয়ো না। বরং বলো কী দেখলে?" (অনেক কথা বলেছিল - সব মনে নেই তবু) বলেছিল, পান্নার রাজারা ছিল চান্দেলা বংশীয়। মন্দিরগুলো ৯০০-১১০০ খৃষ্টাব্দে গঠিত। গোটা নব্বুই মন্দির ছিল। মাইল ছয়েক বর্গমাইল এলাকা জুড়ে আছে মন্দির। আমরা যেদিকটায় গেছি সেটা

পশ্চিমে। পূর্বে আর দক্ষিণেও অনেক মন্দির আছে। এর অনেকগুলো এখন ধ্বংস পেয়েছে। এদের ভগ্ন অংশগুলো আছে যাদুঘরে। বললাম, "ঈশ, এ জানলে তো যাদুঘরে ঢুকতাম।" "যাননি? তবে অত দেরী হল কেন?" "একটা লোক বললো, কিছু নেই। তাছাড়া কোমরে কষ্ট হচ্ছিল, দেখলাম, একটা গদি মোড়া চেয়ার খালি - বসে- মনে হয় কিছুটা ঘুমিয়েও পড়েছিলাম।" "১২টা মাত্র মন্দির এখন পশ্চিম প্রাঙ্গনে - তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল কাণ্ডেরীয় মহাদেব মন্দির। তবে জগদ্ধাত্রী মন্দির, বিশ্বনাথ মন্দির, পার্বতী মন্দিরও কিছু কমতি নয়। সত্যি কথা বলতে এতেই আমার দম ফুরিয়ে গেসলো - কী ভীষণ রোদ। সরি, লক্ষমণ মন্দিরের কথা বলাই হয়নি। লক্ষমণ বর্মণই প্রথম এক মন্দির গড়েন বিষ্ণুর - পরে রাজার নামে মন্দিরের নাম হয়ে যায়। বরাহমন্দিরের মতই নন্দী মন্দির আছে। মাতঙ্গী মন্দিরে আজও পুজো হয়। সব শেষে রয়েছে এই যে শিবসাগর-এর পাড়ে চৌষট্ যোগিনী মন্দির।"

বেনীসাগর পেরিয়েছি অনেকক্ষণ এবার ঘাট এরিয়া এসে যাবে। রাস্তা ধীরে ধীরে উঠছে। কিছুটা চলার পর বললাম, "তুমি তো কেবল মন্দিরের নাম বললে।" "সে সব বলা যাবে না এখানে - তবে অধিকাংশ মন্দিরেই মূল দেবমূর্তি আছে। কাণ্ডেরীয় মন্দির ছাড়া অন্যত্র মন্দিরের ভিতরে মিথুনমূর্তি নেই।" "তবে কোথায় আছে?" "মন্দিরের বহির্ভাগের দেওয়ালে।" "আচ্ছা, পড়েছি, এখানের মন্দির গাত্রেই আছে বিশ্ববিখ্যাত স্থাপত্য পত্রলেখা - নগ্নাঙ্গী যুবতী পত্রলিখনে ব্যস্ত - যা নাকি প্রমাণ করেছে নগ্নযুগেই বর্ণমালা আবিষ্কৃত হয়েছিল।" "দেখিনি এত ছবি মানে আধাক্ষোদা ভাস্কর্য্য ভালো ভাবে দেখতে গেলে সময় চাই, ধৈর্য্য চাই, জ্ঞান চাই - ঈস, আপনি সঙ্গে থাকলে খুব ভালো হত।" "শোন , আরো একটা বিশ্বখ্যাত ছবি আছে বলে পড়েছি - তার ফটোও দেখেছি দর্পনে প্রতিবিম্বিত নারী।" "আয়নাও আবিষ্কৃত হয়েছিল আদিমযুগে?" "নিজেই বললে, মন্দির হয়েছে ৯০০ খৃষ্টাব্দে" "তবে যে আপনি বর্ণমালা নিয়ে বললেন!" "পড়েছি -ছবির পারসপেকটিভ দেখে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন। এ ছবি নিয়ে তেমন কিছু পড়িনি।"

হঠাৎ শরীর টলে গেল - সবাই একবার কাছে আসছি - একবার

দূরে সরে যাচ্ছি। হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে আছি বাসের রড। বুঝলাম, বাস গড়িয়ে যাচ্ছে। যাক্ থামলো। কণ্ডাকটর প্রথমে নামলো। (পরে জেনেছি বাসের টাইরড কেটে গেছে।) সবাই পিছনের দরজা দিয়ে নামলো। আমায় নামিয়ে দিয়ে সুনীল গেল অন্যদের সাহায্য করতে। ভীষণ অবসন্ন লাগছে। কোমরের যন্ত্রণাটা বেড়ে গেছে। ধীরে ধীরে একাই চলে উঠে এলাম রাস্তায়। পরে দেখেছি বাসকে সবাই মিলে রাস্তায় তুলেছে। সামান্য দূরেই সুনীল গোস্বামী রাস্তাতেই শুয়ে আছে - একা কুণ্ডু তার কাছে দাঁড়িয়ে। আমি রাস্তা পেরিয়ে একটা চাতালের মত পেলাম পথ থেকে সামান্য উচু হলেও সমতল দেখে সেখানে বসে পড়লাম। (পরে জেনেছি বাস ১৪-১৫ ফুট মাত্র নেমে গেসলো। একটা বড় পাথরে চাকা আটকে যাওয়ায় সবাই বেঁচে গেছি)। সবাই সন্ত্রস্ত। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও অপরকেও সামলাচ্ছে। বিদ্যুৎদা দেখি, গোবর্ধনকে নিয়ে ডেকচি আনছে রাস্তায়। তাহলে কী হবে? এ বাস বর বাদ! চিন্তা করছি - কিন্তু সঠিক কিছু জানতে পারছি না। উঠতে ইচ্ছেই করছে না। নিজেকে একজন দর্শক মনে হচ্ছে। ছোড়দা, বিদ্যুৎদা, নবেন্দু এমনকি সুনীলের ওপর বিরক্ত হচ্ছি। সবাই রাস্তায়। আমার কথা কেউ খেয়াল করছে না।

ঘন্টা দেড়েক পরে একটা বড়সড় পিক আপ ভ্যান এল। তাকে থামালো যাত্রীরা। কয়েকজন উঠে পড়লো। সুনীল গোস্বামীকে নিয়ে উঠে গেল কুণ্ডু আর দেবুদা। অন্ধকার নামতে শুরু করে দিয়েছে। উঁচুতে আছি বলে এখনও আলোর রেশ আছে। কারা কারা চলে গেল তা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত উঠতেই হল। প্রাকৃতিক আহবানে সাড়া দিতে নীচে নামতেই হল। ফলে খানিকটা হাটলাম। ফিরে আবার বসতে যাচ্ছি তখন দুর্গা এসে বললো, "আবার উঠছেন কেন?" "ওখানটা বেশ পরিষ্কার আর সমতল।" আমি সঙ্গে গেলে অসুবিধে আছে?" "আমার আবার অসুবিধে কী? অসুবিধে তো মেয়েদের ব্যাপার! বিমল কোথায় গেল?"

উত্তরে সে কে কে চলে গেছে জানালো। জানা গেল, বিরাট গাড়ি। চালক আমেরিকান। ১২ জন চলে গেছে। বিমল তাকে বলে

গেছে "জাটীর কাছে থাকতে।" "আমাকে তাহলে বিমলও ভয় পায় না।" জানলাম। দুর্গাও হেসে বললো, সব হারানো মেয়েদের ভয় করলে চলে না - জাটীদা। তুমি তো সবই জানো। "কেউই সবজান্তা নয়। ভাসা ভাসা জানি। শুনেছি সামান্য। তবু বলি, জীবন সামান্য নয়। প্রকৃতির অপরূপ দান। তাকে ব্যর্থ হতে দিস না - সদর্থক হবার জন্য চেষ্টা তো করতেই হবে।" "শম্ভু খুব জ্বালাচ্ছে।" 'বলিস তো থাবড়ে দিতে পারি। তবে কেয়স সৃষ্টি করা যাবে না। Keep yourself safe." (অনেক কথা বলেছিলাম দুজনে। সব কথা লেখা যায় না, যাবে না। নিজেদের পরস্পরকে জানিয়েছিলাম। পরে কবার ভদ্রকালীতে গঙ্গার ঘাটেও মিট করেছে। ওকে বিয়েতে রাজী করিয়েছি। নিমন্ত্রণ করেছিল বিমল। উপহার পাঠালেও যাইনি।)

শম্ভু মধ্যে মধ্যে উঁকি মারছিল। সে ডেকে নিল। সার্ভিস বাস দাঁড় করিয়ে সবাই উঠে পড়লাম। শম্ভুই জানালো, "কণ্ডাকটর মেকানিক আনবে বলে গেছে। ড্রাইভার বলেছে, 'কব সারাই হোগা কেয়া জানে, আপ চলা যাইয়ে।' বাস কিছুটা খালি ছিল। একেবারে ভর্তি হয়ে গেল। দুর্গা পাশেই বসলো। দেখি সুফল কয়াল রয়েছে পাশে তার বৌ বাচ্ছা! দুর্গা বলেছিল, বাচ্ছা সমেত সব মাকে গাড়িতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাহলে চিত্ত গৌরী গেল কেন? সুফল তো যেতে পারতো! দুর্গা জানালো, 'নবেন্দুদা ওনাকেই যেতে বলেছিলেন, উনি যেতে রাজী না হতে চিত্তদাকে বলেন। গৌরী নারাজ হয়ে আমায় যেতে বলে। নবেন্দুদা তখন ওদের দুজনকেই তুলে দেয়। বিশ্বাস করো, তোমার আঘাতের কথা তখন কারোরই মনে ছিল না'।

বাস ধীরে ঘাট এরিয়া পেরুচ্ছে। শেষ ধাপ পেরিয়ে স্টপেজ দিল। স্থানীয় মানুষ কিছু নামলো। তার পরই প্রথমেই উঠে এল গৌরী। বাসে হৈ চৈ পড়ে গেল। সুনীল গোস্বামীকে তুলে শোয়ানো হল। উঠে আবার দাঁড়ালাম। দলের চলে আসা সবাই উঠে পড়তে বাস ছাড়লো। কী করে এমনটা হলো? সবাই প্রশ্ন করছে। জানা গেল, শেষ ধাপে একটা মোষকে বাঁচাতে গিয়ে পিকআপ ভ্যানটা স্কিড করে। কেউ হতাহত হয়নি। আমেরিকান চালক এখনও স্থানীয় একজনের সাহায্যে গাড়ি

সারাতে ব্যস্ত। (পরে নবেন্দু বলেছিল, 'গৌরী বলেছে, ভেবেছিলাম দলে একজন অপয়া আছে। এখন ভাবছি সবাই অপয়া।) কাকতালীয় ব্যাপার। এমন ঘটনা, এমন দুর্যোগের ঘনঘটা সিনেমাতেই দেখা যায়। যাক্, এবার নিশ্চিন্ত - সবাই আবার এক হয়েছি। কিন্তু গাড়িতে থাকা লোকেরা - নীহারদা, দেবুদা, কানাইদারা কী ভাবছে কে জানে? পাশে রড ধরে দাঁড়ানো দুর্গা তার ছেড়ে আসা সীটে বসা চিত্রার সঙ্গে কথা বলেই চলেছে।

দূরে দেখা গেল আলোকিত সাতনাকে। মন খুশিয়াল হল। কিন্তু প্রবাদ বাক্য অনুযায়ী 'বিপদ কখনো একলা আসে না'। আবার বিপত্তি! পুলিশ ধরে নিয়েছে আমাদের ভিড়াক্রান্ত বাসকে। এত লোক তোলার আইন নেই এখানে। ড্রাইভার আর কণ্ডাকটরকে ধরে নিয়ে গেছে। খেয়াল হলো, আমাদের সঙ্গে আছেন O. C-র স্ত্রী - তাঁকে লিফট দিচ্ছি। তাঁকে বললাম। তিনি ননদকে সঙ্গে দিলেন। ফল ফললো দ্রুতই। ননদটী খুব সুন্দর ইংরাজীতে ইয়ং পুলিশ অফিসারকে বুঝিয়ে বলার পর বাস ছাড়া পেল। সামান্য পরই RLYSTN-এ পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলাম।

(নবেন্দু বলেছিল পরে O. C ছিলেন রেল স্টেশনে। অনেক ধন্যবাদ দিয়েছেন চরৈবেতিকে। O. C-র বোন বলেছে, ৭২ জনের বেশি টিকিট কাটার আইন নেই। কণ্ডাকটর তা করেছিল। তাদের খোঁজেই তারা ব্যস্ত ছিল। তাদের দেখেই বাস ছেড়ে দেয়।)

ঠিকই ভেবেছিলাম, ওরাও খুব চিন্তা করছিল। কানাইদা, গোষ্টদার রান্না, আনাড়ী হাতে দেবুদার পরিবেশন আর দক্ষহাতে নিহারদার পরিবেশনে বেশ তৃপ্তি করেই মাছের ঝোল ভাত খেলাম। রুটি আনাবার ইচ্ছাই হয়নি। সুনীল গেল খচে। বললো, "ওষুধটা মনে করে খেলেন না।" বললাম, "প্রবীর বলেছে, মনে না থাকলে ওষুধ খেতে নেই।" সুনীল বললো, "সব সময় রেডি জবাব কী করে দেন?" হাসলাম।

যাঁরা এ পর্যন্ত পড়ে ভাবছেন - সাতনা-খাজুরাহো কাণ্ড শেষ হয়ে গেল - তাঁরা ভুল ভাবছেন। সুনীলের কথামত কিছুটা হেঁটে , সব চেক করে - ওষুধ খেয়ে শুতে প্রায় বারোটা বেজে গেল। মনে জানি, বাস

পাওনাগণ্ডা বুঝে নেবে। কণ্ডাকটরের ঝাল আছে। তার চল্লিশটা টাকা খসিয়ে দিয়েছি। আমার ওপর তার খার আছে। সবাই তো বেশ মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এটা সত্যিই যে লিফট দিচ্ছি চরৈবেতী - কণ্ডাকটর দিচ্ছে না - তাছাড়া সে টাকা নিয়েছিল। না, আমার কোন দোষ নেই। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়েছি। রাত তখন সাড়ে তিনটে হবে - ওরা দুজনে এসে ডাক দিতে প্রথমে সিতাংশু, পরে আমায় ডেকে তোলে। আমি তাদের পুরো টাকা দিতে অস্বীকার করি। নানা তর্ক জুড়ে দেয় তারা, ভয়ও দেখায়। তখন তাদের মালিককে আনতে বলি। ওরা চলে যায়। আবার শুয়ে পড়ি।

কিন্তু ঘুম এল না। ওরা হুমকি দিয়ে গেছে। ওরা লোকাল লোক। পাঁচটা থেকে কোচ টানাটানি শুরু করে দিল। জালগাও যাবে কোচ - সকাল ৭টার প্যাসেঞ্জারে। ৬টায় কোচ এ্যাটাচ করে প্লাটফর্মে প্লেস করে দিল। প্রভাতী কাজ সেরে এসে শুনি গোলমাল হচ্ছে। কী ব্যাপার! দেখতে যেতে গোপালদা বললো, "জাটী ঝামেলা না করে পুরো টাকাটাই দিয়ে দিও।"

কোচ থেকে নামলাম একাই। মালিক লোক নিয়ে এসেছে পনেরো ষোল জন। তাদের কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে বেলচে। কাছে গিয়ে মালিককে প্রশ্ন করলাম, "এ কেয়া হ্যায়? হামলা করনে আয়া? চলিয়ে RPF অফিসমে, শুনিয়ে হ্যম সব কোঈ রেলমে নোকরী করতা, দেখতা রিজার্ভ ডিব্বামে আয়া - অফিসারভি আয়া - শান্ত হোকে বাৎ বোলিয়ে।" মালিক বললো - "রূপেয়া না দেকর আপ চল্ যাতা - বাৎ না বলি?" "রূপেয়া রেডি হ্যায়, দেনে তৈয়ার - কণ্ডাকটরকো বোলা তুমকো ইধর লে আনে, চলিয়ে RPF OFFICE উধরহি রূপেয়াকা হিসাব জুড়েগা - পিছে পেমেন্ট হোগা ঠিক হ্যায়?"

এক প্রকাণ্ড দেহী শিখ এগিয়ে এসে বললো, "ইধরই হিসাব জুড়িয়ে।" বললাম, "আংরেজি আখবর পহচানতা?" "জী।" "তব শুনিয়ে গলত বাৎবোলেগা তো মালিক বাধা দেগা ঠিক হ্যায়?" "বলিয়ে"। "সাড়ে চার শও রূপেয়া কা কনট্যাক্ট হুয়া - খাজুরাহো ছোড়কে আওর তিন জাগাহ দেখানাকে কনট্যাক্ট হুয়া - অনেকা টাইমমে

গাড়ি গির পড়ে - দুসরে বাসমে হ্যম চলা আয়া - রাত সাড়ে তিন বজে ড্রাইভার আউর কণ্ডাকটর আয়া রূপেয়া মাঙ্গা। কেয়া মালিক, ঠিক বোল্‌তা? মালিক বললো, হাঁ লেকিন "বললাম" এ দেনো আদমীকো সমঝায়া ৭৫ পঁচাত্তর রূপেয়া কমতি দেগা - দেখিয়ে বাস ফেয়ার তো কাটনাই চাহেগা ও লোগ গালি দেকর, ডর দেখাকে চল্‌ দিয়া - বাতাইয়ে ক্যায়া কসুর মেরা।" শিখনন্দন বললো, "শওয়া রূপেয়া কমতি দিজিয়ে। কেয়া মালিক ঠিক হ্যয় না?" এরপর গণ্ডগোল মিটে গেল। মালিক আমাকে Full Paid রিসিট বানিয়ে দিল। আমি একশো টাকা দিলাম।

ততক্ষণে নবেন্দু, বিদ্যুৎদা, শুভেন্দু - দুর্গা আর গৌরী এসে গেসলো। বিদ্যুৎদা বললো, "গাড়িতে চলো"। শুভেন্দু বললো, "চলুন জাটীদা বাইরের দোকানে চা খেয়ে আসি" বলে সেই শিখটার কাছে চলে গেল। আমি ব্যাগ আর রিসিট বিদ্যুৎদাকে দিয়ে গৌরীকে প্রশ্ন করলাম, "ভয় পেয়েছিস নাকি?" "না তোমার কেরামতি দেখতে এলাম। দুগ্গাদি বলছে কী সাহস!" হেসে বললাম, "গাড়ি ছাড়তে দেরী আছে - যাই চা খেয়ে আসি"।

গাড়ি ছাড়ার কিছু আগে ফিরলাম। কোচে আমি হিরো হয়ে গেছি। বিদ্যুৎদা নাকি বলেছে, 'আজকের দিনে একশো টাকা বাঁচানো কম কথা নয় - একা একা লড়ে গেল।' শুনে গতবছরে মথুরায় বিদ্যুৎদার কাণ্ড মনে পড়ে গেল। নবেন্দু বললো, "শিখ লোকটা কে?" "তখন তো চিনতাম না - এখন জানি - লোকটা আগে ছিল ট্রাক ড্রাইভার - এখন ট্রাক মালিক। কাছে থাকে, বাড়ি করেছে - বৌ ছেলে আছে। এখানে গুরদোয়ারা করবে ভাবছে । সবাই মানে তাকে - এমনকি এখানকার O. C-ও তাকে জানে মানে। বোঝা যায় না, তবু বললো ওর বয়স পঞ্চান্ন।" "পঞ্চান্ন? বোঝা সত্যিই যায়নি।"

প্যাসেঞ্জার ট্রেন। গাড়ি চলছে ধীর গতিতে। সুনিলের দেওয়া আর্নিকা খুব কাজ দিয়েছে। কোমরের যন্ত্রণা প্রায় নেই বললেই হয়। সুনীল বললো, "ঝগড়া করতে গিয়ে সেরে গেছে।" হাসলো। বললাম, "শ্রমিক মানুষের মানসিকতা আর শারীরিক সহ্যক্ষমতা বেশি। গোস্বামীর অসুস্থতা, বাসের দুর্ঘটনা, এতসব ঘটনায় দৌড়াদৌড়ি" "কী করে

পারলেন?" "কী জানি কী করে পারি - এই তো এতটুকু চেহারা আমার - মনের জোরে চলে যাই।" "চলুন সুনীলকে দেখে আসি।" "অমিয় ওর দেখ ভাল করছে। বলে কী ফলের দাম দেবো না! বিদ্যুৎদাকে বলে ধমকে পেমেন্ট করে দিলাম। চরৈবেতী হল সবাকার। যখন ভ্রমণ করবো তখন দায় থাকবে সমবেত দায়। জানি, সবাই 'নিজের নিজের' করবে তবু তার মধ্যেও থাকবে সমবেত ভাবনা।"

গোস্বামী শুয়েই আছে। বললো, "ভালো আছি জাটীদা - শুনেছি আপনি খুব খেটেছেন অসুস্থ শরীরে ধন্যবাদ।" ধন্যবাদ দিতে চাইলে দাও কুণ্ডুকে, অমিয়কে, দেবুদাকে ওরাই যা করার করেছে।" প্রথম কিউবে সব কজনই ব্যচিলর - সবাই খাটিয়ে ছেলে। আশু কুণ্ডু, শম্ভু, এবারে দেখছি গোবর্ধন বেশিটা খাটছে। নানান কথা উঠে এল - বোঝা গেল, সুনীল বেশ ইমপ্রুভ করেছে - প্রস্রাব সহজ হয়ে গেছে।

এরপর এলাম কালিদার কাছে। বুড়ু বললো , "কাকা, বালখিল্য ঋষিদের আশ্রমটা দেখা হল না।" "হ্যাঁ আপশোস রয়েই গেল - আমি তো কিছুই দেখিনি"- "শুনেছি পরে - খোঁজ নিতে গিয়ে শুনি, তুমি গেছ যাদুঘরে।" "সেখানেও কিছু দেখিনি - একটা চেয়ারে বসে হয়তো কিছুটা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।" বৌদি বললেন, "অই কষ্টের মধ্যে ঘুম?" কালিদা বললেন, "ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন হয়তো বা।"

পাশের কিউবে বিমলরা তাস খেলছে। সময় কাটাবার ভালো উপায়। ট্রেন প্রায় সব স্টেশনেই দাঁড়াচ্ছে। কোচ আছে সব শেষে। সর্বত্র প্লাটফর্ম পাচ্ছে না। শেষ কোচ বলে কেউ কেউ উঠতে চাইছে। গুরুপদ আছে দরজায়। সে উঠতে দিচ্ছে না। না, চীৎকার শুনেও ওদিকে না গিয়ে নিজস্ব কিউবে ফিরলাম। চলন্ত গাড়ি, চলমান বাড়ি। দেখি তিনকন্যা আর বিদ্যুৎদা এককোণে। গৌরী বললো, "হীরো এসে গেছে - দুনিয়া জয় হলো?" সুনীল বললো, " সুনীলকে দেখতে গেসলাম।" ইভা বললো, "কেমন আছে?" সুনীল বললো, "ভালো তবে খেয়াল রাখতে হবে, যেন নুন না খায়। নুন খেলেই বিপদ হবে।" "কে কার খেয়াল রাখবে বলুন - বিশেষতঃ এই রকম ট্যুরের" "অমিয় গুপ্তদা ভার নিয়েছে দেখভালের।" "সত্যি লোকটা পারে - তখন

দেখেছি জাটীদাকেও সামলাচ্ছেন, গোস্বামীকে সামলাচ্ছেন।" বললাম, "সত্যি - কিন্তু তখন আমি কষ্ট ভুলে গেসলাম।" "তোমারও তুলনা নেই।" "তোরও খাটুনি কী কম গেল? বিপদের সময় খাটুনিটা বেড়ে যায়। আর সবচেয়ে বড় কথা - দুগ্গা- ইভা আমায় খাইয়েছে - তোরা সবাই খেয়ে বাসের জায়গা দখলে চলে গেসলি - কিন্তু ইভা আগলে দাঁড়িয়েছিল।" "এমন করে বলছ কেন জাটীদা, কাঁড়ারদা বললো, আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওরা দায়িত্ব পেলে ওরাই দাঁড়াতো।" সুনীল বললো, "ওরা দলে ছিল, আপনি একা-তাই আপনাকে বলেছি-" গৌরী বললো। "ও কিছু না - দাদু আসলে আমায় ঠুকলো।" হেসে পাশ কাটিয়ে গেলাম।

নানান কথা এসে গেল। বালখিল্য ঋষিদের কথা, পান্নার রাজবাড়ি, পাণ্ডবগুহার কথাও উঠেছিল। জানি না কিছুই। পরে দেখবো বলেছিলাম। (পরে দেখেছি, জানি না - আর কদিন বাঁচবো - তাই এখানেই জনিয়ে রাখি - বেনী সাগরের কাছেই বালখিল্যদের আশ্রম ছিল। মাটি খুঁড়ে একটি গ্রামের মত পাওয়া গেছে। বিশেষ কোনো প্রচার না থাকায় পর্যটক কম। নদীর পাড়ে তাদের বাসা ছিল। বাড়িগুলি মাটির - ২০ ইঞ্চির মত দ্বিতল বাড়ি। বাঁশের কঞ্চির খোঁটা। এক একটা বাড়িতে তিন চারটি পরিবার থাকতো। কঞ্চির তৈরী সিড়িগুলো। তাই দিয়ে সকলের ওঠার পথ। দশ বারোটি বাড়ি পাওয়া গেছে। পান্নার রাজার বাড়িতে বর্তমানে কোর্ট বসে গেছে। বাগান আগাছায় পরিপূর্ণ। রাজার মন্দিরটি আজও সচল। এমনকি ধর্মশালাও চালু। বেশ কটি দোকানও আছে। চা পান করেছি সেখানে। মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ অবাধ। মূল মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ আছে। আটজন রাইফেলধারী ও পাহারাদার আছে। দেবদেবী মূর্তির তলায় পান্নার এক সবুজ প্লেট ২৪ ইঞ্চি × ১৬ ইঞ্চি × ১ ইঞ্চি - দাম নাকি ১৯৩৩ সালে ১৬ কোটি টাকা। কৃষ্ণমূর্তির মুকুটের পান্নাটি নাকি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পান্না, রাধা মূর্তির মুকুটে ঝকমকে এক বিরাট চুনী - সেটিও নাকি পৃথিবীর অন্যতম দামী চুনী। এখানে ভাল লাগলো বাঙালী গৌর নিতাই দেখে। বাংলা অক্ষরে লেখাও দেখেছি। পাণ্ডবগুহা বলে দেখায় - জায়গাটা ভাল পিকনিক স্পট হতে

পারে। ছোট্ট হলেও একটা প্রাকৃতিক হ্রদ আছে পাণ্ডবগুহার পাশেই, সবুজ ছোট্ট টিলা পাহাড় আছে। পাঁচটি গুহা আছে - পাহাড় কেটে বানানো। - ১৯৩৩)

এবার জালগাঁও। অজন্তা দর্শনের লক্ষ্য আমাদের সামনে। খেয়ে দুপুরে কজন ঘুমিয়ে নিল। আমি সাইড সীটে বসে লিখলাম। বিমলদের কূপেতে ওরা তাস খেলা চালিয়ে গেল। পথের দুপাশে মঝে মধ্যে স্বল্পোন্নত সবুজ পাহাড়ের দেখা মিলছে। বিকাল শেষ হবো হবো সময়ে জালগাঁও পৌঁছলাম। কোচ কেটে প্লেস করে দিল ওয়াটারিং পয়েন্ট। দুপাশেই সরু প্লাটফর্ম। চার্জিং লাগিয়ে দিয়ে এককর্মী জানাল S. M ডাকছেন। গেলাম সিতাংশুর সঙ্গে। জানা গেল, সে ফার্স্ট ক্লাসে পরেশদার কাছেই বেশি থাকছে। মনে মনে হাসলাম, ভাবলাম ওখানে আভা আছে।

S. M কাগজপত্র নিলেন, জানালেন। প্লাটফর্ম দিতে পারবেন না - ওখানেই সব কাজ চালাতে হবে। সব জলই পেয়। কম করে খরচ করতে হবে। ফার্স্টক্লাস পাশ হোল্ডাররা এসে ওয়েটিং রুম ব্যবহার করতে পারেন। চলে এসে দেখি বাজার করতে যাচ্ছে দলবল। কুণ্ডু আর গুপ্ত নেই। আমি চলে গেলাম সঙ্গে। জীবনে এটা করিনি (ঠাকুর্দাদের, জ্যাঠা, বাবা, কাকাকে - পরে বড়দা, ছোড়দা, ভাই এমনকি বৌমাকেও কাঁচা আনাজ কিনে আনতে দেখেছি - কিন্তু নিজে করিনি।) কিন্তু বাজারও একটা দর্শনযোগ্য জায়গা। তাছাড়া স্থানীয় এলাকাটাকে কিছুটা দেখা, চেনা, বোঝা যায়।

উন্নয়নশীল জায়গা। ধীরে ধীরে শহর গড়ে উঠেছে। প্রাচীন কিছু প্রাসাদোপম বাড়ি আছে, তারা প্রায় অস্তমিত। রাস্তাঘাট মোটামুটি পরিস্কার। নূতন রাস্তা হচ্ছে। বাজারটাও নূতনভাবে সম্প্রসারিত। দূর দূরান্ত থেকে ব্যাপারীরা কাঁচা আনাজ তরকারী এনেছে। বেশ তরতাজা স্নিগ্ধ বাধাকপি, লাউশাক, মূলো, পালং, গাজর, পিঁয়াজ। না, বিদ্যুৎদা এ সবে চোখই দিল না। বললো, "ডিম আর মাছ নেবো।" আশু বলায় পিয়াজ নেওয়া হল মুদিখানা থেকে বিস্কুট, শুকনো লংকা আর গুঁড়ো হলুদের প্যাকেটের সঙ্গে। তারপর রুই মাছ - দুটোয় দশসের - ডিম

১০০টা। তখন খেয়াল হল, দলের জন্য বাজারের ওজন অনেক বেশি হয়। যাক, হেঁটেই ফেরা গেল। ব্যাগ আমায় বইতে হয়নি।

নবেন্দু জানাল, "সার্ভিস বাসেই যাওয়া হবে। পাঁচিশটাকা বেশি পড়বে - ষ্টেশন থেকে তুলে নিয়ে যাবে।" দলের মুখ চেয়ে অন্যায়টা মেনেই নিলাম। ৬০ কিমি রাস্তা তো কম নয়। আড়াই তিন ঘন্টা সময় লাগলো (পরে ভুসাবল থেকে গেছি দুবার বাসে, একবার গাড়ি নিয়ে)। অনেক পাহাড়ের অন্তরালে লোকের অগোচরে পড়েছিল এই গুহাগুলো। গুহাগুলোর বুকে চিত্রিত ছিল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রাবলী। ইউরোপীয়রা একে খুঁজে পায়। চিত্রের সামান্যাংশের ফটো দেখে মুগ্ধ হন বিদগ্ধগুনী জন। অনেকে আসেন এর গাত্রের চিত্রের অবিকল প্রতিলিপি আঁকতে। আজো আঁকেন। গবেষণা শুরু হয় এই চিত্রকলা নিয়ে - বিশ্বে প্রসিদ্ধি পেয়ে যায় এই অজন্তা আর্ট।

গুহামুখে টিকিট ঘর। আট আনা মাথা পিছু প্রবেশ মূল্য। বিদ্যুৎদা একাই পেমেন্ট করলো। নবেন্দু গাইড ঠিক করলো - সে দশ + স্পটার দশ = কুড়ি টাকা দিতে হবে জানাল। সবাই সারিবদ্ধভাবে ঢুকলাম। গাইড প্রথমেই জানালো - অধিকাংশ গুহাতেই ছবি নষ্ট হয়ে গেছে। আলো দিয়ে দেখবার ব্যবস্থা আছে কেবল ১,২,৪,৭,১৬,১৭,১৯ এবং ২৬ নং গুহায়। মোট গুহা আছে ৩০ টি। খৃষ্টপূর্ব দুই থেকে ছয় শত খৃষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত সময়ে ধীরে অতিধীরে এ গুহাগুলি তৈরী হয়েছে বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। এই এরিয়া খুঁজে পাওয়ার সময়ে এর মালিক ছিল মুসলমানরা - তারা এ ছবির মূল্য বোঝেনি - ভেবেছিল রংগুলোই দামী - তাই তারা অনেকগুলো গুহার গায়ের ছবি নষ্ট করে ফেলে - পরে ইংরেজদের হস্তক্ষেপে তাদের ভুল তারা বুঝতে পারে - এবং এই ছবিগুলো বেঁচে যায়। বৌদ্ধদের আঁকা। জাতক কাহিনী জানি না, গাইডও তথৈবচ। আলোয় যতটুকু দেখেছি মুগ্ধ হয়েছি। অতজন লোকের পক্ষে একটা স্পটার যথেষ্ট নয়। রংঘরের কর্মী - অত উজ্জ্বল অথচ নরম রঙের কথা কখনো ভোলার নয়। ৮টা মাত্র গুহা দেখা গেল। মনে অতৃপ্তি রয়েই গেল। আশ মিটলো না। ভাস্কর্য এবং স্থাপত্য দেখার মত। গাইড বললো "ঐতিহাসিকরা মনে করেন, নশো বছর

ধরে পুরুষানুক্রমে এক গোষ্ঠীর মানুষ এখানে বাস করতো। তারা নিজেদের খাদ্য, বস্ত্র, রং, ছবি, যন্ত্রপাতি নিজেরাই বানিয়ে নিত। ওই দেখুন নদী, নদীর ওপারে ঘর। গুহাগুলো ওপর থেকে ফিনিশিং শুরু হয়েছে। স্তম্ভগুলো কারুকার্য করা। আর সারা বছর গুহা মুখগুলোয় আলো পড়ে। কয়েকটা গুহায় ছবি ছিল না - সেখানে সম্ভবত চিত্রশিল্পীরা থাকতেন।

গাইড খুব ভালো। কিন্তু জাতককাহিনীগুলো জানা উচিত ছিল। (শেষবারে নারায়ণ সান্যালের অপরূপা অজন্তা পড়ে গেসলাম। কিন্তু হায় - ছবি প্রায় নেই - নূতন করে ছবি আঁকা হচ্ছে - ফ্রেস্কোষ্টাইলেই জানিনা কবে শেষ হবে)। বাইরে বেরিয়ে আলাপ হয়েছিল এক ফরাসী দম্পতির সঙ্গে। তারা ফরাসী সরকারের প্রতিনিধি - পনেরো বছর ধরে ছবি আঁকছেন স্ক্রোল - এক ধরেনের রোল করা কাপড়ে। ১ এবং ৪ নং আঁকা হয়ে গেছে তাঁদের। ভাঙা ইংরাজীতে আলাপ করলাম।

আধঘন্টা বাদে বাদে বাস ছাড়ে। দ্বিতীয় বাসে ফিরলাম। সন্ধ্যে হবো হবো। কেউ ভাবিনি এতটা সময় লাগবে। খাবার নিয়ে যাওয়া হয়নি আজ। গুহার কাছে কোন খাবারের দোকান নেই (এখন আছে)। প্রথম ব্যাচ এসে খেয়ে নিয়েছে। আমাদেরও সবাই ক্ষুধার্ত ছিলাম। তবু আমি আর বিদ্যুৎদা খেলাম না। রাতে রুটি খেলাম। তবু সকালে ফিট হলাম না। রাতের প্যাসেঞ্জারে চলে এলাম মানমদে। সবাই যাবে ইলোরা দেখতে। P. T. O ভাঙাতে চলে গেছে সবাই। এ পথের একমাত্র P. T. O মানমদ থেকে আওরঙ্গাবাদ এবং ফিরতি। নবেন্দু P. T. O চাইতে না দিয়ে জানলাম "যেতে পারবো না"। "তোর স্বপ্নের ইলোরায় যাবি না?" "না থাক এবার, পরে আবার আসবো দেখবো সময় দিয়ে।" "S. M খুব ভালো একটা কামরা দিচ্ছেন। তবে বলছেন, ফেরার সময় কষ্ট পাবেন।" "কি আর করা যাবে? সব দেখে শুনে ম্যানেজ করে চলিস।" "সুনীল গোস্বামী রইল তাকে খেয়াল রাখিস তাহলে।" "আচ্ছা"।

গাড়িতে রইলাম আমি, সুনীল আর গোষ্ঠদা কানাইদা। খুব পরিশ্রম গেছে ওদের। গতবারের মত সাহায্য পাচ্ছে না মেয়েদের। কালিদার

বৌ ছাড়া বৌ মানুষ নেই। একমাত্র মুটকী ইভা ছাড়া কেউ রান্নাঘরে ঘেঁষছে না। ওরা টিফিন সেরে গেছে - তিনঝুড়ি লুচি, এক বড় ডেকচি আলুর দম একট্রে বোঁদে, এক কাঁদি কলা, ডিম সেদ্ধ সব নিয়ে গেছে। বলে গেছে রাত নটা থেকে সাড়ে নটায় ফিরে মাছ ভাত খাবে। এ হলো কানাইদার রিপোর্ট।

চা বিস্কুট খেয়ে গেলাম সুনীলের কাছে। বর্তমানে সে ভালই। ওষুধ খাচ্ছে নিয়মিত। পরে সে আবার আসবে - খাজুরাহো দেখবে। আমিও দেখিনি শুনে বললো, পরে যদি আমি আসার প্রোগ্রাম করি যেন তাকে জানাই। ফল মিষ্টি তার জন্য কিনে রেখে গেছে গুপ্তদা আর কুণ্ডু। একথা অবশ্য গুপ্তও বলে গেসলো আমায়। তবু ওর খুব লুচি খেতে ইচ্ছে করছে। গোষ্ঠদাকে ডেকে আলোনা লুচি করে দিতে বললাম। বুঝলাম, আমার থাকাটা দরকার ছিলই। নইলে সুনীলের নুন খাওয়ার ইচ্ছেটা আটকানো যেত না (বেড়িয়ে ফেরার কদিনের মধ্যেই সুনীল গোস্বামী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যায় - সপ্তা তিনেক পরে মারা যায়। পাঠক জানেনে, অমিয় গুপ্তও পরে এই রোগে মারা যায়।)

মানমদ প্লাটফর্ম দেখলাম। বিরাট জংশন ষ্টেশন। মিটার গেজ আছে। মেন লাইনের ব্যাপার তো আছেই। এছাড়া ব্রড গেজে ধন্দ হয়ে পুণার সঙ্গে যুক্ত। এটা জানা থাকলে আমাদের প্রোগ্রাম একদিন কম করা যেত। আমরা বোম্বে হয়ে পুণা যাবো - এমন জানলে তা করতাম না। S. M ছিলেন না। ASM ই সব কাজ সেরে কিছুটা গল্পও করলেন। জানালেন, এখান থেকে বাস নেওয়াই ভালো। আওরঙ্গবাদ থেকেও বাস নিতে হবে। কিছুটা প্ল্যাটফর্মে একা একাই ঘুরলাম। মনে হল, চলে গেলে হত। শরীর বেশ ফিট লাগছে। টিফিন খেয়ে লিখতে বসলাম।

রাত এগারোটা বেজে গেল - তবু ওরা ফিরলো না। মিটার গেজ ট্রেনের দেখাই নেই। গেলাম ASM এর কাছে। নূতন একজন। তাতো হবেই। একদম একা। জমিয়ে হিন্দিতে গল্প করলেন। 'পারলি বৈজনাথে'র কথা প্রথম শুনলাম। খুব নাকি জাগ্রত দেবতা। সেখানে এখন মেলা চলছে। আওরঙ্গবাদ থেকে আরো কিছুটা দক্ষিণে - নানদেদ

থেকে সামান্য উত্তরে। ট্রেনটা নানদেদ থেকে ঠিক টাইমে ছাড়লেও বৈজনাথে একঘন্টা লেট। আওরঙ্গবাদে দেড়ঘন্টা লেট করেছে। এখানে আসতে ১২টা বাজবে ইত্যাদি জেনে - আমাদের প্রোগ্রাম জানিয়ে ফিরলাম কোচে। গোস্বামী ঘুমিয়ে পড়লেও ওরা অতন্দ্র। খেয়ে নিলাম তিনজনে।

ওরা ফিরলো সাড়ে বারোটায়। নবেন্দুর মত লোকও বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। "গাড়িতে ওঠাই যাচ্ছিল না। সার্কাসের দলও ফিরছে। খুব কষ্ট পেয়েছে সবাই।" খেতে বসে গেল সবাই। খেয়েই শুয়ে পড়লো অধিকাংশ জন। নবেন্দু জানতে চাইলে বললাম, "ভোরেই গাড়ি টেনে নেবে। রিটার্ন ফোল্ডারে সই করানো হয়ে গেছে। 'পারলি বৈজনাথের মেলা'র কথা ASM এর কাছে শুনেছি জানালাম।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙলো। বিদ্যুৎদা ডাকেনি আজ। গাড়ি চলেছে বোম্বের দিকে। যাওয়ার পথে সেখানে কিছু দেখা হবে না। প্যাসেঞ্জার থেকে গাড়ি কেটে অন্য গাড়িতে জুড়ে দেবে। ছ'ঘন্টা সময় রাখা আছে তার জন্য। সামান্য কিছু বাজার করতে হবে। মানমদে কিছু বাজার করতে পারতাম - যদি বিদ্যুৎদা বলে যেত। যাক - সবই নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়েছে। সিতাংশু খুব খেটেছে এ্যাটাচমেন্ট ও ডিটাচমেন্ট নিয়ে। আশু, দেবুদা, কর্ণদা, শিবেন সেনগুপ্ত বাজার থেকে কাঁচা আনাজ ও মাছ এনেছে। পুনা এক্সে গাড়ি জুড়েছে - বেশ জোর ছুটছে গাড়ি। কিছু যাত্রী নাকি উঠেছিল - ভিতরে ঢোকেনি - পরের স্টপেজেই নেমে গেছে। গাড়ির প্রথম কোচই আমাদের। সহযাত্রীরা অনেকেই বোম্বে ভিটি, ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে নেমেছিল। আমি দৌড়াদৌড়িতে ব্যস্ত ছিলাম - ফলে লক্ষ্য করিনি। (বর্তমানে এর নাম হয়েছে মুম্বাই ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাস MCST) শুনেছি এই ষ্টেশনটীর স্থাপত্যকলাও খুব সুন্দর। এখান থেকে থানেতে প্রথম রেল চলে ভারতবর্ষে।

শুনেছি এই পথে অনেকগুলি গুহা আছে। ট্রেন চলে তার মধ্য দিয়ে। কল্যাণ থেকে বোম্বের পথে ছিল ভারতের দীর্ঘতম টানেল। কাশ্মীর যাওয়ার পথে বানিহাল টানেল হয়েছে অনেক পরে তাছাড়া তা রেলপথে পড়ে না। এখন বিশাখাপত্তনম থেকে কিরিণ্ডুলের পথেও

অনেক টানেল হয়েছে। ভবিষ্যতে আরো কত জায়গায় হবে। শুনছি, কোলকাতাতেই ভূগর্ভ দিয়ে রেল চলবে। (এখন হয়ে গেছে)। গুহার বিশেষত্ব ছাড়াও পথটি অন্য কারণেও সৌন্দর্য মণ্ডিত। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মধ্য দিয়ে পথ। পাহাড়ী উপত্যকাগুলি সবুজ - বর্তমানে জনাকীর্ণ। গড়ে উঠেছে কত নভোচুম্বী অট্টালিকা, ক্রীড়াক্ষেত্র, বিমান অবতরণ ক্ষেত্র। কোথাও দূরে পর্বতশীর্ষে দুর্গের প্রাচীর। ছোড়দার কাছে ক্যামেরা - সে কয়েকটা সুন্দর ফটো তুলেছিল (এখন তারা উইয়ের দাপটে অন্তর্হিত)।

বিকেল হয়ে গেল। কোচ খুব সুন্দর প্লাটফর্মে রেখেছে। পর্যটকদের জন্য ভালো ব্যবস্থা। নীট এণ্ড ক্লীন বাথরুম, ল্যাভেটরি, ইউ রিন্যাল ওয়াটার বেসিন। সঠিক সময়ে খাদ্য পেয়ে সবাই আজ সুস্থ - এমনকি গোস্বামীও নাকি কালকে পুণা দর্শনে যেতে চাইছে। কাজ সেরে প্লাটফর্মের বেঞ্চে বসে আছি। বিদ্যুৎদা চায়ের মগ দিয়ে গেল। চা পান করছি এমন সময় বাচ্চু আর বুড়ু এসে গেল। ওরা শিবাজীর কথা শুনতে চাইল। পুণা শিবাজীর স্মৃতিবিজড়িত হলেও পুণায় রাজধানী করে বাজীরাও পেশোয়া। সিংহগড় ছিল শিবাজীর রাজধানী। শিবাজী ছিল মারাঠা কুল তিলক। সারা জীবন যুদ্ধ করেছে মুঘল আর বিজাপুরের সঙ্গে। দুর্গের পর দুর্গ দখল করেছে কিন্তু থিতু হয়ে বসতে পারেনি। শাম্ভাজী তার পুত্র তার যোগ্যতা পায়নি। ধীরে ধীরে রাজার হাত থেকে মন্ত্রীদের হাতে ক্ষমতা চলে যায়। সৈন্যরা লুঠেরা বর্গী হয়ে যায়। সেনাপতিরা ছোট ছোট জায়গা দখল করে সেখানে রাজা হয়ে যায়। বর্গীরা মারাঠী তা মানতে চায় না বুড়ু। স্বাভাবিক, শিবাজীর চরিত্রর সঙ্গে বর্গীদের মেলানো শক্ত। (আর এখনকার বাল থ্যাকারে বা শিব সেনাকেও মেলানো শক্ত)।

দুর্গা এসে বসলো পাশে। প্রশ্ন করলো, "কী গল্প হচ্ছে?" "বিশেষ কোন গল্প নয়। এরা ছাত্রী - তাই পুণার ঐতিহাসিক আর ভৌগলিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা করছিলাম, ভাল লাগছে না, তার চাইতে তুমি আওরঙ্গা বাদে কী কী দেখে এলে তা বলো। "এদের কাছে শুনলে না কেন?" "ওরা ছোট - সব কী বুঝবে? ইলোরা এত নামী জায়গা - তবু

ষ্টেশন হলো আওরঙ্গবাদে!" "তাহলে পালাই। এলাম গল্প শুনতে - বাচ্ছা দুটোর কাছে তুমি বিপদে ফেলে দিলে?" "বিপদ কিসের, সবাই কী সব জানে? আসলে তুমি খেয়াল করিনি - তাই জানার চেষ্টা করনি - দৌলতাবাদই ছিল অতীতের দেবগিরি। পাগলা সুলতান মামুদ - মহম্মদ বিন তুঘলক এখানে রাজধানী আনতে চেয়েছিলেন - মনে আছে?" বুড়ু বললো, "স্কুলের ইতিহাসে এখন তো তুঘলকী শাসন পড়াচ্ছে - ইস্ আগে কেন বললে না কাকা?" দুর্গা বললো, "তাতে কী হল?" "হলো এই যে জায়গাটা আওরঙ্গজেবের পছন্দ হয়ে গেল। দেখনি, এখানেই আওরঙ্গজেবের গুরুর কবর - প্রিয়তমা পত্নীর স্মৃতিতে বিবি কা মকবায়া?"

বাচ্ছু বললো, "হ্যাঁ দেখেছি। কী সুন্দর। ঠিক তাজমহলের মত - কেবল অতটা সাদা নয় - কী সুন্দর বাগান উঠতেই ইচ্ছে করছিল না।" "তা আমি জানিনা পরে আবার আসবো - তখন দেখবো - দুর্গা এবারে ইলোরার কথা বলো। আর তোমরা সবাই শোনো - অজন্তা বা ইলোরার ক্ষতি হোক - তা ইংরেজরাও চাইতো না - তাই তারা রেললাইন নিয়ে যায়নি।" "এখন বুঝেছি - তোমার প্রশ্নে চমকে গেসলাম।" হাসলো সে।

দুর্গা বলতে থাকলো প্রথম থেকে। "গাড়িতে ভিড় বাড়ছিল। আওরঙ্গবাদে নামতেই পারি না। কতজনে যে শিব সেজেছে, - বাঘছাল, জটা, ছাই আর মেয়েরা সব ভৈরবী সেজেছে তাদের মাথায় জটা, হাতে ত্রিশূল, কপালে লালরংয়ের ত্রিবলী আঁকা। ঝুলে, ট্রেনের মাথায় চলেছে সব। আমরা সবাই নেমে যাব শুনে রাস্তা করে দিল। পরে পিল পিল করে উঠে পড়ল।" "এগুলো কী ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে পড়বে? আমি তো এসব লিখিনি ডায়েরীতে।" বুড়ুর প্রশ্নে হেসে বললাম, "বাঃ জানতে হবে না কোথায় কখন মেলা হয়! পারলি বৈজনাথের মেলায় এত ভিড় হয় জানলে মানমদ থেকেই বাস করতাম।" "পারলি বৈজনাথ ! সেটা আবার কোথায়?" বাচ্ছু জানতে চাইলে বললাম, "ও সে পরে বলবো। এখন শুনতে দে।" দুর্গা বললো, "শোনো, এটা অবশ্য শোনা কথা - আওরঙ্গবাদের কিছুটা দক্ষিণে শিবের এক জ্যোতির্লিঙ্গ মূর্তি আছে। তারি

নাম পারলি বৈজনাথ - বৈজনাথ মানে হল বৈদ্যনাথ বিহারে আছে না দেওঘরে - "হ্যাঁ"। বললো বুড়ু।

বললাম , তবে বৈজনাথ পর্বই শেষ হোক। কথিত আছে, শংকরাচার্য্য দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্থাপন করেন। এই মূর্তিগুলি স্ফটিকের তাই চকচকে - তাই তার নাম জ্যোতির্লিঙ্গ। তিনি ভারতের হিন্দু ধর্মকে তৎকালীন বৌদ্ধধর্মীদের হাত থেকে উদ্ধারে ব্রতী হন - উত্তর থেকে দক্ষিণে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বেশ কটি মঠ স্থাপন করেন এবং বারোটি মন্দিরে জ্যোতির্লিঙ্গ স্থাপন করেন। নবনির্মিত মন্দিরগুলির নাম হয় বৈদ্যনাথ বা বৈজনাথ। বিহারে (সম্ভবতঃ বর্তমানে ঝাড়খণ্ডে) আছে - পশ্চিমে পারলি বৈজনাথ উত্তরে বৈজনাথ পাপরোলা। (পাপরোলা দেখলেও পারলি বৈজনাথ দেখিনি ১৯৩৩)।

"আপনি ভীষণ রাগী আছেন। ভুলে যান, বিদ্যা বিনয় দান করে।" বললো দুর্গা। হেসে বললাম, "রাগিনি। প্রসংগটা চুকিয়ে দিলাম। এবার বলো। মনে রেখো, কী কী দেখেছ, সব আমি জানি, সব কিছু নিয়ে পড়েছি। আমিই তো প্রোগ্রাম সেটার। তোমার এ্যাঙ্গেলে কেমন লেগেছে জানতে চাইছি আরকি?" দুর্গা বললো, "সর্বনাশ!" "কেন ভয় পাবার কী আছে। তুমি সহজ ভাবে বলবে। তাতেই বোঝা যাবে কেমন লেগেছে। Don't get nurvous বলো।"

"বাস বেশ ভালো আর বড়ো - সবাই তবু বসতে পায়নি। দাদা আর নবেন্দু, অন্যদিকে শিবেন আর গোবর্ধন দাঁড়িয়েছিল। প্রথমেই নিয়ে দাড় করালো এক জৈন মন্দিরে সেখানে কয়েকটি ছোট ছোট গুহা আছে। বাগান আছে সুন্দর। গুহায় গুরুদের মূর্তি আছে। মূর্তিগুলোর সবারই বড় বড় চোখ। কয়েকটি মূর্তি নিরাবরণ। ভালো লাগেনি। বাস এবার দ্রুত ছুটলো। রাস্তা এখানটায় ভালো আর যানবাহন কম আছে। কিন্তু বেশ ঝুপড়ি আছে। বড় বাড়ি না থাকায় দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল এক মসজিদ ধবধবে সাদা তার রং। তার কাছে বাস স্লো হয়ে গেল। বাসের কণ্ডাকটর বললো - 'এটা হচ্ছে আওরঙ্গজেবের ধর্মগুরুর মকবরা। প্রতি শুক্রবারে এখানে মুসলমানদের মেলা হয়। হাজার মানুষ সান্ধ্য নামাজ পড়ে।" বললাম, "মকবরা কী?" বাচ্চু বললো, "জাটী কাকা

থামিয়ে দিচ্ছে কেন?" দুর্গা বললো, "জানি না।" বুড়ু বললো, "তুমি বলে দাও তুমিও তখন বললে বিবি কা মকবারা। বললাম, "আমিও ঠিক জানি না - মনে হয় মৃত্যুর আগে নির্মিত কবরকে মকবারা বলে। কোথাও যেন পড়েছি, তাজমহলও আসলে মকবারা। যাক বলো।"

দুর্গা বললো, ধরে নাও একটা হাজার তিনেক গজ লম্বা স্বল্পোচ্চ বেলে পাথরের পাহাড়। তাতে ৩০-৩১টা গুহা আছে। প্রথম দশটা বৌদ্ধদের। শেষ দশটা জৈন দের। মাঝখানের দশটা হিন্দুদের। আগে কী হতো জানি না, এখন বাস দাঁড়াবার জায়গা হয়েছে ১৫-১৬ নং গুহার সামনে। তার ডানদিকে উঁচু মালভূমির মত বাঁদিকে উঁচু নীচু পাথুরে জায়গা। দুটো অন্য বাস দাঁড়িয়ে আছে। নবেন্দু জানাল "গাইড নেই চলো সবাই - ডানদিক থেকে দেখি। দেখা শেষে খাওয়া হবে।" গুহার মাথায় নম্বর দেওয়া। বেলে পাথর ক্ষয়ে গেছে। ৬নং গুহাটা ছাড়া ভালো বোঝা যায় না। কয়েকটা মনে হয় ছাত্রাবাস ছিল। ১১ নং এ এসে জানা গেলেও হিন্দুত্বের বিশেষ কিছু বোঝা যায়নি - মনে হল, বুদ্ধকেই বিষ্ণু বানানো হয়েছে। ১২তেও বৈষ্ণবদের ছোঁয়া। বারো, চৌদ্দ খুবই অস্পষ্ট। ১৫-১৬ গুহাই নয় এখন ওপরে ছাদ নেই - কিছু একস্তরী শক্ত পাথরের দেখা গেল। জানা গেল, একেই বলে কৈলাস গুহা। হর পার্বতীর বিশালাকায় মূর্তি আছে। নীচে রাবণ কৈলাস পাহাড়কে ঠেলছে। এখানে সূক্ষ্ম কারুকার্য সব বোঝা যাচ্ছে। মন্দিরে ঢোকার পথে একটি স্তম্ভে গঙ্গার মর্তে আগমন আঁকা আছে। ঐরাবত ভেসে যাওয়াটা খুব ভালো লেগেছে। গুহার বাইরে বের হয়ে দেখি, অনেকেই গাছের ছায়ায় বসে দাঁড়িয়ে গেছে। কেউ বা গেছে ২০ নং গুহার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া সোঁতায় হাত ধুতে মুখে চোখে জল দিতে। নবেন্দুদা বাইরে বেরিয়ে এই বিশৃঙ্খলা দেখে বুঝে নিল সবাই পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধার্ত। বললো, "বিদ্যুৎ গোবর্ধন আর আশুকে নিয়ে সবাইকে খাইয়ে দে।"

নবেন্দুদারা যাচ্ছে দেখে দাদাও যেতে চাইল। আমি আর চিত্রাও সঙ্গ নিলাম। বাচ্ছাটা নিল ইভাদি। গৌরী আর চিত্তদাও সঙ্গ নিল। ১৭ থেকে কুড়িতে কোন কাজ নেই তা জানা ছিল পূর্ববর্তী দলের লোকদের

কাছে। পথ খুব খারাপ - কোথাও খাঁজওয়ালা পাথর, কোথাও ভিজে ভিজে বালি। কুড়ি নং গুহার পরই ঝর্ণা। জল কম, পাথরে পা দিয়ে চলতে হবে - দেখে চিত্তদার সঙ্গে চিত্রা আর গৌরী ফিরে এল। আমি কোন রকমে ওদের সঙ্গ নিলাম। কিন্তু ওপারে কিছুই ভালো লাগেনি। একুশ থেকে পঁচিশ গুহায় যাওয়াই গেল না। ২৬, ২৭ প্রায় ভেঙ্গে গেছে। আটাশ -উনত্রিশ-ত্রিশ দেখেছি। আটাশ নং গুহাটাই ভালো লেগেছে। কাছেই পিচের মেন রাস্তা দেখে সে পথেই ফিরলাম। একদিনে না দেখে তিনদিনে দেখলে হয়তো বোঝা যেত।" কেমন যেন উন্মনা হয়ে গেল সে। বুড়ু বললো, "এখানে পান্থনিবাস বলে একটা সুন্দর হোটেল আছে জানো কাকা। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল, ওখানে থেকে সপ্তাহখানেকে দেখে নেব - যা একদিনে দেখেছি। জানো তো দৌলতাবাদে মাত্র ৪০ মিনিট সময় দিয়েছিল। সবাই প্রাসাদটা পুরো দেখতেই পায়নি। বলো না পিসি।"

দুর্গা বললো, "ফিরে এসে দেখি বাকী সকলেই খেয়ে নিয়েছে। বিদ্যুৎদা বললো , "নবেন্দু অনেক পাউরুটি বেঁচে গেছে - কলাও।" "ভর্তি পেট খেয়ে নিলি?" "সবাই গরম গরম লুচি খেতে চাইল যে।" "যাক, ঠিক আছে - আমি এখন কলা পাউরুটি খাবো - ডিম সেদ্ধ আছে তো?" আমরাও তাই খেলাম। তারপর লম্বা দৌড়। বাস এসে দাঁড়ালো দৌলতাবাদ দুর্গের সামনে। সময় দিলেও - চল্লিশ মিনিট খুবই কম। নীচেই কত কী দেখার আছে। কত কী জানার আছে। বহু প্রাচীন দুর্গ, হিন্দু রাজার ছিল, আলাউদ্দিন খিলজী প্রথম জয় করে - আবার হিন্দু -আবার মুসলমান করতে করতে সে, সময়ে আওরঙ্গজেব এসে যায় - ত্রিতল অট্টালিকা তখন দেখাই যেত না। আওরঙ্গজেব নাকি একে ত্রিতল করে। এসব এক মুসলমান ভ্রমণকারীর কাছে জানতে গিয়ে সবটা দেখা হল না।"

বললাম, "তোমরা সবাই পদ্মিনী উপাখ্যান জানো। আলাউদ্দিন খিলজী ছিল নারী লোভী ভোগী পুরুষ। দেবগিরির রানী কমলা দেবীকে হরণ করে নিয়ে যায় এবং পরে তাকে নিয়ে নানা কাহিনী শোনা যায়। তার কন্যা দেবলা নাকি এক সাধারণ মুসলমান সেনানীকে বিয়ে করে

তার সাহায্যে দেবগিরি পুনরুদ্ধার করে। দৌলতাবাদ নাম দেয় মহম্মদ বিন তুঘলক। পরে দৌলতাবাদ নিয়ে মুঘল, বাহমনী মানে বিজাপুরের মধ্যে লড়াই চলে। শেষে সাজাহানের সময় আওরঙ্গজেবকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা করলে সেএখানে থাকে।"

দুর্গা বললো, "বাস তাড়া দিলেও প্রায় একঘন্টা লেগে গেল বাস ছাড়তে। প্রায় সবাই চা পান করলো। বিবি কী মকবারার কথা কী আর বলি দ্বিতীয় তাজমহল। ফটো দেখলে অনেকেই ধরতে পারবে না কোনটা তাজ আর কোনটা বিবি কা মকবারা। কিন্তু কাছে স্বচক্ষে বোঝা যায় - তাজের মহত্ত্বকে স্পর্শ করতে পারছে না। তাজমহলের মত বড় বাগান নেই কিন্তু সবুজ ছায়াচ্ছন্ন লন আছে।" (পরে দেখেছি, বুঝেছি দুর্গার দৃষ্টি ভালই)

বাচ্ছু বুড়ু উঠে গেল তাদের মায়ের আহবানে। দুর্গাও বললো, "তবে চলি"। "পানি চাক্কী দেখিসনি?" "হ্যাঁ, সে আর কী বলবো। প্রাচীন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্র।" বলে চলে গেল সে। কি জানি, একা থাকতে ভয় পাচ্ছি নাকি? না তা নয়। কোন দরকারেই চলে গেল। (পরে বুড়ু বলেছিল, চাক্কী থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতে বড় বড় বালব জ্বলে, গম ভেঙে আটা করে জল দেয় কৃষি ক্ষেত্রে - আমার দেখা হয়নি।)

নবেন্দু নীহারদা আর বিমলকে নিয়ে বাসের ব্যবস্থায় গেসলো। নীহারদা বললো, "মাথা পিছু আড়াই টাকা ভাড়া নেবে। ষাট সীটের। ফ্রি গাইড। ৮টায় ষ্টার্ট করে রাইট ৫টায় ষ্টেশনে নামিয়ে দেবে। মিউনিসিপ্যালিটির বাস।" সামান্য পরেই বিদ্যুৎদা জানালো, "গাড়ি খালি করে সবাই যাবে। প্রত্যেকে ব্যাগ নিও। দামী জিনিস গাড়িতে রেখে যেও না।" সিতাংশু বললো, "সকালেই ভাত খেয়ে নিতে হবে। দুপুরে পেশোয়া বাগে হবে টিফিন।" "সকালেই ভাত?" "নবেন্দুদা বলেছে, সবাই তো কারখানায় গেলে তাই করে। গোপালদা মেনে নিয়েছে।" "কদিন তো তা হচ্ছে না।" "কাল খাবার নষ্ট হয়েছে, নবেন্দুদা খুব খচে গেছে।" স্বাভাবিক ব্যাপার, খাবার নষ্ট করা উচিত নয়।

যাওয়ার আগে গোপালদা RPF OFFICE এ গিয়ে কোচ সম্পর্কে খেয়াল রাখতে অনুরোধ করে এল। আমি সকালে 'ভাত খাবো না' জানিয়ে দিয়েছি কানাইদাকে। গতকালের পড়ে থাকা পাউরুটি সেঁকে খেলাম সুনীল আর আমি। সুনীলের কেন জানি না, আমায় বেশ পছন্দ হয়েছে। হৃদ্যতা বাড়ছে। (এই হৃদ্যতা এখনও বজায় আছে ১৯৩৩) ছুটির দিনে সকালে ভাত খেতে ভাল লাগে না। তাছাড়া, নবেন্দুর কথামত - কারখানায় আমরা কজন দুপুরে ভাত খাই - কোনদিনই সকালে ভাত খাই না। মনে হয়, অপশন দিলে, সেকে দিলে অনেকেই রাজী হত পাঁউরুটি খেতে। অন্ততঃ বিদ্যুৎদা, গোবর্ধন, শুভেন্দু একথা বলেছিল।

বাস বিশাল এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। টুরিষ্টদের জন্য পুরসভার ব্যবস্থা করা। ড্রাইভার-কণ্ডাকটর সাদা পোষাকে। কণ্ডাকটর কাম গাইডকে দেখতে অনেকটা হিন্দি ফিল্মের হিরো দিলিপ কুমারের মতো। মেয়েরা বাচ্ছা নিয়ে সামনে বসেছে। আভা (পরেশের বৌ) বসেছে একেবারে প্রথম সীটে-পাশেই বসেছে বোন প্রভা। আমি আর সুনীল কাঁড়ার বসেছি পাশাপাশি - মাঝের দিকে। সে রঘুনাথপুরের যুবক হলেও জানে না যে প্রভা ইংরাজী অনার্সের ছাত্রী - উত্তরপাড়া মাখলায় অনেক যুবকের নয়নমণি সে। নন্দ তার ভাই - সে C A-তে খেলে এবং আমায় চেনে। উত্তরপাড়া বাজারের বাটার দোকানটা ওরাই চালায়। যাক গে, বেল পাকলে কাকের কী?

শহর বর্তমানে অনেকটা বেড়েছে। রেলষ্টেশনে এরিয়াও বাড়ছে। নূতন সাজে সেজেছে। এ অঞ্চলের দোকানগুলো বেশ সুসজ্জিত। বাস ধীরগতিতে রেলের এরিয়া পার হয়ে গতি বাড়ালো। জয় প্রকাশ নারায়ণ রোড - আম্বেদকর উদ্যান, কালেকটরেট অফিস -মূলা (না মুঠা) নদীর সঙ্গম সেতু পেরিয়ে পুরাতন শহরে বাস ঢুকলো - এগুলো সবই গাইড জানালো। অন্যান্য শহরের থেকে এই শহরের পার্থক্য এই যে - পথের মোড়গুলোকে পুরসভাই অলংকৃত করে রেখেছে, কোথাও কোনো জবর দখল নেই - কোন না কোন ভাস্কর্য/কীর্তি সেখানে রাখা আছে -অধিকাংশই স্থানীয় নামী মানুষজনের মূর্তি - মনে রাখতে হবে যে পুণা লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, দেশবরেণ্য একনাথ রাণাডে, মহামতি গোখলে,

প্রফেসর কার্ভের স্মৃতিতে আজও গর্বিত। পুণের গণেশ চতুর্থীই এখন মুম্বাইয়ে সমধিক প্রচলিত। এখানের শীত কালীন পাল্কী উৎসব বর্তমানে অবশ্য কিছুটা ম্লান।

যা লিখছি সবই গাইডের কাছে শোনা -কতটা সত্যি তা মাঝে মধ্যে খতিয়ে দেখেছি। বাস প্রথম স্টপেজ দিল বাজীরাও প্যালেসে -গাইড বললো এর নাম শানওয়ারওয়াদা। সামনে বিশাল কাষ্ঠনির্মিত দুর্গদ্বার (বর্তমানে ভষ্মীভূত) - সামান্য পরই দ্বিতল সঙ্গীতভবন - বিয়ে বাড়িতে আগে সানাইবাজার ঘর হতো তেমন ছাঁদের। এলাকা অনেকটা। মোটামুটি অলংকৃত। একটা বিশাল কক্ষ যাদুঘরের মত ব্যবহৃত। সেখানে রাখা আছে শিবাজী সাম্ভাজীদের ব্যবহৃত পোযাক এবং অস্ত্রশস্ত্র। (এখানে জানা গেল শিবাজী ৩য় এবং শাম্ভাজী ২য়ও রাজা হয়েছিলেন।)

এরপর গেলাম পেশোয়া সামার প্যালেসে। পরে নাকি নাম হয়েছে আগাখাঁ প্যালেস। সুন্দর সাজানো গোছানো প্রাসাদ কিন্তু বর্তমানে প্রশাসনিক দপ্তর হওয়ায় কিছু দেখা যায় না। কেবল গান্ধী যে কক্ষে বন্দি ছিলেন তা দেখতে দেওয়া হল। কস্তুরবা গান্ধীর সমাধি মন্দিরটিতেও বেশ যত্ন নেওয়া হয়। শহরের পশ্চিমে পেশেয়া বাগ । এটি একাধারে বোটানিক্যাল গার্ডেন আবার চিড়িয়াখানা। দুটির প্রবেশদ্বার অবশ্য ভিন্ন। চিড়িয়াখানার প্রবেশ মূল্য এক টাকা।

বাগিচায় প্রবেশ অবাধ। চিড়িয়াখানাই পাখির কালেকশন ভালো হলেও জীবজন্তুর কালেকশন ভালো নয়। ছায়ায় ঘেরা বাগান ছেড়ে আসতে কষ্ট হচ্ছিল। এরপর গাইড বাসে উঠে জানাল, বাস শেষ স্টপেজ দেবে পার্বতী মন্দিরে। স্লোড্রাইভে সব কিছু দেখাবে। কেলকার যাদুঘর দেখতে অনেক সময় লাগে। ব্যক্তিগত সংগ্রহকারী ছিলেন তিনি - সব দান করে গেছেন। ৩৬টি বড় বড় ঘরে নানা দর্শনীয় বস্তু আছে। তারপর দেখালো, সেনা ছাউনির অবস্থান, স্টেডিয়াম, এ্যাক্টিংট্রেনিং এ্যাকাডেমি ইত্যাদি। গোলাকৃতি পথে ঘুরে এবার নিয়ে এল পার্বতী মন্দিরের পাদদেশে (লিখতে ভুলেছি খাবার খেয়েছি পেশোয়া বাগে) এখন প্রায় ৪টে বাজে। গাইড বললো Two Fifty feet উচাই হ্যায় যাইয়ে সিড়ি হ্যায়, এরিয়াল ভিউ আচ্ছা - পেশোয়াকা মনদিল - নানা

সাহেব ভি ইসকো পূজা চড়ায়া। তখন মনে হল নানাসাহেবও পুনার লোক ছিল। (পরে অন্যত্র পড়েছি পুনার রেসকোর্স সম্বন্ধে কিন্তু গাইড তার কথা বলেনি।)

পাঁচটার সামান্য আগেই ফিরেছি। অনেকের মত আমিও উঠিনি পার্বতী মন্দিরে। জমিয়ে চা পান করলাম - পাতার ছাউনি দেওয়া উড়িয়ার চায়ের দোকানে। (মারাঠীরা ভীষণ দুধ খায় চায়ে)। চা পান সেরে আবার বসেছি প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে। নবেন্দু, বিদ্যুৎদা, দেবুদা এসে হাজির। জানাল, কজন নাইট শো-এ শিবজী হলে সিনেমা দেখতে যেতে চাইছে। (তখন নাইট শো ছিল ৯-১২ টা) তারা নারাজ, কিন্তু গোপালদা, পরেশদা নিজেরাও যাবার দলে। বললাম," ভ্রমণে এসে সিনেমা? না তো চলবেনা।" সিতাংশু রাজি যেতে। তাকে নিয়েই গেলাম ফার্স্ট ক্লাসে। কিছু পরে ওরা আমাদের বক্তব্য মেনে নিল। শুভেন্দু আর আশু মাছ নিয়ে এল। কানাইদা জমিয়ে রান্না করলো। রাত্রে পদচারণার সময় সুনীল বললো "গোস্বামী মাছ খেতে চাইছিল -অনেক বুঝিয়ে দই এনে দিয়ে শান্ত করা গেছে। পরের দিন সকালেও বাজার গেল কজন। দশটায় পুনে বোম্বে এক্সে গাড়ি জুড়বে। ফলে কিছুটা লেখা গেল। সবাই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত ফলে কেউ বিরক্ত করেনি।

ট্রেন ভালোই ছুটলো। দুপুরে সাইড সিটে বসে বাচ্চু, বুড়ু, গৌরী, দুর্গাকে রমেশচন্দ্র দত্তের মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাতের গল্প বললাম। বাচ্চু বললো, "কাল সন্ধ্যায় সুজি খেয়েছিলে কাকা?" বললাম "গল্পের সময় খাওয়ার কথা ওঠাচ্ছিস কেন?" গৌরী বললো, "খাওনি তাই জানো না - সে এক স্মরণীয় ঘটনা।" উৎসুক হয়ে বললাম, "ঝেড়ে কাশ নাত্নী।" দুর্গা হেসে জানাল, কাল কানাইদা বলল রাতে মাছ ভাত হবে - একটা হাল্কা টিফিন করা যাবে। ইভাদি গেসলো, সে ভার নেয় সুজি করার - কিন্তু এত জল পড়ে যায় যে সুজি হয়ে যায় সুরুয়া। বুড়ু তাই এখন ইভাকে নাম দিয়েছে সুজি পিসি।" "তা ভালো - তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে সে নূতন হলেও রান্না ঘরে যাচ্ছে। অন্যদের মতো গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে না।" গৌরী বলল, "দেখলি তো

বাচ্ছু, তোকে বলিনি - দাদু ওকেই সাপোর্ট করবে।" "সাপোর্ট করেছি ওর ইচ্ছাকে। তাছাড়া নামটা তো ভালই।" (আরো কথা হয়েছিল তা ছাপাচ্ছি না।) মাহিম স্টেশন থেকে চেকিংস্টাফ উঠলো। এই ট্যুরে প্রথমবার চারজন TTE দুজন RPF-এ সব দেখলো। চা বিস্কুট খেয়ে নেমে গেল। প্রায় প্রতিটা স্টেশনে থেমে রাত্রি করে দিল V. T পৌঁছাতে। বাজার করতে হবে - কিছু কোচ প্লেসিং হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত চৌদ্দ নম্বরে অনেক কোচের ভিড়ে রেখে চলে গেল। সব প্ল্যান লোপাট হয়ে গেল। নীহারদা বললো, স্কাউট দল নিয়ে এসেছি, মাতুঙ্গার কারখানার কাজে এসেছি এখানে। তাই জানি, চৌদ্দ নম্বর হচ্ছে ওয়াগান ব্রেকার, দুষ্কৃতিকারীদের স্বর্গভূমি। প্লাটফর্মের উল্টোদিকের জানালাগুলো সব বন্ধ করে দাও।" ছোড়দাও কয়েক বছর আগে এখানে এসেছিল, সে বললো, "পুরো বোম্বেই ফেরেব্বাজদের জায়গা সব সময় সতর্ক থাকতে হবে।" আমি আর সীতাংশু গেলাম গোপালদা আর দেবদাস ভট্টাচার্যকে নিয়ে। এখানেও SM নেই দিল্লির মত SS. ASM ON DUTY কে পাওয়া গেল। তিনি ফোল্ডারে সই করে দিলেন। এপ্রসঙ্গে বললেন RPF OFFICE এ যেতে। তিনি বললেন, STAFF ON DUTY র সঙ্গে কথা বলতে। চৌদ্দ নম্বর-এ ফিরে তাদের খুঁজে বার করলাম। তারা জানাল, "দো আদমীসে ইধর আটতা নেহি। আপ খুদ সাবধানীসে রহিয়ে। জরুরৎ পড়নেসে হ্যামলোগ তো হ্যায় হিহ্যায়।" এতক্ষনের চেষ্টা বিফলেই গেল। নবেন্দু আর পরেশ গেসলো কালকের ট্যুরের জন্য বাস খুঁজতে। বিদ্যুৎদা বলেছিল 'অফিস খোলা পাবে না'। নবেন্দু বলেছিল, 'কলকাতা থেকে দুঘন্টা পরে এখানে সন্ধ্যা হয় - অফিস খোলা পাবই। পেয়েছে বাস ৫৪ সীটের। ৬ জন স্ট্যান্ডিং এলাউড। তিনশো টাকা নেবে। সার্প আটটায় বেরিয়ে সার্প দুটোয় ফিরবে। হেভিটিফিন খেয়ে যাবে। গাড়িতে ফিরে লাঞ্চ।

কানাইদা জানালো, 'তার পাড়াতুতো ভাইপো বিশ্বনাথ বোস আসবে, সে নেভিতে কাজ করে, বর্তমানে সে বোম্বে আছে - তাকে সে বাড়ী থেকে জানিয়েছে আগামী কাল আসলে তাকে সুক্তো খাওয়াবে।' নবেন্দু বললো, "সে তো আমি জানি। আমরা তিনজন গাড়িতে থাকবো

-ফলেতা নিয়ে কোন সমস্যা নেই।" 'বাজার করতে হবে তো? বিদ্যুৎদা বললো, সে হয়ে যাবে।' তারপর যুবকদের নিয়ে সভা ডাকলো নবেন্দু। প্লাটফর্মের দুষ্কৃতিকারীদের সম্বন্ধে সাবধান করা হলো। ঠিক হলো প্রথম রাতে আমার নেতৃত্বে জাগবে একদল। রাত ২টো থেকে নেতৃত্বে থাকবে প্রশান্ত কুন্ডু। জানা গেল, গোস্বামী বেশ ফিট আছে। অমিয় থাকবে কুন্ডুর দলে।

আমি আর সুনীল কাঁড়ারতো কদিনই রাত বারোটা পর্যন্ত জাগছি। দুঘন্টা এক্সট্রা জাগা কিছু নয়। সুশীল মিত্রের সঙ্গে ছায়া, চিত্তর সঙ্গে গৌরীও জেগে। ফলে আড়াইটে বাজার পর কুন্ডুকে ডাকলাম। সে তার দলবলকে ডেকে তুললো। আমরা ধীরে সুস্থে শুতে শুতে তিনটে বাজিয়ে দিলাম। অনেক ভিখারীও কাগজ কুড়িয়ে গাড়ির কাছে পিঠে শুয়ে আছে। দু'একবার কোচের কাছেও এসেছিল। কেউ কাউকে কিছু বলিনি। কুণ্ডুকেও বলেছি। জেগে আছ তা জানাবে কেবল। কোন ঝামেলায় যাবে না। নবেন্দুর সঙ্গে কথা হয়ে গেসলো। আমি তার সাথে থাকবো। দুটোয় ওরা ফিরলে স্টার্ট করে যতটা পারি দেখে নেব। আগামীকাল ওরা কেবল এলিফ্যান্টা যাবে - দুব্যাচে-তখন বাকীটা দেখে নেব।

পরদিন কেউ ডাকেনি আমায়। উঠে দেখি সবাই রেডি। নীহারদা আর পরেশ চলে গেছে বাস আনতে। নবেন্দু বললো, "চারজন গেছে বাজারে-সকালে বিদ্যুৎ বলেছে মাংস আনতে।" কর্ণদা, শিবেন, বিমল আর শুভেন্দু গেছে। বিমল বলেছে, সে কাছের মাংসের দোকান চেনে। বাস এসে গেল। গোপালদা, দেবুদা (সভাপতি) বাসে লোক তুলতে আরম্ভ করে দিল। ৮টা বাজতে ২/৩ মিনিট আগে ওরা এল। বিমল আর কর্ণদা বাসে উঠে পড়ল। শিবেন আর মুখার্জী নীহারদাকে বলে গাড়িতে বাজার দিতে গেল। শিবেন টিফিন হাতে নিয়ে ছুটে এসেও বাস পেল না - সে চলে গেল - বাস ধরে গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়ার দিকে। শুভেন্দু এসেই নবেন্দুকে আমাকে খুব গালি দিল। নীহারদাকে, গোপালদাকে অশ্রাব্য খিস্তি দিতে থাকে। খুব অস্বস্তিতে পড়ে ওকে শান্ত করে কোচে ফিরলাম। বোঝা গেল, সে মদ্যপান করেছে। এবারে চারজনে জমিয়ে টিফিন করে চা পান করলাম। কানাইদার সঙ্গে শুভেন্দু

রান্নাঘরে গেল। গোষ্ঠদা গেছে ভ্রমণে। শুভেন্দু ভালো মাংস রাঁধে।

কিছুক্ষণ পর বিশ্বনাথ বসু এলো। সঙ্গে দুজন সহকর্মী। অরিন্দম ঘোষ কোন্নগর, আর রঞ্জন মণ্ডল বেগমপুর। দুজনেই বিশুর তুলনায় লম্বা চওড়া। ওদের তিনজনকে চা খেতে বললাম। ওরা নারাজ হল। যুদ্ধজাহাজের কর্মী ফলে তাই নিয়ে অনেক গল্প হল। (বিশুর সঙ্গে অনেক বছর পত্রমিতালী ছিল - বিক্রান্তের সহকারী ডুবোজাহাজ ভেলার ক্যাপ্টেন হবার পর সে চিঠি লেখা বন্ধ করে দেয়। পরে আর যোগাযোগের চেষ্টা করিনি।)

সুক্তো আর মাংসভাত খেয়ে রেডি হলাম। ওরা বোম্বে শহরকে চেনে। জানালো "বড় গাড়ি নেব - সাতজনে চলে যাবো।" ঠিক দুটোয় ফিরল ওরা। নবেন্দু কিছু কথা বলে চলে এল। বিশু একটা পিক আপ ভ্যান মার্কা গাড়ি ঠিক করলো। বললো, জুহুবীচে যাবো। পথ চলতি সব দেখিয়ে দেব। গাড়িতে দুটি মাত্র জানালা। একটার কাছে বসেছে শুভেন্দু একটার কাছে বসেছে রঞ্জন। দশটা সীট। আমরা সাতজন। ড্রাইভার ক্যাবের দিকে তারের জাল - পিছনটা পুরো খোলা। নবেন্দু আর আমি বসেছি ড্রাইভারের পিছনে। অরিন্দম বসেছে ড্রাইভারের পিছনে। একেবারে পিছনে ওরা খুড়ো ভাইপো। এটা লিখছি এই বোঝাতে যে চলন্ত গাড়ি থেকে আমরা কেউই 'ফুলভিউ' পাইনি। যাইহোক, অরিন্দমের নির্দেশ মতো গাড়ি চলছে। দ্রুত চলে এল গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়ায়, টার্ন নিয়ে চলে এল ম্যারিনার বীচে। নেমে বিশু জানাল ওই পথে আছে যাদুঘর ওয়াংখেড়ে ষ্টেডিয়াম (তখনো মনে হয় নির্ণীয়মান ছিল)। ব্রাবোর্ণের নাম জানি, এ নামটা অশ্রুত। জানাল, 'ডাক্তার ভাল, বৈজয়ন্তী মালার স্বামীর সঙ্গে দেখা করেই চলে আসবো। ওরা চলে গেল তিনজনে। আমরা নেমে দাঁড়ালাম। নবেন্দু ইঙ্গিত করায় দেখি, বৈজয়ন্তী মালা নেমে মোটরে চড়লেন। ওরা দ্রুতই কীসব কাগজ নিয়ে নামলো। কিন্তু জানাল , এই বীচের শেষে নরিম্যান পয়েন্ট। এটাকে কুইনস্ গারল্যাণ্ড বলে, সন্ধ্যার পর আলো জ্বললে তা মনে হয়। কাছেই এ্যাকোরিয়াম - ওপারে গর্ভনররা হাউস, পারসিকদের কবর, হ্যাঙ্গিং গার্ডেন, কমলা নেহেরু পার্ক। একটু দুরে বালুভূমিতে চৌপাট্টি

- দোকানপাট আছে, ভেলপুরি খাওয়ার পার্ক অছে, রাতে হয়ে যায় চোরেদের স্বর্গরাজ্য। এরপর দূর থেকেই মহালক্ষ্মী মন্দির, হাজী আলির দরগা দেখে গাড়ি দ্রুত ছুটতে আরম্ভ করে দিল এবং জুহুবীচের সামনে আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেল পেমেন্ট নিয়ে। "ফিরবো কী করে?" "বাস আছে, ট্যাক্সিও পাওয়া যাবে।"

একটা এরোপ্লেন যাচ্ছে শব্দ করে। বিশু বললো, "কাছেই সান্তাক্রুজ বিমান ক্ষেত্র"। কিছুক্ষণ তা দেখে বীচে নামলাম। তীরভূমির ঠিক পাশেই বেশ কিছু নারকেল গাছ। সমুদ্র জলে ব্রেকারস আছে। নবেন্দু বললো, "জানলে স্নানের পোশাক আনা যেত"। "আমি তো লুঙ্গি পরে তোয়ালে গায়ে-এসেছি - সমস্যা নেই কিন্তু ইচ্ছে হচ্ছে না।" ফলে সাঁতারের প্রসংগটা থেমে গেল। খুব সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে। শুভেন্দু আর রঞ্জন নারিকেল গাছের ভিড়ে কোথায় চলে গেল। বিশু হেসে জানাল, "ওখানে চোলাই পাওয়া যায়। তারই সন্ধানে গেল।" ইঙ্গিতে বোঝালো যে মণ্ডলও পিয়াক্কড়।

ধীরে ধীরে জনসমাগম বৃদ্ধি পেতে থাকলো। নরনারী শিশু এসে গেল। নিঃস্তব্ধতা ভেঙে গেল। একটা লোক একটা মেশিন আনলো। তাতে কবজির জোর মাপা হয়। কয়েকটা স্থানীয় যুবক যুবতী এক টাকা করে দিয়ে পরীক্ষা করলো। ওরা দুজন ফিরলো। মুখার্জীর মুখের বিমর্ষভাব কেটে গেছে। সে চলে গেল মেশিনের কাছে। মণ্ডলের ডাকে সবাই গেলাম। চারটে শিখ যুবক তখন পরীক্ষা করছিল। তাদের একজন ২৮৫ করলো। তাদের মধ্যে হায়েস্ট। মুখার্জী কয়েন ফেললো - ওরা দাঁড়িয়ে গেল - শুভেন্দু ২৫০ করলো। ওরা হাসলো। রঞ্জন কয়েন ফেলল, ২৭৫ করলো ওরা আবার হাসলো। অরিন্দম ২৮০ করলো। নবেন্দু আবার ২৫৫য় নেমে গেল। ওরা খুব হাসতে থাকলো। তখন অরিন্দম বিশুকে বললো, 'গুরু খেল দেখাও।'

আগেই বলেছি, বিশু অন্য দুজনের চাইতে দুবলা পাতলা দেখতে। সে এগিয়ে গিয়ে মেশিনে কয়েন ফেললো। তারপর যন্ত্রে চাপ দিল। ঝর ঝর করে অনেক কয়েন ঝরে পড়লো। মেশিন ওয়ালার কাঁদো কাঁদো অবস্থা। নিয়ম অনুযায়ী সব কয়েন এখন বিশুর। শিখেরা খুব

হাততালি দিচ্ছে। বিশু মাত্র পাঁচটা কয়েন তুলে নিল। মেশিন ওয়ালাকে পিঠ চাপড়ে ইঙ্গিত করলো বাকী কয়েন তুলে নিতে। বললো, "এ খুব বোকা, ওর অনেক টাকা কামাই কমে যেত - অন্য মেশিনম্যান দশ টাকা হলেই টাকা বার করে পকেটে নিয়ে রাখে। আমরা কেউই পারবো না জেনে ক্যাশ বাক্স খালি করেনি। দলের সবাইকে একটা করে কয়েন ফেরৎ দিতে শুভেন্দু বললো, "বাস ভাড়াটাও নিতে পারতে" বিশু হেসে জবাব দিল না। রঞ্জন বললো, 'মুখার্জীদা, এজন্যই তো গুরু বলি।'

এরপর ঘড়ি দেখে বিশু বললো, 'কাজ আছে SUN & SAND-এ চলো ঘুরে আসি।"

বাসে ফিরলাম। নামলাম গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়ার কাছে। এপেলো ব্যাণ্ডর নাম ছিল - এখন হয়েছে বিবেকানন্দ স্কোয়ার - মেরিনড্রাইভ হয়েছে নেতাজী সুভাষ রোড। জানা গেল বিশুর কাছে। এলিফ্যান্টা যাবার জাহাজ ঘাটা দেখলাম। অন্যদিকে তাজ হোটেল দেখলাম। ছোট ছোট ঢেউ ওঠা সমুদ্রে সাঁতার কাটার ইচ্ছের কথা বললাম না কাউকে। গেটের বিপরীতে ছোট পার্ক - ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা। গেটের ওপরে ওঠার সিড়ি আছে। গেটটি দেখতে সুন্দর - ইউরোপীয় স্থাপত্যকলার সঙ্গে মুসলিম স্থাপত্যকলার নিখুঁত সংমিশ্রণ। ওরা তিনজন জাহাজ ঘাটার দিকে চলে গেল - আমরা হেঁটে V. T তে ফিরলাম।

ফিরেই মুখার্জী শিবেনকে সঙ্গে নিয়ে গোপাল দাসের কাছে চলে গেল। ধীরে ধীরে ঝগড়া মাচিয়ে গেল। নীহারদা, পরেশরা সব কোনঠাসা হয়ে গেল। গোপালদা মানলেন, আরো পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করা উচিত ছিল - ওরা সবাই দলের কাজেই গেসলো - কেউ নিজস্ব গাফিলতিতে দেরী করেনি। হাত জোড় করে ক্ষমা চাইলেন। বিদ্যুৎদা বিমলকে তার টিফিনের খরচ দিতে চাইতে বিমল তা নিল না। ঝগড়া ঠাণ্ডা হলো। মুখার্জী বা কানাইদাকে আমরা কোন খরচ করতে দিইনি আমাদের সাথে ভ্রমণে। এক টাকা সে খরচ করেছিল মেশিনে - তাও বিশু তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। ফলে সে আর ঝগড়া করেনি।

গোষ্ঠদা রান্না চাপিয়ে দিয়েছিল। ফলে রাতের খাবার হতে দেরী

হল না। আমি কালিদার পরিবারের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করেছি। সবাই কমবেশি উত্তেজিত ছিল ঝগড়ার জন্য। এরা তিনটে ট্যুরেই এসেছে। এরাই সবচেয়ে ঠাণ্ডা থেকেছে। বাচ্ছুবুড়ুর কাছে জানা গেল, আমরা যেগুলো বাইরে থেকে দেখেছি ওরাও তাই নেমে দেখেছে। নতুন যা জানা গেল তা হলো বুট হাউসের নাম। কমলা নেহেরু পার্কে একটা ছোট ঘর দেখতে ঠিক বুটের মতই। তবে ওরাও ষ্টেডিয়াম, হাজি আলি দরোগা (যেহেতু সমুদ্রের তখন জোয়ার ছিল) দেখেছে দূর থেকে। আর মহালছমী মন্দির দেখেছে অনেকটা হেঁটে। শেষে এসেছে যাদুঘরের সামনে। ৪০ মিনিটে ভাল দেখা হয়নি। পরে V. T তে আসার সময় কণ্ডাকটর দেখিয়েছে চলন্ত বাস থেকে ফ্লোরা ফাউন্টেন - একটা কৃত্রিম ঝর্ণা। হজ হাউস আর কাছেই মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং। আমি ওদের জুহুবীচের কথা বললাম।

রাতে আবার পাহারা দিতে জাগলাম সুনীলের সাথে। সে জানালো, ‘বাসে বিমলদা, কর্ণদা, শিবেনও খুব যা-তা বলেছে নীহারদাকে। নীহারদা বলে ছিল, গোপালদা বলেছে সার্প আটটায় ছাড়তে - এ্যাজ এ স্কাউট আমি তাই মেনেছি। আমার কোন ফল্ট নেই বাজার করতে পাঠানোই ভুল। না হয়, নাই খেতাম মাছ কিংবা মাংস।” বললাম, “সেকথা এখন বললো না কেন?” “এখন বলছে, ভুলেই গেসলাম, এটা স্কাউট দল নয়। মহালছমী মন্দিরের পথে সাহাবৌদি শাড়িতে পা জড়িয়ে পড়ে গিয়ে আহত হয়। তার চিকিৎসায় অনেকটা সময় যায় - বিমল আর শিবেন গিয়ে ডাক্তার ডেকে এনে দেয়। ফলে সে এখন চুপ হতে বাধ্য।” তাই হয়। দলগত ভ্রমণে কিছুটা আত্মত্যাগ চাই। বুঝলাম, কালিদারা ইচ্ছে করেই ঘটনাগুলো বলেনি।

রাত আড়াইটেতে কুণ্ডকে ডেকে দিয়ে শুতে গেলাম। আজ আর গতকালের মত সরব ছিল না - কেমন যেন শুনশান ভাব। একবার RPFরা টহল দিয়ে গেছে। কানাইদা বলল, “ভিখিরিরা সব চেঁছেপুঁছে খেয়েছে - সব বাসন মেজেছে। মনে হয়, ব্যাটারা আজ ঘুমুচ্ছে।” কুণ্ডু দলবলকে ডেকে তুলতে ওকে সাবধানে থাকতে বলে শুতে গেলাম। শম্ভু আর অমিয় নিষেধ না মেনে প্লাটফর্মে নেমে ঘুরে এল তা শুয়ে

শুয়ে বুঝলাম।

প্রায় আটটায় ঘুম থেকে উঠেছি। বিদ্যুৎদা হাতে চায়ের মগটা ধরিয়ে দিয়ে বললো, "আজ আর এলিফ্যান্টা যাওয়া হবে না।" "জানি, বিশু গতকাল বলেছিল, তিনদিন চলবে 'নেভাল ডে' উৎসব - দ্বীপবাসী ছাড়া কাউকে এলিফ্যান্টা যেতে দেওয়া হবে না।" "আজ তাহলে জামাকাপড় কেচে নাও - কেনারাম বলছিল।" "ঠিক আছে"। "ওকে নাকি শুভেন্দু কীসব বলেছে।" "মেজদা, তুমি তো জানো, পোষাক নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।"

চা শেষ করে রান্নাঘরের বেসিনে মগ ধুতে গেলাম। প্রায়ই আমি আর গোবর্ধন বাসন মাজি এখানে। কানাইদাকে প্রশ্ন করলাম, "কী ব্যাপার কানাইদা, গাড়ি এত ফাঁকা কেন?" কানাইদা জানলো, "এই প্ল্যাটফর্মের শেষে এক মালগাড়ির তলায় একটা ধর্ষিতা মৃতা যুবতীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। সবাই তা দেখতে গেছে।" "তুমি দেখেছ?" "না গোষ্ঠা দেখে এসেছে।" গোষ্ঠদা বললো, " বোজা গেল রাত পাহারা দেওয়াটা খুব প্রয়োজন ছিল। বিস্তর পুলিশ এসেছে - কাছে যেতে দিচ্ছে না। একটা ভিখিরি বলছিল, ধনী আদমীকি বিটিয়া..." "যাক, বাবা আজ রাত কাটাতে হবে না।"

আজ সন্ধ্যাতে 4 DN বোম্বে মেলে আমরা জব্বলপুর চলে যাব। কিছুটা পরে সুনীলকে সঙ্গে নিয়ে কাচতে চলে গেলাম কাছের একটা কলে। সুনীলও কাচলো। দুপুরে বেশ কিছু যাত্রী বিমল আর শিবেনের নেতৃত্বে মার্কেটিং-এ চলে গেল। বিমলের এই নিয়ে তৃতীয়বার বোম্বাই আসা। শিবেনের মামা থাকেন মহালক্ষ্মী মন্দিরের কাছে। সে এখানে অনেকদিন কাটিয়েছে। ফলে সে এখানে নেতৃত্ব দিতেই পারে। এসব জেনেছি বুড়ুর 'সুজিপিসি' বা ইভার কাছে। সে এখন বিব্রত - বৌদি অসুস্থ, পায়ের ব্যথায় কাতর, বাচ্চার দিকে নজর দিতে পারছে না - তাই ইভাকেই সামলাতে হচ্ছে। অবশ্য সামলাচ্ছে আসলে বাচ্চু, বুড়ু আর গৌরী। আমি খেয়ে দেয়ে ওদের সঙ্গেই আছি। গৌরী হঠাৎ প্রশ্ন করলো, "দাদু, বোম্বেতে আর কিছু দেখার নেই?" হেসে বললাম, "তোরা তো তবু কিছু দেখলি। আমরা তো জুহু বীচ ছাড়া কিছুই

দেখিনি।" "জুহু বীচ। সেতো প্রায় ১২/১৩ মাইল দূর! কী দেখলে!" "আমায় তো জানিস, আমি হলাম যমের অরুচি - যতটা ওপর দেখি, তার চেয়ে ভিতর দেখি। জুহু ছিল বোম্বাই শহরের ধাপা - সমস্ত নোংরা জমা হত - সান্তাক্রুজ বিমানঘাঁটি হতে কিছু মানুষ সেই ময়লা ফেলা জায়গায় ঝুপড়ি বানায়। নারকেল গাছের ভিড়ে জনচক্ষুর অন্তরালে গড়ে উঠতে থাকলো চোলাই মদের ঠেক। স্যানিটারি প্রিভি বনতে জুহুর মর্যাদা বাড়তে থাকলো। ময়লা পড়লেও দুর্গন্ধ কমলো। হোয়াইট ম্যানরা সস্তায় জমি নিয়ে হোটেল ব্যবসায়ে নামলো। সমুদ্রতীরে সূর্যতাপ থেকে নগ্নাঙ্গ নরনারী - স্কচ হুস্কির বোতলে খাবে কড়া চোলাই। ফলে একদল খুব ধনী হয়ে গেল - গড়ে উঠলো কালো টাকার পাহাড়। এইভাবে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার ও সর্বশেষে ইংরেজদের হাত থেকে পারসিয়ানদের হাতে চলে যায় ব্যবসা - তাদের ধামা ধরে কিছু 'করেরা' (গাওস্কর, সাভারকর, তেণ্ডুলকর, আচরেকর ইত্যাদি) কিছু মারাঠীও উঠে পড়ে ধনের জগতে। তোমরা হয়তো জানো না, জব চার্নক যেমন কলকাতার জনক, তেমন বোম্বের জনক হল জর্ডন আঙ্গিয়ার। বোম্বাই শহরের নাম এসেছে মুম্বা বলে ধীবর পূজিত এক দেবীর নাম থেকে - মহালক্ষ্মী মন্দিরে তিনি বর্তমানে পূজা পান। উচ্চবর্ণের মানুষজনও বর্তমানে তাঁকে পূজা করে"।

"এই জন্যেই আপনার দাদা আপনার এত প্রশংসা করে।" বললেন বৌদি। সবাই প্রশংসা পেলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। আমিও বাদ যাই না। তাই হেসে বললাম, "যাঁরা বেড়ান তাঁরা নিজের মতই দেখেন - ইতিহাস জানতে হবে জানলে পর্যটন শিল্পই উঠে যাবে। অনেকেই জানে না, বললে বিশ্বাস করবে না। কোলকাতা নয়, তার আগেই ইংরেজরা বোম্বায়ে দুর্গ বানিয়েছিল, মাদ্রাজে দুর্গ বানিয়েছিল। ওরা পৃথিবীতে তৎকালীন পৃথিবীতে সবচেয়ে চতুর, রণদক্ষ আর নিপীড়ক ছিল। জ্ঞানের জন্য যে খ্যাতি তা হয়েছিল উপনিবেশ বিস্তারের পরে। উপনিবেশের পণ্ডিতদের লেখা চুরি করে নিজেদের লেখা বলে চালিয়ে। ইউরোপে জ্ঞানের জন্য খ্যাতি ছিল ফরাসীদের, জর্মনদের।

গুরুগম্ভীর আলোচনা কাটিয়ে দিয়ে গৌরী বললো, "তুমি নাকি

লুঙ্গি গামছা পরেই Sun & Sand-এ ঢুকেছিলে। নামী দামী মহিলারা নাকি Oh God! বলে পালিয়েছিল?" "হ্যাঁ, কী বলেছিল তা অবশ্য শুনিনি।" বুড্ডু বললো, "আমি ভেবেছি গুল মেরেছে - ওতো ভীষণ গুল মারে।" "না, এটা সত্যি, তাতে আমি লজ্জিত নই। কেননা, আমার সমস্ত লজ্জাস্থান আবৃত ছিল। মহিলা বলে যারা ছিল তারাই অনাবৃত ছিল। আগেই বলেছি এ এক ধরনের ব্যবসা।"

বিদ্যুৎদার ডাকে উঠে পড়তে হল। বললো, "চলো চা খেয়ে আসি।" এটা একটা বিশেষ ইঙ্গিত। কেউ ধরতে পারবে না। গোপন কথা বলার জন্য ডাক। বললাম, "কিছুটা পরেই তো পার্টির চা - " "তাহলে যাবে না?" "না না চলো"। বলে চলে গেলাম কাউকে বুঝতে না দিয়ে। দোতলায় রেলের ক্যাটারিং সার্ভিসে চা নিয়ে বসলাম। বোম্বাই শহরের সবচেয়ে সস্তা খানা এখানে পাওয়া যায়। সমস্যা একটাই, সেলফ সার্ভিস। চা নিয়ে বসে জানাল যে, দলগত খরচ —— ও হয়নি - ৭২ টাকা চলছে সে দশটকা ফেরত দতে চায়। নবেন্দু চাইছে, কশান মানিও ফেরত দেবে না।" "গতবারে তোমায় অনেক খাটতে হয়েছে - তার চাইতে পনেরো ফেরত দাও।" "নবেন্দুকে বোঝাও, তোমার ছোড়দাও তাই চাইছে।" (এখানে জানিয়ে রাখি এই সেলফ সার্ভিসে অনেকবার খেয়েছি - যতবার বোম্বেতে এসেছি) আরো নানা গোপন পরামর্শ সেরে ফিরলাম।

কোচ টানাটানি করে 4 DN-এ জুড়ে দিল। ফোল্ডারের কাজ শেষ করা আছে। 4 DN-এ অ্যাটাচ করার সময় গুরুপদ আর শম্ভুর সঙ্গে স্টেশন স্টাফের কিছুটা কথা কাটাকাটি হয়। ইলেকট্রিক কানেকশন করে স্টেশন স্টাফ। এরা নিজেরাই করেছে এতদিন। যাইহোক, আমি সেসবে কান দিইনি। যেযার কাজ করুক। বিদ্যুৎদা আর ছোড়দা ক্যাশের হিসাব নিয়ে পড়ে আছে। আমি দেখে নিলাম সবাই ফিরেছে কিনা। কয়েকজন গেসল চৌপট্টি। জানা গেল, সবাই ফিরেছে। গাড়ি ছেড়ে দিল।

নিশ্চিন্ত চিত্তে খেয়ে দেয়ে ঘুমুচ্ছিলাম সুনীলের সঙ্গে পদচারণা সেরে। গাড়ি বেশ ভালই ছুটছিল। হঠাৎ "আগুন, আগুন" শুনে ছোড়দার নাড়া খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল। প্রচণ্ড অন্ধকার। কোচের

আলো জ্বলছে না। তৃতীয়তল থেকে আন্দাজে আন্দাজে নেমে দেখি আভা আর প্রভা বাচ্ছা নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে। চর্ট জ্বলছে অনেকগুলো। কী করা উচিত ভেবেই পাচ্ছি না। ছোড়দাই বা কোথায় গেল! অন্যরা কোথায় গেল? গাড়ি থেমে গেল। বাইরেও অনেকের চেঁচামেচি। মন ফিরে পেল স্বাভাবিকতা। বিহ্বলতা কাটিয়ে বুঝতে পারলাম আগুন লেগেছে কোচের ফার্ষ্ট ক্লাসে। প্রশ্ন করে জানা গেল, কানাইদা বললো "ভয় নেই, আগুন নিভে গেছে। কর্ণ ফোম দিয়ে নিভিয়ে দিযেছে। কোচের পলিশকরা দেওয়াল ছাড়া কিছু পোড়েনি।" আভার দিকে তাকিয়ে বললো, "আপনার শাড়ি ব্লাউজ কিছু পোড়েনি - কাঁদতেও হবে না, কাঁপতেও হবে না।" আবার আমায় বললো, "ধন্য তোমার ঘুম! এতক্ষণে ভাঙল?" কী জবাব দেব এর?

গার্ড এসে গেলেন। রেলের লোক বাইরে কীসব করছে। দূরে কোন মোমবাতি জ্বলছে। সামান্য আলোয় ভরসা করে ফার্ষ্ট ক্লাসের দরজায় এলাম। এখানে দুটো বক্সটর্চ জ্বলছে। কোন আগুন নেই। মেঝের ফোম মুছছে কর্ণদা আর গোষ্ঠদা। বিদ্যুৎদা ওদের কাছে। গার্ডের কাছে আছে নবেন্দু, গোপালদা আর পরেশ। যাক্ তাহলে এরা পালায়নি। গার্ড বললেন, "বালব আছে?" গোপালদা বললো হ্যাঁ, দিন জ্বেলে দেখে নিই কানেকশন ফিরে এসেছে কিনা। যাক্, গার্ড তাহলে বাঙালী।

গুরুপদ, শম্ভু, আর গোবর্ধন, প্রদীপ, সুনীল সবাই মিলে দ্রুত হাতে সব কিউবের বালব পালটিয়ে দিতে কোচ পূর্বাবস্থা ফিরে পেল। সব বালবগুলো কেটে গিয়েছিল। নিশ্চিন্ত চিত্তে গার্ডের সঙ্গে কথা বলতে থাকলাম। ওনার একটি লিখিত রিপোর্টে ভবিষ্যতে আর কখনো কোচ পাওয়া যাবে না। গুরুপদ আর শম্ভু গার্ডকে জানালো, "কোচের লাইন বরাবর আমরা ঠিক করেছি কিন্তু V. T-র লোকেরা আমাদের হাত দিতে এ্যালাও করেনি। ফ্লাস হয়েছে বার বার তাতেই মনে হয় পলিশে আগুন ধরে যায়। গার্ড তখন তাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কানেকশনটা দেখেন। গুরুপদ আরো কিছুটা ব্ল্যাকটেপ লাগিয়ে দেয়। গার্ড নীল সিগন্যাল জ্বালিয়ে গাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দিলে গাড়ি ছেড়ে দেয়। আমি তার সাথে সেটে থাকি। গাড়ি চল্লিশ মিনিট থেমে ছিল। রিপোর্টে না

বদনাম থাকে। MAIL TRAIN বলে কথা।

পরের ষ্টপেজে তাঁর সঙ্গে গেলাম গার্ড কমপার্টমেন্টে শেষ কোচে। ততক্ষণে জেনে গেছি, গার্ড হলেন আমাদের প্রিয় গুপীমোহন গাঙ্গুলীর মাসতুতো দাদা। তাঁকে জানিয়েছি গুপীদা এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (সত্য কথা)। তিনি বর্তমানে বেশ নরম। আমাকে সঙ্গ দিতে বলায় তাঁর সঙ্গে গেলাম তার কামরায়। এতে আমার অভিজ্ঞতা হলো। রাতের ট্রেনের গার্ডদের অবস্থাটা দেখা হল। গার্ড জানালেন মেল ট্রেনে ৪০ মিনিট লেট নিয়ে কেউ এনকোয়ার করে না। উনি রিপোর্ট করে দেবেন 'নমিন্যাল রেলওয়েম্যানস ইলেকট্রিক্যাল ফল্ট' বলে। দেখলাম এক কিশোর ম্যাসাজ জানা ছেলে তাকে ম্যাসাজ করে দিল। তার নাকি এটা নিত্যকার ব্যাপার। বিনিময়ে সে পায় নিত্য পাঁচটাকা আর বিনা পয়সায় রেল ভ্রমণ করতে পারে বোম্বে থেকে জব্বলপুর। সব গার্ড তাকে চেনে এবং সে গার্ড কামরাতেই যাতায়াত করে। আমাকেও সে কিছুটা 'শির পালিশ' করে দিল।

জব্বলপুরে কামরায় ফিরলাম। মাত্র ২০ মিনিট লেটে পৌঁচেছে। সবাই উদগ্রীব হলেও কিছু না বলে সিতুকে নিয়ে ASM ON DUTY র সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি টুরিষ্ট প্লাটর্ফমই দিলেন। আগামীকাল এই 4DN এ এ্যাটাচ করার প্রোগ্রামকে এ্যাকসেপ্ট করে ফোল্ডারের দুদিকেই স্ট্যাম্প ও সই করে দিলেন। অন্য কজন চলে গেসলো বাস রিজার্ভেশনে। গতরাতের বিভীষিকা কেটে গেছে সকলের মন থেকে। কেবল আভা নাকি লজ্জায় বের হচ্ছে না ঘর থেকে। সে অবশ্য ঘরেই থাকে - আমাদের মতো উন্মুক্ত কিউবিকলে থাকে না। গৌরী বললো, "কানাইদা সকলকে বলছে, আভা নাকি আগুন দেখে দৌড়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছিল - কাঁদছিল 'আমার হাজার টাকা দামের শাড়ি ব্লাউজ পুড়ে গেল বলে। দিদি, জামাইবাবু, বোনঝির কথা তার মনেই ছিল না।" বললাম, "এতে লজ্জার কী আছে দুর্ঘটনায় কারোর মাথা ঠিক থাকে না। আমিও তো হঠাৎ খুব ঘাবড়ে গেসলাম। কতক্ষণ পরে আগুন নিভে যেতে তবে গেছি।" "তুমি তো দাদু মড়ার মতো ঘুমুচ্ছিলে, কেনাদা কত ডাকতে তবে ঘুম ভেঙেছে।" "সে আমার অভ্যাস, ঘুমাইনা তো ঘুমাই না।

ঘুমালে হাতী মাড়ালেও জানি না।" "হাতী মাড়ালে তো চিরনিদ্রা"। হাসলো সে। আমিও হেসে তাকে সমর্থন জানালাম।

বাস ঠিক করে এসে নবেন্দু জানাল, "ব্যালান্সেরক, মদনমোহন ফোর্ট, চৌষট্টি যোগিনী মন্দির এবং সব শেষে ধুমাধার ফলস্ দেখাবে। দুপুর দেড়টায় বেরুলে সাড়ে পাঁচটা ছটায় ফেরা যাবে। বাস আসবে একটায়। সেই মত সবাই প্রস্তুত হতে থাকলো। মাছ সস্তা জেনে কজন গেল মাছ কিনতে। আমি গল্পে মেতে রইলাম। সময় মত একটা হোস পাইপে স্নান সেরে ভাত খেয়ে রেডি হলাম।

জানা গেল, কানাইদা, গোষ্ঠদা যাবে না। নীহারদা তার অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে ডাক্তারখানায় যাবে। ইভার কাছে থাকবে বাচ্ছাটা। বাচ্চু তাকে কোলে নিয়ে আছে। বড় বাস। মদনমোহন ফোর্টে উঠবে না। বাস ব্যালান্সরকের কিছুটা নীচে দাঁড়িয়ে গেল। দুপুরের রোদ বেশ কষ্টদায়ক। অনেকেই উঠতে চাইছে না। ব্যালান্সরক এক অপরূপ ব্যাপার। একটা বিশাল পাথর এক টুকরো পাথরে ঠেকে দাঁড়িয়ে আছে। সে পর্যন্ত সবাই এল।

কিছুজন থেমে গেল সেখানেই। স্থানটি মহীরূহের ছায়ায় সুশীতল এবং সুন্দর বাতাস বইছে। আমরা পিচ বাঁধানো পথ ধরে উপরের পথে পা বাড়ালাম। কদিন ধরে সুনীল রয়েছে কাছে কাছে। সে দেবদ্বিজে বিশ্বাসী - অনেক ব্যাপারেই ভিন্নধর্মী - কিন্তু কেমন যেন বিপরীত ধর্মী জেনেও আমায় ভাল বেসে ফেলেছে - যা আজও (১৯৩৩) অটুট। সে সঙ্গে রয়েছে। কিছুটা যাবার পর দেখা গেল ফোর্টের প্রবেশ পথ। গাছে ঘেরা পথ পেরিয়ে দুর্গে ঢুকতে হবে। কিন্তু সেই পথে বেশ কিছু হনুমান বসে আছে। নবেন্দুরা কাছে যেতে দাঁত বের করে উঠে দাঁড়াতে ওরা ফিরে আসে। আমি বা সুনীল তা দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম - ওরা চলে এসে জানাল, কিছুটা দূরে গোপালমন্দির দেখতে যাবে। সুনীলকে নবেন্দুদের সঙ্গে যেতে দিয়ে ছায়া খুঁজে দাঁড়িয়ে পড়লাম। (পরে বার দশেক জব্বলপুর এলেও এসব আর দেখিনি)।

মিনিট দশেকের মধ্যেই ওরা ফিরে এল। দ্রুত হেঁটে বাসে ফিরলাম। বাস এল বোটিং পয়েন্ট। বাঃ বেশ স্নানের ঘাট আছে।

অনেকেই স্নান সারছে তখনও। আমাদের বোটিং করার কথা নেই - তবু কজন গেল বোটিং কাউন্টারে। ছোট বড় নৌকা আছে - প্রপাতের কাছ বরাবর নিয়ে যায়। মাথাপিছু ভ্রমণ চার্জ নেই - নিলে পুরো বোট ভাড়া নিতে হবে। পাঁচজনের ডিঙ্গি দশটাকা সবচেয়ে কম রেট। কাছেই চৌষট্টি যোগিনী মন্দির কজন চলে গেল দেখতে। কজন আমরা নর্মদা নদী তীরে বিশ্রাম নিলাম। খুব ঘাম বের হচ্ছিল, নদীতীরের শীতলতায় খুব আনন্দ পেলাম। (চৌষট্টি যোগিনী মন্দির ভারতে বহুস্থানে আছে - কখনো প্রবেশ করিনি। নৃতত্ত্ববিদরা মনে করেন মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতার বিভিন্ন নারীর কলপরূপ এগুলি। এসব পড়ে কোন্নগরের জগদ্ধাত্রী মন্দিরে যোগিনী মূর্তিগুলি দেখেছি - স্থানীয় সহকর্মী শান্তিময় পাত্রের সঙ্গে।)

বাস যখন ধূমাধার জলপ্রপাতের কাছে এসে দাঁড়াল তখন বিকাল হলেও পশ্চিম আকাশের ঘনমেঘে আকস্মিক সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। দর্শন ব্যাকুলতায় কারোর সেদিকে খেয়াল ছিল না। সুন্দর প্রবল স্রোতা জলধারা প্রবল বেগে প্রচণ্ড গর্জনে লাফিয়ে নামছে। চর্তুপার্শ্বস্থ সবুজ বনরাজির মধ্যে শ্বেতধবল ধারার চূর্ণিত জলকণা এক মায়াময় বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। অনেক অন্য দর্শনার্থীরা রয়েছেন - রয়েছেন স্থানীয় শ্বেতপাথরের ব্যবসায়ীরা। স্থানীয় ঘরাণায় নির্মিত শ্বেতপাথরের গ্লাস, আলতার বাটি, কালো পাথরের থালা ইত্যাদি বিক্রয় মানসে দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাইছেন। (এখন আর এটা দেখা যায় না - পরে ছটা গ্লাস কিনেছিলাম)।

বাসওয়ালাদের তাড়ায় সবাই বাসে ফিরলাম। যে কোন মূহুর্তে ঝড় বৃষ্টি নামতে পারে। নবেন্দু, গোপালদা আসেনি। ফলে নেতৃত্ব আমারই হাতে। দেবুদা, কুণ্ডুরা আছে -তারাই সব কিছু করলেও সার্বিক দায়িত্ব আমারই। সুনীলকে একথা বুঝিয়ে বাসে এসে সকলকে বললাম, "সবাই দেখে নাও সবাই ফিরছে কিনা?" বাসওয়ালারা তাড়া দিচ্ছে - শিবেন আর মুখার্জীকে বললাম - 'বাসের সামনে দাঁড়া -ছাড়তে দিবি না" ভিতর থেকে ইভার কণ্ঠ "আমার ভাইঝি" - ছুটলাম দুজনে, সুনীলই পেয়ে গেল - প্রায় ১০০ গজ দূরে বাস আছে দাঁড়িয়ে বাচ্ছাটা কাঁদছিল এক মারাঠী পরিবারের কাছে দাঁড়িয়ে - আমি তো চিনিনা -সুনীল কোলে

তুলে নিয়ে ছুটছিল - মাঝ পথেই এসে গেল ইভা। সে পৃথুলা, বেশ হাঁপাচ্ছে। খুব ধমক খেল আমার, যাক্ - শান্তি-ওম শান্তি - যার শেষ ভাল , তার সব ভাল। বাসে খুব কথা কটাকাটি হল - হোক। এতো হবেই - কেউ নিজের ঘাড়ে দোষ নিতে চায়না।

ভ্রমণ শেষ হলো। কিন্তু কাজ শেষ হলো না। হাওড়ায় সকলকে পৌঁছে দিয়ে তবে আমাদের এবারের মত ছুটি। নীহারদার স্ত্রী - নিজে নার্স হওয়া সত্ত্বেও বুঝতে পারেননি যে তিনি জন্ডিস রোগে ভুগছেন। যাই হোক, এখনকার মতো সামলেছেন। ডাক্তাররা তাঁকেও নানা খাদ্যরস গ্রহণে নিষেধ আরোপিত করেছেন (পরে মাস দেড়েকের পরে মারা যান, সুনীল গোস্বামীর মতই খাদ্য বিধি না মেনে)।

পরদিন 4DN এল একঘণ্টা পরে। অন্য গার্ড। সে তো হবেই। কোচ জুড়ে নিল। আমার বাকী কাজ রইলো হাওড়ায়। বিদ্যুৎদা আর ছোড়দা হিসাব তৈরিতে - নবেন্দু পরীক্ষায় ব্যস্ত। সবাই মোটামুটি জামাকাপড় বাক্সবন্দী করতে ব্যস্ত। আমি কিছুটা করে সবাইয়ের সঙ্গে (ফার্স্ট ক্লাশ বাদে) কথাবার্তা বলে সময় কাটালাম। ঠিক সময়ে চা, জলখাবার, স্নান, খাওয়া, সান্ধ্য চা রাতের খাবার খেয়েছি। দুপুরে গল্প করেছি। সামান্য তাস খেলেছি পাশের চিত্তদের কিউবে। বিমলদের কিউবে অসুস্থ্য সাহা বৌদিকে বিব্রত না করে।

পরদিন সকালে কর্ডের কিছু মানুষ নেমে গেল। কানাইদা গোষ্ঠদা নামতে পেল না। ট্রেন লেট চলছে - একটা বেজে যাবে হাওড়া পৌঁছতে। তাই নবেন্দু সকলকে খাইয়ে দিতে চাইল। সকালেই ভাত চেপে গেল। তবু ব্যাণ্ডেলে নীহারদারা ইভাসমেত নেমে গেল। ওরা চন্দননগরে থাকে। অসুস্থ মানুষকে বিব্রত না করাই উচিত। বাকী সকলে খেয়েদেয়ে বাসন মেজে রেডি হয়ে হাওড়ায় নামলাম। নবেন্দুরা চলে গেল মালপত্তর তত্ত্বাবধানে। আমি আর সিতাংশু গেলাম S.M. দপ্তরে।

— o —